কবিতা সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র ৪ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রমা

কবিতাসমগ্র

৪

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

কবিতা সমগ্র ৪/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-713-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

KABITA SAMAGRA Vol: IV
[Poem]
by
Sunil Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

দেবস্মিতা ও রাহুল দাশগুপ্ত-কে

ভূমিকা

এ পর্যন্ত আমার যে-কয়েকটি খণ্ড কবিতাসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে এই খণ্ডটির বেশ তফাত আছে। আগের খণ্ডগুলিতে আমার পরপর কাব্যগ্রন্থগুলি স্থান পেয়েছে, এই খণ্ডে শেষের অংশে কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়, সংযোজিত হয়েছে প্রচুর অগ্রন্থিত কবিতা। এত অগ্রন্থিত কবিতা এল কোথা থেকে? প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থে আমি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অনেক কবিতাই বাদ দিতাম, আঙ্গিকের দুর্বলতার জন্য, কিংবা কবিতার শরীরে লেপ্টে থাকা অনাবশ্যক ভাবালুতা, কিংবা নিছক সমসাময়িকতা। আমি মনে করতাম, হারিয়ে যাওয়াই সেইসব দুর্বল কবিতার নিয়তি।

যেমন, আমার জীবনে প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'একটি চিঠি', সেটি রচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে আমার বিভিন্ন গদ্য রচনায়। কিন্তু পনেরো বছর বয়েসে রচিত মূল কবিতাটি এমনই কাঁচা মনে হয় যে সেটিকে আমি স্মৃতি থেকে নির্বাসন দেওয়াই সংগত মনে করেছিলাম। ঠিক কোন বছরের কোন মাসে সেটি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তাও আমার মনে ছিল না। কিন্তু অনুজ কবি শ্রীশ্যামলকান্তি দাশ ১৯৫১ সালের মে মাসের দেশ পত্রিকার বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে সেই কবিতাটি উদ্ধার করে আনে এবং দাবি জানায় যে ইতিহাসের খাতিরে সেই কবিতাটি কোনও কাব্যগ্রন্থে স্থান পাওয়া উচিত। তবু আমি অনেকদিন দ্বিধা করেছি। তারপর আরও অনেক শুভার্থী, বিশেষ করে তরুণ কবি শ্রী রাহুল দাশগুপ্ত অনেক লুপ্ত কবিতা উদ্ধার করে এনেছে সেই একই দাবিতে। কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ না হলেও তাতে সময়ের ছবি আছে। এই সংকলনে গ্রথিত সেই সব নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে আসা কবিতা সময়ের কথা মনে রেখেই পড়তে হবে। অনেকগুলিই কৈশোর ও প্রথম যৌবনে লেখা। কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কবিতাও রয়েছে এর মধ্যে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় রচিত কিছু ছড়া ও কবিতাও স্থান পেয়েছে।

'অন্যদেশের কবিতা' পৃথকভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ, কিন্তু সেটি এতদিন কাব্য সংগ্রহে স্থান পায়নি, কারণ অনুবাদ কবিতা মৌলিকের পাশাপাশি স্থান পেতে পারে কি না সে বিষয়ে মনস্থির করতে পরিনি এতদিন। পাছে সেটি হারিয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় এবার এই সংগ্রহের অন্তর্গত হলো। 'অন্য দেশের কবিতা'র বাইরেও যে আমি কিছু কিছু কবিত্র অনুবাদ করেছি নানা সময়ে, তা মনেও ছিল না। ফিরে এসেছে সেই অনুবাদগুলিও। তবু আমার এখনও দ্বিধা রয়ে গেল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি

সেই মুহূর্তে নীরা ১১
ভোরবেলার উপহার ৭১
অন্যদেশের কবিতা ১১৯
সংযোজন: অগ্রন্থিত কবিতা ২৬৫
সংযোজন: অনুবাদ কবিতা ৩০৫
সংযোজন: ছড়া ৩১১

গ্রন্থপরিচয় ৩৩১
কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ৩৩৩

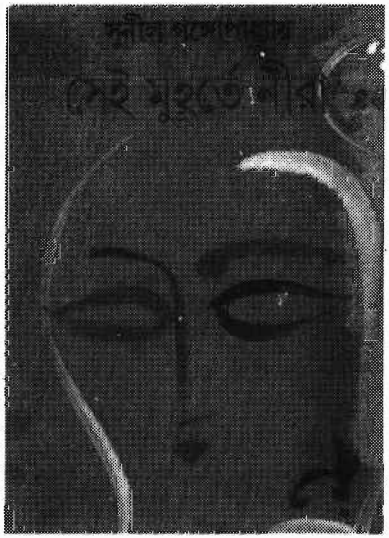

সেই মুহূর্তে নীরা

সূচিপত্র

অনেক বসন্ত খেলা১৩ সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ ১৩ মায়া-সংসার ১৪ হাত ভরা চাঁপা ফুল ১৫ ক্লাস সেভেনের বয়েস ছুটছে ১৬ আমার সব আপনজন ১৭ অণু-জীবনী ১৮ মালাখানি ভেসে যায় ১৯ স্বপ্ন দর্শন ১৯ নাম নেই ২১ লাল রাস্তায় খড় বোঝাই গাড়িটি ২২ উপকথার জন্ম ২৩ সেই মুহূর্তে নীরা ২৩ কোন অসমাপ্ত অভিযান ২৪ বিন্দু বিন্দু ২৫ নেশাখোরের স্বীকারোক্তি ২৮ জয় একদিন... ২৯ প্রথম প্রশ্ন ৩১ তিনটি অশ্ব ৩১ শব্দ-ছবি ৩২ শিল্প ৩৩ দুর্বোধ্য ৩৩ ঘরভর্তি রঙিন মানুষ ৩৪ চূর্ণ-কবিতা ৩৫ তবু এই গৃহহারা ৩৬ শিল্পের নিয়মে ৩৬ পাগলাটে গলার স্বর ৩৭ রক্ত ৩৮ কেউ আমায় চিনতে পারে না ৩৯ এই যে একটা নড়বড়ে সাঁকো ৩৯ দুটি মাত্র অক্ষর ৪০ যে যেমন সুখ পায় ৪১ অকৃতজ্ঞ ৪১ কথা ৪২ যে যার অন্য বাড়ি ৪৩ খেলা ৪৪ বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো ৪৫ কঙ্কালের কপালে চন্দন ৪৫ কোলাজ ৪৬ এক একটা স্বপ্ন ৪৭ নদীর কিনারে কালের রাখাল ৪৮ ডানা মেলা গল্প ৪৮ এত সহজেই ৪৯ অপরাধ ৪৯ আমরা শুনতে পাই না ৫০ আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে ৫১ ফিরিয়ে নাও ৫১ মিল-অমিল ৫২ কেউ নাম ধরে ডাকবে ৫৪ বৃষ্টির রাতে ৫৫ এক সন্ধ্যায় দুই কবি ৫৬ প্রতীক্ষায় ৫৮ অন্য গল্প ৫৮ ব্যর্থতার তীব্র টান ৫৯ সীমান্ত ভাঙা ৬০ ছুঁয়ে দেখা হবে ৬১ সপ্তম গর্ভের কন্যা ৬১ ঘূর্ণি ৬২ দেখা না দেখা ৬৩ দিগন্ত কি কিছু কাছে ৬৩ রূপ ৬৪ কলম ৬৪ না-পাঠানো চিঠি ৬৫

অনেক বসন্ত খেলা

অনেক বসন্ত খেলা হল তবু বাকি রয়ে গেল
একটি চুম্বন
নদীর কিনারে একা বসে আছি বিকেলের শেষে...
না, না, ঠিক নয়, আমি বহুদিন সেরকম
নদীকে দেখিনি
কবিতার ঝোঁকে লিখে ফেলা, যেন একটি প্রিয় ছবি
না ঘটলেও লেখা যায় না? ছবিটাও শিল্প-সত্যি নয়?
সে কথা এখন থাক, জানি কোনও নিরিবিলি নদী
আমাকে প্রতীক্ষা করে আছে।

যেমন কুসুম রাজ্যে সেবারের দুর্দান্ত ভ্রমণ
না, একটাও গাছ ভাঙিনি, এমনকী কোনও স্তনে
ছোঁয়াইনি দাঁত
তবুও সুগন্ধ শয্যা চক্ষু থেকে ঘুম কেড়ে নিল
নীরা, মনে পড়ে সেই স্বর্ণসন্ধ্যা? এখনও তোমার সঙ্গে
একটি ঘুম বাকি রয়ে গেছে!

সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ

সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ
আবার দেখা হবে!
হোক না হোক, ঘুরতে ঘুরতে
যে যেখানেই যাই না।
মরুর দেশে পুড়তে থাকি
মেরুর দেশে লীন
বুকের মধ্যে ছলকে ওঠে
আবার দেখা হবে!

বকুল গাছে ঠিকানা লেখা
পাখির ঠোঁটে চিঠি
রাস্তাগুলো রজ্জু হয়ে
মারল হ্যাঁচকা টান
হলুদ বাড়ির নীল বালিকা
ভালোবাসল জল
ভালোবেসেছে জলের গান
গ্রাম্য ওফেলিয়া।

গড়িয়ে গেল কানাকড়ির
মতন একটি দিন
আর একটি দিন ঘোড়সওয়ার
ভিখারিদের রাজা
কত রকম খেলার সাজ
ছড়িয়ে থাকে ধুলোয়
জীবন ভোর প্রতিধ্বনি
আবার দেখা হবে!

মায়া-সংসার

দুলে দুলে দুলে দুলে মাটি ওঠে ফুলে ফুলে বাড়ি যাও বাড়ি যাও
বাড়ি যাও বাড়ি যাও, দেখো হাতলণ্ঠনে আছে কিনা কেরোসিন
দেখো পথ দেখে চলো, পেটে খিদে বড় খিদে, বাড়ি গেলে সব পাবে
লেবু আছে নুন আছে, কাঁচা লঙ্কাও গাছে, আছে আছে সব আছে
নেই নেই, পান্তার হাঁড়িতে যে হু হু হাওয়া, কেন এত হু হু হাওয়া
ফুটো হাঁড়ি চোখ আঁকা, জল ছোটে আঁকাবাঁকা চৌকাঠে ভাঙা শাঁখা
নেই নেই ভাত নেই, আমানি ও চিঁড়ে নেই, গুড় নেই খই নেই
কী খাবে গো খাবেটা কী, খিদে জ্বলে দাউ দাউ পেটে কিল পেটে কিল
বউ ছেলে কোথা গেল, ছোট মেয়ে কাঁদুনিটা, সেই মেয়ে কোথা গেল
ঘরে নেই কেউ নেই, আলো নেই ঘর নেই, দেয়ালের চকখড়ি
দাগ নেই দাগ নেই, বসুধারা মুছে গেছে, ঘরভরা ভাঙা কাচে
তালগাছে কেউ নেই, পুকুরেও কেউ নেই, বাতাসেও ঢেউ নেই

কিছুই তো কাঁপে না গো, লাউডগা কাঁপে না গো, জানালার খড়খড়ি
কাঁপে না গো, কেউ সাড়া দেয় না গো, সারা পাড়া কোনও সাড়া দেয় না গো
ডাকো কার নাম ধরে, কেউ নেই, নাম নেই, নাম ছাড়া কিছু নেই
কেউ নেই একী কথা, নদীটিও কেউ নয়, নীরবতা কেউ নয়
কেউ শাঁখ বাজাল না, প্রতিবেশী সব ঘুমে, কেউ কিছু জানল না
কেউ জেগে উঠল না, একী ঘুম মায়াঘুম, ভাতঘম নেশাঘুম
আর সব ঠিক আছে, চাঁদ ঝোলে নিম গাছে, চাঁদ ফিকিফিকি হাসে
জোনাকিরা ঘোরে কাছে, আর সব ঠিকই আছে, ঠিকঠাক দূরে কাছে
শুধু তুমি একা ঠায় পাছ দুয়োরের কাছে, একা ঠায়, চোখে ভ্রম
কোনও ভ্রম, ভ্রম নয়, কিছু নেই কেউ নেই, সব আলো-ছায়া মাখা
দেখা যায় দেখা যায় এক মায়া-সংসার ফুৎকারে উড়ে গেছে
উড়ে গেছে উড়ে গেছে, ভূ-কাঁপনে পাতালের কোথায় যে নেমে গেছে
অথবা কি ছিল কিছু, বাড়ি ছিল, ঘর ছিল, প্রেম ছিল, আশা ছিল
বুকভরা দুধ ছিল, কোলজোড়া শিশু ছিল, কান্না ও হাসি ছিল, সব ছিল
কী বিশাল ভাঙনের কিনারায় তুমি একা, মাথা ঘোরে চোখ ঘোরে
তুমি একা তুমি একা, চোখে জল, এত জল, চোখে জল, হু হু জল
কেন আর একা থাকা, কেন আর একা কাঁদা, মাঠে যাও ছুটে যাও ছুটে যাও
মাঠে যাও, কাঠফাটা মাঠে যাও, জল দাও, বুকখালি করে দাও!

হাত ভরা চাঁপা ফুল

হাত ভরা চাঁপা ফুল, কে এনেছে রুপোলি শিকল
সে কি বিকেলের ব্যাধ? দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল
উপবাসী চোখ
মাঝখানে নিস্তব্ধতা, ক্ষণিক না অলৌকিক
আকাশ ঘুমিয়ে আছে আকাশের নীল বিছানায়
বাতাস হারিয়ে গেছে, যেখানে সবাই যেতে চায়
আমাকে শিকল দাও, তুমি চাঁপা ফুলগুলি নেবে?

ক্লাস সেভেনের বয়েস ছুটছে

ছাদ থেকে ছাদ বটের চারায় ভরে গেছে কার্নিশ
বকুলদিদির চুলের ফিতের মতন ছড়ানো
লকলকে কালো গলি
খিদে জ্বলন্ত ছোট্ট শরীর, আমার শরীর, দুপুরে দুপুরে একা
ক্লাস সেভেনের বয়েস ছুটছে, এ ছাদ ও ছাদ ডিঙিয়ে
ছুটছে, কখনও শূন্যে ঝাঁপ
বকুলদিদির আঁচলের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় লুটিপুটি খায়
সুতোকাটা এক কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি!

আহিরিটোলার দিক থেকে আসে গঙ্গা-বাতাস, উষ্ণ বাতাস
গলিতে গলিতে বাঁশির মতন ডাকে
ডাক পিওনেরা দ্রুত চলে যায়, জানালায় দুটি ব্যাকুল চক্ষু আঁকা
ও দুটি চোখের তপস্যাঘন রশ্মি ঠিকরে বিকেলের আগে
কোন দেশ থেকে ঝঞ্ঝাকে টেনে আনে
এক দমকায় উড়ে যায় ফুল, অঙ্কের খাতা, পোষা পায়রারা
দিক ভুলে যায়, সূর্যও পায় ছুটি
আকাশের রং শ্লেটের মতন, বিদ্যুৎ লেখে সংকেতময় চিঠি!

বকুলদিদির মুখ মনে নেই, দিন চলে গেছে, পুরোনো ফুলের
পাপড়ির মতো খসে খসে পড়া দিন
শুধু মনে পড়ে ঘামের গন্ধ, বকুলদিদির থুতনি-বিন্দু
ভেজা-ভেজা বুক, গন্ধে আকুল
গলিতে গলিতে ক্লাস সেভেনের
হঠাৎ থমকে থাকা!

আমার সব আপনজন

হিমালয় পর্বতকে পিতামহের সঙ্গে তুলনা দেবার কোনও
মানে হয় না
সে আমার অনেকদিন না-দেখা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতন
সকলেই জানে, গঙ্গা নদী আমার আপন বউদি
তাঁর বোন পদ্মার সঙ্গে ছিল আমার বাল্যপ্রেম
আমার দিলদরিয়া শৌখিন ছোট মামার সঙ্গে দার্জিলিং-এর
কী মিল
তাঁর ছেলের নাম রাখা হয়েছে পাগলাঝোড়া
আর রূপসী ছোট মামিটি ঠিক যেন কালিম্পং, তাঁর
আঁচলের সুগন্ধ নিয়েছি কতবার
যে দিকে তাকাই আমাদের পরিবারের লোকজন ছড়ানো
সন্ধেবেলা বঙ্গোপসাগরের হুহু বাতাস আমার বাউণ্ডুলে ভাই
আমার গান-পাগলা জ্যাঠামশাইয়ের বসতি বীরভূমে, তাঁর অনেক
সাকরেদ জুটেছে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায়
দুই পিসিমার অনেক ছেলেমেয়ে, তারা সব চব্বিশ পরগণা
বড়দি মেদিনীপুরে, দুই মেয়ে দিনাজপুরের দক্ষিণী আর উত্তরা
জলপাইগুড়িতে সেবার বন্যা হল, এক বুক
জল ঠেলে গেলাম রাঙাকাকাদের বাড়ি
বকফুল গাছে বসেছিল সত্যিকারের বকের ঝাঁক
আর ভয়ে কুঁকড়ে ছিল একটা মস্ত বড় সাপ
শিলিগুড়ি থেকে ছুটে এল মাসতুতো ভাই বোনেরা,
ফেরার পথে সেখানে আমার জ্বর
হল, আর জীবনের
প্রথম চুম্বন
রূপনারায়ণ নদীর পাশে কতবার ঘুমিয়েছি, জেগে উঠেছি আমি
আর দামোদর ঠিক যেন আমার স্বদেশি আমলের জেল-খাটা জ্যাঠামশাই
বড় মাসিমা আছেন মুর্শিদাবাদে, ছোট মাসি অভিমানিনী সুন্দরবন
কত আত্মীয়স্বজন সরে গেছে ঢাকা, মৈমনসিং, পাবনায়
কতকাল দেখা হয় না, কুচবিহারের বড়দি জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে,
বগুড়া, রংপুরের খবর জানিস?
মালদার টিয়া পাখির ঝাঁক আমার ছোট বোনের বন্ধুদের মতন গল্প
করতে করতে উড়ে যায় ওদিকে

রেললাইনের পাশের জলায় ফুটে আছে শালুক, তাদের ছোট ছোট
চুমু দিয়ে যায় কয়েকটা ফড়িং
হাওড়া-হুগলিতে মাটি কাটছে, লোহা পিটছে খুড়তুতো ভাইয়েরা
শান্তিপুর থেকে কেষ্টনগর যাবার পথে একটু একটু মন খারাপ দুপুর
বর্ধমানের আকাশের মেঘ দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে
হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে ট্রাক, দুধারের আদিগন্ত ধান খেতের
সবুজ ঢেউ আমার মা
মা, তোমার পাশে একটু বসি
আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও মা!

অণু-জীবনী

ঘুমে ডুব দেব, ওপরে কচুরিপানা
আজ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখায় মানা

গিয়েছি ভ্রমণে, সূর্য মেরেছে বান
অনেক কাহিনী দিনমানে খান খান

পাতালে প্রবাস যৌবন উৎসবে
একলা এসেছি একলাই যেতে হবে

অলীক নগরী, ভুল মানুষের ভাষা
মনোলোকে তর্জনী তোলে দুর্বাশা

যা ছিল হরিৎ হয়ে গেল পাংশুটে
ক্ষুধার অন্ন পিঁপড়ের খায় খুঁটে

ক্ষুধার কথাটি সাঙ্গ হল না বলা
রঙ্গ মায়ায় এত রূপ ছলাকলা

সারা জীবনের সঞ্চয় সঙ্গতি
সাদা পৃষ্ঠার সঙ্গে প্রবল রতি

মালাখানি ভেসে যায়

এমন সুন্দর গন্ধ কোন রমণীর গায়?
ফুরফুর করে হেসে ওঠে একটা রাত্রে-ফোটা ফুল
আগে এইসব ফুলের হাসির শব্দ শুনতে পেতাম না।
দৃশ্য বিন্দু ছাড়িয়ে চোখ যেত না প্রেক্ষাপটে
কত ফুল ফোটে, ঝরে যায়, তার কোনও উপমা দিইনি
ফুল নিয়ে এত আদিখ্যেতা করারই বা কী আছে
মানুষ তার জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুদিনে ফুল পায় বেশি,
রাশি রাশি ফুল, ফুলের কী বিপুল অপচয়
এখন হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকারে জোনাকির মতন এক একটা
ফুল উড়ে আসে
ঠোঁটে এসে লাগে, তৎক্ষণাৎ মনে হয়, এত চেনা!

নদীর পাশে বসে-থাকা নারী, সাত মিনিটের বেশি
নদীকে দেখিনি
নারীটি যে-ই উঠে দাঁড়াল, নদী মুছে গেল
তার এক আঙুলে ঢাকা পড়ে যায় পটভূমিকার বৃক্ষময় পাহাড়
সেই আঙুলের ডগায় সংকেতময় ভাষা, তার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে
কেটে গেল অর্ধেক জীবন
সে কিছুই জানে না, এ এমনই এক ধাঁধা, যার কোনও
স্রষ্টা নেই
সেই ভাষা দিয়ে গাঁথা মালাখানি পরানো গেল না তার গলায়
সে কখন হারিয়ে গেল বৃষ্টির আড়ালে
মালাখানি অন্ধকার নদীতে ভাসছে, ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে
নিরুদ্দেশে...

স্বপ্ন দর্শন

সরযূ নদীর তীরে গাঢ় সন্ধ্যাকালে
বাবরের সঙ্গে দেখা। তিনি হাঁটু গেড়ে
সোনালি উষ্ণীষ খুলে নামাজ আদায়ে

বসেছেন। আমি কোনও ধর্মেরই প্রকাশ্য
উদ্দীপনে অবিশ্বাসী। চুপ করে আছি
সম্রাট মেললেন চোখ, আমি করজোড়ে
নিবেদন করি তাঁকে, হে শাহেনশাহ
এই যে অযোধ্যা, আর রাম পরিবার
সত্য হোক বা না হোক, নেই ইতিহাসে
তবুও অজস্র লোক কল্পনায় মানে
এখানে কি মসজিদ না বানালেই নয়?

সম্রাট ঈষৎ হেসে অভয় দিলেন
ঠিক স্থলপদ্ম রং বামহাত তুলে
বললেন, ওরে বেটা, যতক্ষণ আমি
নামাজ পড়ছিলাম, তুই কি করছিলি?
পাশের মন্দিরে কেন পূজায় বসলি না?
মৃদু কণ্ঠে বলি তাঁকে, হে বাদশাহ, আমি
গোলামের চেয়ে দীন, গুস্তাকি মার্জনা
করবেন নিজ গুণে, তবু বলতে হবে
মানুষের পূজা কিংবা ধর্মচর্যা সব
আসলে তো অন্তরের। বাইরে দেখাবার
এমন কী প্রয়োজন? মঠ বা মসজিদে
আনাগোনা ব্যাপারটা কি ভড়ং না শুধু?
রামের মন্দিরটাও প্রয়োজনহীন
কোনও শাস্ত্রে মন্দিরের কথা কিচ্ছু নেই।

সম্রাট বাবর তাঁর নীল চক্ষে হেসে
চুপিচুপি বললেন, অচেনা কুমার
আমি এবংবিধ প্রশ্ন বড় ভালোবাসি
চক্ষু বুজে ভাবি আর মনে মনে বলি
মানুষ তো মানুষই, তবু ধর্মের বিভেদে
বিজয়ীর তলোয়ার ঝলসে ওঠে কেন?
ধর্ম কিংবা মনুষ্যত্ব, এই দোলাচলে
কাটিয়েছি বহুদিন, এইবার আমি
বুঝেছি এ সার সত্য, মন্দির-মসজিদ
অহং-এর খেলাঘর, ঐশ্বর্য-পুতুল

আল্লা মিঞা এসব কি গড়তে বলেছেন?

চেয়ে দ্যাখ নদীস্রোতে ভেসে যায় কাল
চন্দ্রপ্রভ আশমানে দীপ্ত নীরবতা
ওপারে অরণ্যময় সুঘ্রাণ বাতাস
চক্ষে কেন অশ্রু আসে, কেন কাঁপে বুক
সুন্দরের পীঠস্থান এই বসুন্ধরা
যারা কলুষিত করে, তারা কি জানে না
এ জীবন অসীমের একটি ফুৎকার!

নাম নেই

ছেলেবেলা ইস্কুল-মোড়ে একটি মুচিকে বসে থাকতে দেখতাম। আমার বাবা, ঠাকুরদা কিংবা লর্ড ক্লাইভের আমল থেকেই সে ওখানে বসে। বৃষ্টির ঝাপটা, রোদে পোড়ানি, শীতের কাঁপুনি সে তোয়াক্কা করে না। ঠায় বসে বসে সে ঠুক-ঠুক করে গোড়ালি পেটে, চামড়া সেলাই করে, বুরুশ ঘষে। মা বলতেন, কাবুলি চটিটা এরই মধ্যে ফেলে দেবার কী আছে, মুচিকে দিয়ে সারিয়ে আনো। কোনওদিন তার নাম জিজ্ঞেস করিনি। পাড়ার লম্বা-চওড়া লোকেরা এসে বলত, ও মুচি, তাড়াতাড়ি পাম্পশু জোড়া পালিশ করে দাও তো! তার বসে থাকার ভঙ্গি, মুখ, চোখ কোঁচকানো হাসি, ফাটা বাঁশের মতন গলার আওয়াজ, সব মনে আছে, তার নাম জানি না।

(২)

প্রায় প্রত্যেকদিন একটা লোক বাড়ির মধ্যে আসে, বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে একজন মানুষ বটে, কিন্তু তার নাম নেই। সত্যেন দত্ত তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সে অবশ্য তা জানে না। স্কুলে আমরা সেই কবিতা পড়েছি, ব্যাখ্যা লিখেছি, তবু বাড়িতে তার সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। খালি পা, কোমরে হাফ লুঙ্গি, সবসময় মুখ নিচু করে থাকে। কাজের মেয়েটিও হাঁক দিয়ে বলে ওই যে মেথর এয়েছে! আমার স্ত্রী নরম করে বলে, জমাদার!

বছর কয়েক আগে আফ্রিকার নাইরোবিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই তো গত মাসে চিনদেশে। দু'জায়গাতেই মেথররা জুতো-মোজা পরে, ফুলপ্যান্টে শার্ট গোঁজা, তাদের প্রত্যেকেরই নাম আছে। আমাদের মুচি-মেথরদের ভোটের সময়ও নামের খোঁজ পড়ে কিনা, আমি জানি না।

লাল রাস্তায় খড় বোঝাই গাড়িটি

লাল রাস্তায় খড় বোঝাই গাড়িটি ক্যাঁকো কুড়ুপিং শব্দ তুলে
যাচ্ছে পৃথিবীর মন্থরতম গতিতে
পেছন দিক থেকে মনে হবে, গাড়োয়ান ও গোরুদুটি অদৃশ্য
সোনালি খড়েরা পিঠোপিঠি শুয়ে রোদ্দুরকে দিচ্ছে রং
বাতাসে দু'-একটি পলাতক
আমি সাইকেল চেপে আসছি, পাশ কাটানো যাচ্ছে না।
মাঠ-উজাড় ধানলতা আপন মনে চলেছে দুলকি চালে
সাইকেলের রিরংসা রিরংসা ধ্বনি চালকটি শুনতে পায় না
ধ্যানী বুদ্ধের মতন তার আধবোজা চোখের নিরাসক্তি
গোরু দুটিরও যাত্রা শুরু আড়াই-তিন হাজার বছর আগে
এমনও হতে পারে স্বয়ং ঈশ্বরই এই গাড়িটির চালক
তাঁর কোনও তাড়াহুড়ো নেই
লাল রাস্তা চলেছে অসীমের দিকে সোনালি খড় পিঠে নিয়ে
ক্যাঁকো কুড়ুপিং ক্যাঁকো কুড়ুপিং সংগীত শুনছে এই ব্রহ্মাণ্ড
এর মাঝখানে আমি এক সাইকেল আরোহী, আমার ছটফটানি
আমি অনন্তের কেউ না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বদ্ধ জীব
মানুষের ফসল নিয়ে মানুষ কাড়াকাড়ি করে, সামনে চলেছে খড়ের গাড়ি
বাঁধের এক পাশে ক্ষুদে নদী, অন্যদিক বড় বেশি ঢালু
ঈশ্বরবাবু যখন পথ ছাড়বেন না, তখন অগত্যা কী আর করা যায়
আমি সাইকেল থামিয়ে হিসি করতে করতে গান গাই...

উপকথার জন্ম

একটা গোলাপ বাগানে চাঁদের আলোয় মধ্যরাতে
শুয়েছিল আকুল মূর্ধজা, নীল শাড়ি আলুলায়িতা এক কুমারী
তার দুঃখের গল্পটি কেউ জানে না, সেই ভুলুণ্ঠিতার
চোখের জলে ভিজেছিল মাটি
বৃষ্টি নেই অনেক দিন, সে আকাশের মতন কেঁদেছিল
গাছেরা সবসময় তৃষ্ণার্ত থাকে, কিন্তু অনেকেই জানে না
পিঁপড়েরা নারী-অশ্রু বড় ভালোবাসে
তুষারপাতের মতন জ্যোৎস্নায় নিঃশব্দে ছুটে আসে পিঁপড়েরা
কোন অজানা দূর দেশ থেকে
চোখের নিমেষে তারা চেটে নেয় সবটুকু চোখের জল
সেই রাত্রিটি যেন কল্পান্ত, ভোরের বাতাসে ওড়ে
অজস্র রেশমি নীল রুমাল
সংগীতের মতন প্রথম আলো এসে জাগায় ফুলগুলিকে
পিঁপড়েদের জগতে ঘণ্টা বাজে, রানি পিঁপড়ের কোল জুড়ে
আসে এক মানুষীর অশ্রুজাত সন্তান
এসব কথা তো সবাই জানে, দিন কাটে, নব-বর্ষায় এলোমেলো বাতাস
ফিসফিস করে বলে এক গুপ্ত কাহিনী
আয়নার সামনে চুল খোলা কোনও ব্যর্থ প্রণয়িনী দাঁড়ালেই
শুনতে পায়
গোলাপের গন্ধ মাখা এক সদ্য শিশুর কান্না...

সেই মুহূর্তে নীরা

শিশির-ভেজা ঘাসে তোমার চাঁপা রঙের পা
তোমার চোখে চোখ রেখেছে
সদ্য ফোটা জুঁই
সেই মুহূর্তে নীরা, তুমি টেরও পেলে না
ফুলকে ছেড়ে ভ্রমর বলল,
কিশোরীটিকে ছুঁই!

যুবতী ছিলে, কোন পুণ্যে ফের কিশোরী হলে
নদীর ধারে ছড়িয়ে দিলে
নগ্ন বাহুলতা
অনন্তও থমকে যায়, সময় পথ ভোলে?
চোখে তোমার স্বর্গ-স্মৃতি
ওষ্ঠে অমরতা!

অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকো একটুক্ষণ, নীরা
যেন অলীক না মনে হয়
মিলিয়ে যেয়ো না
সময় বড় জেদি, এখন কালের প্রহরীরা
নতজানু হয়ে তোমার
জড়িয়ে ধরুক পা!

কোন অসমাপ্ত অভিযান

পুরনো তোরঙ্গ থেকে উঠে আসে বাল্যকাল
দোমড়ানো মোচড়ানো জামা প্যারাসুট সিল্ক, কুঁচ ফল
ন্যাপথলিন গন্ধ মাখা একটি ধূসর ছেলে
এইমাত্র ছুটে গেল বারান্দায়—
উঁকি দিয়ে দেখি, যতক্ষণ দেখা যায় তাকে
উঠোনের একপাশে ছাইগাদা, তাড়া খাওয়া ভামের মতন
এক লাফে পার হয়ে নিমেষে অদৃশ্য হল জারুল বাগানে
কতটা নিবিড়? কত দূর? অন্য প্রান্তে নদী আছে নাকি?
থাকুক বা না থাকুক, নিরালা জলের রেখা এঁকে দিই আমি
একটি তালের ডোঙা স্বচ্ছতায় দুটি হয়ে আছে।

কেন বুকে চাপ এল, উড়ে গেল রাঙা দীর্ঘশ্বাস?
বিকেলে ঝড়ের গন্ধ, ধুলো-বৃষ্টি মাখামাখি
সেই সব দিন
সবুজ আঁধারে মিশে যাওয়া, একা ঘুরে ঘুরে
বই পড়া দুঃখ উচ্চারণ

গাছের ছায়ার পাশে অন্য ছায়া, পিঁপড়ের সারির মতো
স্বপ্ন চলে যায়
হাঁটুর নুনছাল ওঠা জ্বালা,
দগ্ধ দুপুরের মতো সর্বগ্রাসী খিদে
কে আর সেখানে ফিরে যেতে চায়? কোন অসমাপ্ত অভিযান?
জারুল জঙ্গল ছেড়ে নদীতীরে বরং একটি নারী
দু'বাহু বাড়ায়।

বিন্দু বিন্দু

কোকিল

এক যে ছিল বাউল, হায়, সেও হল সংসারী
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও দুই পাশে দুই নারী
কত মহান শিল্পী এখন সোনার কারবারি
শুধু কোকিল চায় না আজও নিজস্ব ঘরবাড়ি।

বাঘ ও পিঁপড়ে

বাঘ ও পিঁপড়ে দুই বন্ধুতে ধরেছে জবর বাজি
সামনে একটা বেচারা মানুষ, কে কেমন ভাবে
জিতে নিতে তাকে রাজি!
বাঘটা বলল, ছোঃ ও দু' পেয়ে দুব্‌লার আমি
চোখে নিমেষে ঘাড়টিকে মটকাবো
পিঁপড়ে বলল, ও লোকটা কবি, ওকে ভাই আমি
সারাটা জীবন
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবো!

কবিতা-গদ্য

একটি কবিতা কবুতর হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে
তবু মেঘহীন সন্ধ্যায় কবি ঝড় ঝঞ্ঝাটে আটকা

কাজ-অকাজের দু'খানা কেল্লা গোলাগুলি ছোড়ে গদ্যে
কে জেতে কে হারে, ভুরু সন্ধিতে তাই নিয়ে চলে ফাটকা!

আলো-অন্ধকার

আলোর গর্ব সে সব কিছুই উজ্জ্বল করে দেয়
অন্ধকারটি শুধু সে দেখাতে পারে না
অন্ধকারেরও গর্ব রয়েছে, আলোকেই সে ছড়ায়
দূরে চলে যায়, লুকোয়, তবুও হারে না!

প্যাঁচা ও জোনাকি

প্যাঁচা হেসে বলে, ওরে ও জোনাকি, তোর দুঃখের
নেই যে সীমানা
আলো পেলি তবু জ্বলে সেটা তোর মাগ্যে!
জোনাকিটি বলে, দিনের বেলায় সূর্য জ্বলেন
তবু তুমি কানা
দেখছো তো ভাই, যার যেটা আছে ভাগ্যে!

দেশ

হিন্দু এবং মুসলমান
করল দেশটা খান খান
কোন দেশ ভাই, কোন দেশটা?
উড়ে এল বহু উপদেষ্টা।
বলল, এ দেশের নেই তুলনা
দুটো জাত ছিল, মানুষ ছিল না!

কে আগে?

ডিম আগে, না মুরগি আগে?
মেঘ আগে, না জল?
প্রেম আগে, না চুমুর ইচ্ছে?
ফুল আগে, না ফল?

কাব্যে উপেক্ষিত

একটি মেয়ে, আর কিছু না, আয়নামুখী, টিপ পরছে
পুরুষ কেন তাতেই মুগ্ধ, মেয়েরা তা জানে কি?
পুরুষরাও তো চুল আঁচড়ায়, দাড়ি কামাচ্ছে সাঁতার কাটছে
সবই কি গদ্য? মেয়েরা কেউ জানল না এর মানে কী?

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর প্রেম করেননি, কাজ-পাগল, ছিলেন বেরসিক
না লিখলেন কবিতা বা গল্প উপন্যাস
হেরে গেলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের প্রবল খ্যাতির কাছে
এঁরাই হলেন এ কালের বাল্মীকি-বেদব্যাস।
নারীর দুঃখে কত কাঁদলেন বিদ্যাসাগর সারাজীবন, হায়রে
অর্থ এবং আয়ু কতই খোয়ালেন সে খেয়ালে
নারীরা কেউ মনে রাখেনি, স্কুলের বালিকারাও এমনকী
টাক মাথা ওই কুরূপ ছবি টাঙায় না দেওয়ালে!

চাঁদ

আজকে চাঁদের নীলাভ বর্ণ, কাল ছিল হলদেটে
ফুসফুস রোগী চাঁদ খায় রোজ নিমপাতা রস বেটে।
বৃষ্টির দিনে চাঁদের খাদ্য নিছক ফটিক জল
দেবরাজ খান সোমরস, আর মহাদেব হলাহল।
উর্বশী যদি স্বর্গ সভায় নিলাজ নৃত্যে মাতে
সেদিনের চাঁদ রক্তিম হয় ঈর্ষার মৌতাতে।

পুরুষতন্ত্র

সত্যি করে বলো তো দেখি, কে বেশি ভালোবাসে
প্রেমের মূল্য কে বেশি বোঝে, পুরুষ কিংবা নারী?
প্রশ্নকারী, কে তুমি বটে, পুরুষ নও? সবাই এটা জানে
উকিল এবং বিচারকের সান্ধ্যসভায় পুরুষই দলভারী!

শাশ্বত

রোমিও এবং জুলিয়েট আর কৃষ্ণ এবং রাধা
যদি ফিরে আসে কী দেখবে পৃথিবীতে?
এত হুড়োহুড়ি, তবুও নিভৃতে দৃষ্টি সেতুতে বাঁধা
কারা যেন আছে, যারা শুধু দেয়, কিছুই চায় না নিতে।

বিদেশ স্বর্গ

মা-বাপ বাঙালি, এই দেশে যার জন্ম ও খেলাধুলো
তবুও শেখেনি গরিমা মাতৃভাষার
বিদেশ স্বর্গ, কাঁচুমাচু দিন, কূপমণ্ডুক রাত
সুট-টাই পরে পা চাটতে হয় চাষার!

যুগলবন্দি

মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, আবার বৃষ্টি শুরু?
প্রেমিক এবং চাষা, দু'জনের কুঁচকে গেল ভুরু।
সারা বছর বৃষ্টি নেই, ফসল সব উজাড়
রাষ্ট্রনায়ক, ছিঁচকে চোর, দু'জনেরই মুখ বেজার!

নেশাখোরের স্বীকারোক্তি

সিগারেট ছোঁননি শ্রীরামচন্দ্র, হজরত মহম্মদ
ব্যাপারটা জানতেনই না
যিশুখ্রিস্ট কিংবা তাঁর বড়দা বুদ্ধ চালিয়ে গেলেন পান-তামাক বিনা
শেক্সপিয়ারকে ফুক ফুক টানা ধরাতে পারলেন না
স্যার ওয়ালটার র‍্যালে
ধোঁয়ার নেশায় যে কী তরিবৎ তা কেউ জানতই না কালিদাসের কালে
মাইকেল চমকিয়ে দিলেন সারা দেশটা, ঠোঁটে সিগারেট, স্বামী বিবেকানন্দর
আঙুলে চুরুট, যুব সমাজ ধোঁয়ার নেশায় কুপোকাৎ
দাদারা ধরলেন, খুড়তুতো ভাইদের হাতেও নল-সটকা

টললেন না তবু রবীন্দ্রনাথ!

আমার বাবার ছিল নস্যির নেশা, জ্যাঠামশাই থাকতেন গা বাঁচিয়ে
অনেক দূরে বসে
বাবা না জ্যাঠা, কাকে যে অনুসরণ করি, বুঝতাম না সেই বয়েসে।
তারপর বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় দিনকাল, শক্তিই প্রথম হাতে তুলে দিয়ে
বলল, দিয়েই দেখো না একটান
ক্রমে ক্রমে জমল বেশ নেশাটা, যখন শূন্য পকেট, শরীর ছটফট
দেখি যে সবাই দিয়েছে পিঠটান।
এখন আর আমি সিগারেট খাই না, প্রতিদিন সিগারেটই
কুরে কুরে আমাকে খায়
ডাক্তাররা বারণ করে খুব, তারপর ড্রয়ার খুলে বলে, খাও না একটা
আপাতত, কী আসে যায়।
অন্ধকার ছাদে বসে আছি, বুকে চিনচিনে ব্যথা, কিছুতেই টানব না
সিগারেট, দেখি কী হয়
আকাশ দেখছি না, প্রেমেও মন নেই, শুধু সিগারেট-ভাবনায় বয়ে যাচ্ছে সুসময়।
মদের নেশা যখন তখন ছাড়তে পারি, বোতল রয়েছে তবু দু'দিন খেলাম না
সিগারেট জড়িয়ে ধরল ধোঁয়ার ফাঁসে, এ যেন মাকড়সার জাল,
এ জীবনে ছাড়া পেলাম না!

যারা কখনও বিড়ি-সিগারেট-চুরুট ফোঁকেনি, লিখেছে সাংঘাতিক কবিতা,
তাদের পায়ে শত শত কোটি প্রণাম
ধোঁয়া ও নেশামুক্ত কবিতা, নির্দোষ ও ডেটলে শুদ্ধ, সহস্রায়ু হও, মুছে
যাক আমার মতন পাপিষ্ঠের নাম!

জয় একদিন...

জয় একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস বা স্বগতোক্তি করেছিল
'দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে', একথা
কেন লিখলেন রবীন্দ্রনাথ?
এত পেয়েছেন তিনি, এত সার্থকতা, যখন যা ইচ্ছে করেছে
লিখেছেন—

আমি আলটপকা বলতে গেলাম, তবু অতৃপ্তি আর হাহাকার,
সবসময় অসম্পূর্ণতার বোধ না থাকলে তো লেখা হয় না
কবিতা...
না, এত সাধারণ, এত মামুলি উত্তর দেওয়া যায় না। বরং
তেরোশো চার সালে কোনও নিকটতমা ভাসমান তরীর মতন
সরে যাচ্ছে নদীর অন্য পারে, তাই এই সাময়িক দুঃখবিলাস
কেন না, সেদিনই একটু পরে আবার লিখেছিলেন,
'ভালোবেসে সখী,
নিভৃত যতনে... আমার আকুল জীবন মরণ টুটিয়া-লুটিয়া
নিয়ো...'
না, এই উত্তরও ঠিক নয়, এই তথ্যে কোনও সারবস্তু নেই
আমার বলা উচিত ছিল, এটা তুমি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেই
জিজ্ঞেস
করো না কেন, জয়? তিনি তো প্রায়ই তোমার রানাঘাটের
বাড়ির
লেখার টেবিলের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়ান
সম্রাটের মতন এবং রামকিঙ্করের গড়া মূর্তির মতন অবশ্যই
এবং প্রত্যেক মহান কবির মতনই তিনি বৈপরীত্যের বরপুত্র,
আঙুলে কলমে কালি ভরা দ্বিধা
তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে দেখছেন তোমার নিভৃত মুহূর্তগুলির
বিমূর্ত নির্মাণ, বাইরে ঝড় বাদলের রাতের পাগলামি
শেষ ট্রেন চলে গেছে, তোমার আর কোনও বন্ধু আসবে না
দরজাটা খানিকটা খোলা, টেবিলে জ্বলছে লোডশেডিং-এর
মোম
তোমার ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে, নিস্তব্ধতায় পাথর হয়ে গেছে
তোমার
না-ছোঁওয়া ভাত। কপালে একটু একটু জ্বর, তুমি মুখ
ফেরালে, দেখলে
এবার জিজ্ঞেস করো! পারবে? সত্যি পারবে? তোমার ভয়
করবে না?
যেদিন ওই লাইনটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজ তুমিও যে
সেই একই বয়েসি!

প্রথম প্রশ্ন

যখন আমি মাতৃগর্ভে একটা নখ-দন্তহীন
মাংসপিণ্ড হয়েছিলাম
তখন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা
নীরা নাম্নী এক নারী দাঁড়িয়ে আছে নদীর কিনারায়
হাওয়ায় তার আঁচল উড়ছে স্বর্গের নিজস্ব পতাকার মতন
তার সামনে তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবা
এই দৃশ্যটি দুলতে থাকে অন্ধকার ভেদ করে
তারপর আমি ভূমিষ্ঠ হলাম এক বিদ্যুৎ ঝলসানো রাতে
কে যেন আমার ঠোঁটে মাখিয়ে দিল মধু, চোখে
গোলাপ জল
আমার তখন মনে হচ্ছিল, ওসব আদিখ্যেতার দরকার
নেই, নীরা কোথায়, কোথায় সেই নারী
তারপর বহু বছর কেটে গেছে, সেই স্বপ্ন
একেবারে মিথ্যে হয়নি
মাঝে আমি দেখতে পাই নীরাকে, শুধু নদী প্রান্তে নয়
উপত্যকার ধার দিয়ে হেঁটে যায় নীরা
কিন্তু তার সামনের সেই যুবকটি কে ছিল? তাঁকে
খুঁজে পাই না, খুঁজে পাই না, খুঁজেই চলেছি...

তিনটি অশ্ব

গলাকাটা বটগাছের তলায় তিনটি অশ্ব নিশি পোহাচ্ছে
অন্ধকার না তেমন অন্ধ, কিছুটা কিছুটা দুধ মিশে আছে
লক্ষ্মী প্যাঁচাটি আরও সাদা হয়ে উড়ে এল নিচু গাছের তলায়
দলবল বেঁধে আসে নীরবতা, আঁজলা পুকুরে মৃদু দোল খায়।

একটি ঘোড়ার চোখ নেই, তার নাভি সম্বল, ছুটবে এবার
এক জাদুকর ছপটি মেরেছে দিক-দিশা সব ঘুচিয়ে দেবার
দুরন্ত তেজে ছুটছে সে ঘোড়া দৃশ্যবিহীন দিগন্ত ছিঁড়ে
প্রান্তর জুড়ে ধুলোর ঝড়ের চিহ্ন থাকে না ঘাসের শিশিরে।

দ্বিতীয়টি পীত, পলাতক এক রাজকুমারের প্রিয় বয়স্য
নভোনীল যেই চিরবে তখনই সে হবে অশ্বমেধের অশ্ব
সারাটা অতীত কাল জুড়ে ছিল চোখের পলকে বিদ্যুৎগতি
আজ রাত্রিই শেষের রাত্রি, প্রতি নিশ্বাসে ঝরছে নিয়তি।

অতি সুপুরুষ কালো ঘোড়াটিকে যত্নে দিয়েছি কত দানাপানি
অতল গহনে বারবার গেছি মৌলিকতার পেয়ে হাতছানি
রতি অভিসারে দশদিক খোলা, ছন্দ ভুলের এমন রঙ্গ
অলীকবাহনও, তবুও আমার জীবন পেল না জীবন সঙ্গ!

শব্দ-ছবি

'রূপসী' শব্দটির যদি ছাপার ভুল হয়;
কী বীভৎস দেখায়!
যেন সুন্দরীর কপালে বিষ ফোঁড়া
শব্দ এমনই এক ছবি যা সামান্য ভুল রং সহ্য করে না
কালো মেঘলা দিনে ছোট্ট ঘরে কোনও বইয়ের পৃষ্ঠায়
'রূপসী' শব্দটি দেখা মাত্রই জানলার কাছে এসে সে দাঁড়ায়
বিশেষ রমণী নয়, সমস্ত রূপের সারাৎসার
এক জীবনের যাবতীয় কল্পনায় রেখা ও আয়তন
মাটির প্রতিমা থেকে ক্রমশ মানবী হয়ে ওঠা
'রূপসী' থেকে যদি সামান্য র-এর ফুটকিও বাদ পড়ে
কোনও ছবি নেই, সব অন্ধকার!
অন্য ভাষার একজন কবি আমার মুখে রূপসী শব্দটি শুনে
ভ্রূক্ষেপও করল না
বাংলার রূপসীকে চিনতেই পারল না সে
তার ছবি আর আমার ছবি এতই আলাদা যেন
ছাপার অক্ষরের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি দু'জনে।

শিল্প

উত্তুরে আলো আড়াল করে কে দাঁড়াল
ছবি ভেসে যায় বর্ণে
ওরে ও ভিখারি, না পারিস যদি মূর্ত
দ্বিতীয় দেখার বর নে!

সৃষ্টির রেখা আকাশে কিংবা অতলে
ধরা-ছোঁওয়া এত শক্ত
আয়ুর সীমানা মহাকালে দেবে পাল্লা
বলিহারি তোর শখ তো!

শিল্প কখনও দেখায় এমন ছলনা
সুধার বদলে অন্ন
ওরে ও ভিখারি, আয়নায় মুখ দেখে নে
স্বরচিত নাকি অন্য!

দুর্বোধ্য

—পৃথিবীতে অলৌকিক বা দুর্বোধ্য কি আর কিছুই নেই?
—আছে আছে, ঢের আছে, তবে খাঁটি লৌকিক কিছু যদি
খুঁজতে চাও তার নাম খিদে
যেমন আকাশ ভরা এত দুর্বোধ্যতা, কিন্তু
একমাত্র ক্ষুধার্ত মানুষই একটুও দুর্বোধ্য নয়!
—এ কী অদ্ভুত কথা, মানুষ দুর্বোধ্য নয়?
—মানুষ বলিনি, বলেছি ক্ষুধার্ত মানুষ
—ক্ষুধার্ত মানুষের সব কিছু বোঝা যায়?
শুধু খিদেটাই তার মনুষ্যত্ব, আর কিছু না?
—খিদের সময় যে সব কিছুই অবান্তর হয়ে যায়
সে রূপ দেখে না, সে প্রেম জানে না।

মাথা ঘুমিয়ে পড়ে, জেগে থাকে শুধু উদর
—তুমি কী করে জানলে? তুমি কি দিনের পর দিন
না খেয়ে থেকেছ? তুমি কি
দিনের পর দিন আকাশে না তাকিয়ে খুঁজেছ
খুদ-কুঁড়ো? তুমি কি দেখেছ তোমার
উপবাসী সন্তানকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে?
—না, তা দেখিনি অবশ্য
—তবে তুমি কী করে জানলে তার কান্নার মধ্যে কোনও
স্বপ্ন মিশে থাকে কি না? কোন অভিজ্ঞতায়
তুমি সাতকাহন করে লেখো তার দুঃখের কথা?
—সে যে নিজে কখনও লেখে না! সে যে কলম চেনে না,
তা হলে কি লেখাই হবে না তার কথা?
—এক হাজার পৃষ্ঠা লিখেও তুমি ঘোচাতে পারবে
তার খিদে? এতগুলি শতাব্দী ধরেও
ঘোচানো যায়নি তার রহস্যময়তা,
সে যে মানুষ!

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ, কে শুনছে কার কথা!
বাতাস দুলছে অন্ধকারে, হাসছে নীরবতা।

খয়েরি মেয়ে চুলের গোছে গুঁজেছে লাল ফুল
পাশের পুরুষ ঘাড় ফেরাল, চক্ষু জুলজুল।

সোনার মতো মুখ যে মেয়ের পা দু'খানি ঢাকা
মাটিতে গড়া নিম্ননাভি, এখনও কাদা মাখা।

বোতাম খোলা হলুদ যুবার হাসিতে পৌরুষ
উরুর ফোঁড়া চুলকে যাচ্ছে, সে দিকে নেই হুঁশ!

যার তলোয়ার ধরার কথা, সে বসেছে তাসে
দূরের দুটি নীলকমল কী চায় বুঝল না সে।

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ, কে শুনছে কার কথা
কবি এখানে কী করছে? হাসছে নীরবতা।

চূর্ণ-কবিতা

১

দাওয়ার খুঁটিতে এলিয়ে শরীর বসে আছে ফুল্লরা
ঝাপসা দু'চোখ, ময়লা ওষ্ঠে অশ্রুত বারমাস্যা
ক'টা শতাব্দী পার হয়ে গেল? বাঁকুড়ার গ্রামে জ্যান্ত বাঁধানো ছবি
কবিরা অনেক লিখেছে, এবার সিনেমার লোকে বারবার নেয় ওকে।

২

তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি মানুষকে ভালোবাসো না, অথচ দেশকে ভালোবাসো কেন?
দেশ তোমাকে কী দেবে?
দেশ কি ঈশ্বর?
তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
গুলি বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিলে দেশ কোথায় থাকবে?
দেশ কি জন্মস্থানের মাটি, না সীমানা?
বাস থেকে নামিয়ে তুমি যাকে হত্যা করলে তার বুঝি দেশ নেই?
তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি কী করে জানলে আমি তোমার শত্রু?
কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তুমি আমার দিকে
রাইফেল তুলবে?

৩.

আগের জন্মে ছিলাম আমি ছপটিওয়ালা
এই জন্মে ঘোড়া
নিজের পিঠে চাবুক মেরে ছুটছি, আমার
ভ্রমণ বিশ্বজোড়া!

তবু এই গৃহহারা

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে
সেখানে তৃষ্ণার কোনও শান্তি নেই
তবু এই তৃষিতটি কেন ওই পথে যেতে চায়?

সকলেরই গৃহ আছে, সকলের নিজস্ব সীমানা
যেখানে অর্ধেক মৃত্যু অর্ধেক জীবন
তবু এই গৃহহারা কেন যায় জলের কিনারে?

শিল্পের নিয়মে

পুকুরে তেজি শরীর নিয়ে ডুব দিচ্ছে একটা পানকৌড়ি
তিনটে হাঁস আড়ষ্ট হয়ে জল ছেড়ে উঠে গিয়ে
বসে রইল কদম গাছের তলায়
ওরা কি পানকৌড়িটিকে ভয় পায়?
এই বহমান জীবনের যে-কোনও একটা টুকরোই হয়ে
উঠতে পারে কবিতা
দোতলার জানলা দিয়ে আমি দেখছি পানকৌড়িটার
চোরা ডুব সাঁতার
ওকে নিয়ে একটা কবিতা লেখা যায় না?
কাগজ কলম নিয়ে বসতেই প্রথমে এই লাইনটা আসে:

'যেন একটা উল্‌কা ফুল, ঝুপ শব্দে পড়ল এসে জলে
রাজকন্যার মতন এক মাছরাঙা—'
আমি কলম থামাই, পানকৌড়িটা মাছরাঙা হয়ে গেল
কী করে?
আমি তো মাছরাঙা দেখছি না, তবু কবিতায় সেই পাখিটা
এসে গেল, সে কি নানা রঙে সুন্দর বলে?
কিংবা নিছক বাস্তব নিয়ে কবিতা হয় না, শিল্পের নিজস্ব
নিয়মে দৃশ্য বদলে যায়?
অথবা পানকৌড়িটা বঞ্চিত হল তার কালো রঙের জন্য?
আমরা কালো দেশের মানুষ, তবু আমরা বর্ণবিদ্বেষী
আমার গায়ের রঙও ঝিরকুট্টি কালো, নিজের হাতখানার দিকে
চেয়ে আমার হাসি পেয়ে গেল
আমাকে নিয়েও কেউ কোনওদিন লিখবে না প্রেমের কবিতা!

পাগলাটে গলার স্বর

মঞ্চে গলা কাঁপিয়ে দেশোদ্ধার করছেন একজন জন-গণেশ
এরই মধ্যে খুব কাছে চলে এল একটা আধ-পাগলা
খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা মুখে প্রশ্ন করল,
অধর সরকার লেনটা কোথায়, কোথায়, কোথায়
রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি
এত ব্যস্ততার মধ্যে একী অবান্তর প্রশ্ন
একজন ভবঘুরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে তো কী হয়েছে
যে কোনও রাস্তাই তো তার পক্ষে যথেষ্ট
তবু বক্তৃতার মাঝখানে সে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল:
ওগো বলো না, বলো না, কোন দিকে
এরকম এক উটকো হতভাগাকে ঠেলতে ঠেলতে
মাঠের বাইরে নিয়ে যায় ভলান্টিয়াররা
তার নোংরা ময়লা চাদরটা একজন ছুড়ে দেয় জুতোর ডগায়
তারপর সব কিছুই চলতে থাকে আগের মতন
শুধু সেই জ্বালাময়ী ভাষণের মাঝে মাঝে শোনা যায়
একটা পাগলাটে গলার স্বর
ওগো, হারিয়ে ফেলেছি, বলো না, কোন দিকে, কোন দিকে...

রক্ত

১.

বুকের রক্ত দিয়ে কবিতা লেখার দরকার নেই
তাতে কবিতা হয় না
রক্ত জিনিসটা লেখার পক্ষে সুবিধের নয় মোটেই
না হলে কালি-ব্যবসায়ীরা প্রচুর খাঁটি রক্তই
বোতল বোতল ভরে চালান দিত না?
মানুষের রক্ত তো বেশ শস্তা এদেশে
যারা সত্যি সত্যি মুখে রক্ত তুলে হাঁটু থেবড়ে
পড়ে যায় মাটিতে
তারা কেউ কবিতা লেখে না
হায়, তারা কবিতা থেকে কত দূরে!

২.

জয় বাবা বক্রেশ্বর বলে যারা একদিন বিলিয়ে দিয়েছিল রক্ত
তারা নিজেরাই অনেকে এখন কুঁজো অষ্টাবক্র
যার নামেই জিগির তোলো, তারকেশ্বর বা বক্রেশ্বর
রক্ত কোথাও জ্বেলে দেয় না আলো
নীল নদ একদিন মানুষের রুধিরে লাল হয়ে গিয়েছিল
ভোল্‌গা থেকে গঙ্গায় বয়ে গেছে কত রক্ত স্রোত
মাটিতে রক্ত মিশে থিকথিকে কাদা হয় শুধু
পোষা কুকুর চাটে তার ভালোবাসার মানুষের রক্ত
সেনাপতিরা রক্তের ওপর দিয়ে রথ চালাতে চালাতে
পান করে আঙুরের রস
মায়ের রক্ত চোখ দিয়ে কান্না হয়ে ঝরে, কেউ দেখে না
তোমার রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনবে? তা নিয়ে
ছিনিমিনি খেলবে উল্লুকেরা
প্রাণপণে চাঙ্গা রাখো, ধমনী, ওগো, নিজের জীবন ছাড়া
তোমার যে আর কিছুই নেই!

কেউ আমায় চিনতে পারে না

দুপুরবেলা খিদের চাবুক। তারপর রোদ্দুরে রোদ্দুরে রাস্তায়
একা। পায়ের তলায় পেরেক, সমস্ত পথই
হাঙরের দাঁত
বাতাস যেন শ্যাওলাভরা জল, এগোতে হয়
ঠেলে ঠেলে
রুমাল দিয়ে মুখ মুছলে কালো কালো দাগ
ওঠে। চোখ কড়কড় করে ধুলোয়
বাঘের মতন ছুটে আসে মিনিবাস, তুলে
নেয় না, তলায় ফেলতে চায়
কিছু লোক সব সময় আমায় ধাক্কা মেরে এগিয়ে
যাচ্ছে সামনের দিকে
এইভাবেই কি প্রত্যেকটি দিন কাটছে?

একটা ছাতিম গাছের নীচে একটুক্ষণ
দাঁড়িয়ে হেসে ফেলি আপন মনে, মাটির দিকে
চেয়ে। যেই একটা তুড়ি দেব, এই সবকিছু অলীক
হয়ে যাবে। সব কুশব্দ ছাপিয়ে ভেসে ওঠে
এক সংগীত, সব দৃশ্যের ওপর নতুন আলো
রাস্তাগুলো কী শান্ত সুন্দর নদী হয়ে দুলছে
ভালোবাসার বর্ণমালা একজন পরিয়ে দিয়েছে
আমার গলায়
আমি এক অরূপ রাজ্যের নাগরিক
কেউ আমায় চিনতে পারে না!

এই যে একটা নড়বড়ে সাঁকো

এই যে একটা নড়বড়ে সাঁকো পার হয়ে চলে যাচ্ছি
সবাই বললে, ভাঙবে, ভাঙবে, ভাঙবে!
এমন দিনেই ঝড়ের দাপট আকাশে ফোটাতে হবে!

সাঁকোটা দুলছে, প্রবল দুলছে দুলছে!

খাড়া পাড় দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেত, না হয় কিছুটা দূর
পায়ের তলায় পাথর, কাঁকর পাথর
আমার আয়ুর দু'-এক টুকরো গিলে খেয়ে নিত হাওয়া
কতটুকুই বা টুকরো, আয়ুর টুকরো!

আচম্বিতের ভেতরে ঝিলিক রুপোলি রঙের হাস্য
যদি ভেঙে যায় কী ক্ষতি, এমন কী ক্ষতি?
নদী ও আকাশ, ওপরে তলায় হোক না উলটোপালটা
তবু বেঁচে থাকা জীবন, এটাই জীবন।

দুটি মাত্র অক্ষর

স্বপ্নে নয়, বুকের মধ্যে একটা কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নীরা
হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এসো
তারপর আমি মাঠে মাঠে ঘুরছি, রোদ্দুরে ঝলসে যাচ্ছে
কপাল, কিংবা বৃষ্টি ভিজে সপসপে, ভয় দেখাচ্ছে
জ্যাঠামশাইয়ের বকুনির মতন মেঘের হুংকার
চটি ছিঁড়ে যাক, পায়ে কাঁটা ফুটুক
কিছু আসে যায় না, আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি দুটিমাত্র অক্ষরের
পরম বাঙ্ময়তা, যেন মহাকাশের সংগীত
হাট করে খুলে যাচ্ছে দুনিয়ার সব দরজা
গভীর অরণ্য থেকে ভোরবেলায় আলো এসে বলছে, এসো
এইমাত্র জন্ম হল যে-ঝর্নার, সে বলছে, এসো
মধ্য রাত্রির আকাশের শান্ত নীরবতা বলছে, এসো
শুধু প্রকৃতিতে নয়, শুধু হৃদয়ে নয়, শরীর বলছে এসো
ওষ্ঠের অমৃত, স্তনবৃন্তের উষ্ণতা, যোনির লাবণ্য বলছে, এসো
আরও পরে, আরও গভীরে, যেখানে সময়ের সঙ্গে মিশে আছে
চিরকালের শূন্যতা
সেখান থেকেও ডাক শুনতে পাচ্ছি, এসো
এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, এসো—।

যে যেমন সুখ পায়

যে যেমন সুখ পায় পাক না ক্ষতি কী
কেউ হো হো করে হাসে, কেউ দ্বেষে জ্বলে ধিকিধিক
কেউ মঞ্চ পেয়ে গেলে কারুকে ছাড়ে না
কেউ ভস্মে ঘি ঢালছে, দু'পকেট ভর্তি ধার দেনা।

মুখ নেই, নৈর্ব্যক্তিক? কেউ কেউ কে কে?
জীবন উজিয়ে চলে পাথরের চিহ্ন দেখে দেখে
এ এমন স্রোত যার বিপরীত গতি
যে-প্রণয়ে ঘুণ ধরা, সেখানেও উরুতে সম্মতি।

দুঃখের মুহূর্তগুলি মুহূর্তের ভুল
স্রোতে ভেসে যায় মুখ, মুখগুলি স্রোতে ভাসা ফুল!

অকৃতজ্ঞ

পশুদের বনবাস এই শতাব্দীতে শেষ হল
বৃক্ষরাও হারাল স্বদেশ
শুধু কি নেবে, কামড়ে ছিঁড়ে নেবে
নিশ্বাসে পুড়িয়ে যাবে
কিছু কি দেবে না
কিছুই দেবে না?

এত গাছ টেনে নেয় ভূমিরস
তারাও স্বীকার করে ঋণ
নিস্তব্ধ নিশীথে শোনা যায় পাতা ঝরানোর গান
জলে ভেসে যায় ঘর বাড়ি
তবুও জলের বুক খোলা, দু'হাত ছড়িয়ে বলে
নাও, নাও, যত পারো নাও

এক একটা আলোর বিন্দু দৃশ্যের গভীরে যায়
সিঁড়ির মতন তার বহতা নির্মাণ
মানুষ কি শুধুই ভাঙবে, ছিঁড়বে, পোড়াবে
কিছুই দেবে না?

কথা

আমি তোমাকে দেখি, তোমার সঙ্গে কথা বলা হয় না
সকালের নরম হাওয়ার মধ্যে দেখি, শেষ বিকেলের
চূর্ণ আলোর মধ্যে দেখি
বৃষ্টির মধ্যে তুমি চৌরাস্তায় ট্যাক্সি খোঁজাখুঁজি করছিলে নীরা
আমি তখন চলন্ত ট্রামের জানলায়
ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসব থেকে তুমি বেরিয়ে এলে
খুশির প্রতিমা হয়ে
আমি তখন মুচির সামনে বসে ছেঁড়া চটি সেলাই করাচ্ছি
মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে তুমি আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে
আমাকে দ্রুত নেমে যেতে হল পাতাল রেলে
একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, মনে আছে?
সেদিন আগুন জ্বলছিল সারা শহর জুড়ে
সমস্ত লোক চিৎকার করছিল অন্যরকম কণ্ঠস্বরে
এরকম সময় কথা বলতে নেই, কথাগুলি সব নিঃস্ব হয়ে যায়
এক একটা ভুল কথায় নষ্ট হয়ে যায় কবিতা
প্রজাপতির গায়ে আগুনের আঁচ লাগার মতন ভুল শব্দে
পুড়ে যায় ভালোবাসা
দু' একটা না-বলা কথা সারাজীবন বৈদূর্যমণির মতন
দীপ্যমান হয়ে থাকে বুকের মধ্যে...

যে যার অন্য বাড়ি

লাস্ট ট্রেন সওয়া বারোটায়, ইঞ্জিন ড্রাইভার প্লাটফর্মে
নেমে আভূমি সেলাম করে বলল
আমার নাম ইয়াকুব, তুমি কোথায় যাবে ভাইজান?
লম্বা রেলগাড়িটা অসহিষ্ণু হিসহিস শব্দে ল্যাজ আছড়াচ্ছে
সারাদিনের শেষে কেউ একজন এরকম বুক-ছোঁয়া কথা
না বললে
আমি খড়ি দিয়ে লেখা আমার নাম মুছে দিতাম!
আমি বললাম, ইয়াকুব ছায়েব, আমার সবকটা গাঁটের
মোমছাল উঠে গেছে
আমার তো কোনও ঠিকানা নেই!
ইয়াকুব বলল, চমৎকার, আজ আমরা কোনও চেনা স্টেশনের
যাত্রী নিচ্ছি না
আমরা যে-যার অন্য বাড়িতে যাব!

নিঃশব্দ ফুলের মতো ফুটে আছে অন্ধকার
সুতোর ম্যাজিকের মতন ছুটে যাচ্ছে ট্রেন
একটা ফোয়ারার মতন আনন্দ নেমে আসছে ঠান্ডা আকাশ থেকে
যুদ্ধ থেকে বাড়ি-ফেরা সৈনিকদের মতন গান গাইতে গাইতে
কারা যেন আসছে যাচ্ছে
এক কামরা থেকে অন্য কামরায়
কেউ কারুকে চিনি না, ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে খাবার
একটাও লেভেল ক্রসিং নেই, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ব্রিজগুলো
জামাগুলো পাখার সঙ্গে বেঁধে দুলছে ও কে?
ছুটে যাচ্ছে ট্রেন, নাচের ছন্দ লেগেছে চাকাগুলোয়
আগুনের ফুলকি হাততালি দিচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে ট্রেন
আমরা সবাই আজ অন্য বাড়িতে যাব
আমরা প্রত্যেকের যে-যার অন্য বাড়িতে যাচ্ছি...

খেলা

দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করার বিলাস
প্রথম যৌবনে ছিল।
ভাবতাম,
নদীর আকাশে লঘু মাছরাঙা পাখির মতন
মৃত্যুর দুধারে ঘেঁষে ছুটোছুটি
জীবনকে রূপরস দেয়
বারবার
আমি কি যাইনি সেই মৃত্যুমুখী দক্ষিণের ঘরে?
বাঁধের কিনার থেকে গড়ানো বন্ধুর হাত ধরে থাকা
আন্তরিক মুঠি
যমদণ্ড দেখেছিল।
যৌবনে এসবই খেলা!
যখন মানুষ মরে, একবারই জীবনে মরে,
তারপর আর কোনও খেলা নেই।
আর কোনও অস্পষ্টতা, নদীর কিনারে বসে থাকা নেই।
হঠাৎ বিমান থেকে বাচাল মেশিনগান ফুঁড়ে যায় দেহ
এখন যা শকুন ও কুকুরের ভোগ
আর কোনও খেলা নেই।
বন্ধুরা হারিয়ে যায়, আমার একটুকরো
আত্মা নিয়ে যায়
তখনই সিঁড়ির কাছে নীরার নিস্তব্ধ মূর্তি
চোখ দিয়ে ডাকে
ভুরু থেকে ঠিকরে আসে বিকেলের আলো
আমার দু' হাত
যেন ডানা হয়ে যায়
গোড়ালিতে ধাক্কা দেয় ঝড়
আমি শূন্যে ঝাঁপ দিই।

বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো

হঠাৎ একটা দিন হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় লেখা চিঠির মতন
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হল,
কোথায় যেন যাবার কথা ছিল?
কেন বেজে উঠল সাইরেন, অথচ ইস্কুল সব ছুটি
আমার পকেটে অন্য লোকের নামের আদ্যক্ষর বসানো রুমাল
জুতো জোড়া গতকালও এমন আঁট ছিল না
হঠাৎ একটা দিন যেন অন্য জীবন-যাপন থেকে উড়ে আসা

ঘড়ির কাঁটা মেলাবার জন্য আর একটা ঘড়ি দরকার
টেলিফোন স্তব্ধ, আর একটা ফোনে জানাতে হবে অভিযোগ
বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো, উপুড় হয়ে শুয়ে থেকো না
মনে করো, তুমি গেলে শিয়ালদা স্টেশনে, ঠিক সেই সময়
হাওড়ায় তোমার মতনই আর একজনকে চাই
বউদির ছোট বোন যাকে খুঁজতে এসেছে, সে কি তুমি? কিংবা
তুমি নও
সব দৃষ্টির আড়ালে অন্য এক দৃষ্টি, গল্পের মধ্যে অন্য গল্প
কেউ যেন হেঁকে বলছে, পেছন দিকে এগিয়ে যান, পেছন দিকে
এগিয়ে যান
পাতাবাহার দিয়ে সাজানো ফুল, ফুলই শুকিয়ে যায় আগে
বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো, উপুড় হয়ে শুয়ে থেকো না
তোমারই নামে এসেছে চিঠি, একটা শব্দও বুঝতে পারলে না তুমি।

কঙ্কালের কপালে চন্দন

সত্যিই তো একটা রাক্ষস হাঁ করে আছে
আমার পিঠের দিকে
তাকে দেখতে পাই না, তার গরম নিশ্বাস
আমার ঘাড়ে লাগে

এক সময় সে ছিল সামনে
তার ভয়ংকর দাঁত দেখে ভয় পেয়েছি
লড়েও গেছি

সম্মুখ যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি
কখনও পালিয়েছি গলিঘুঁজিতে
সব সময় লড়াই, চকিতে পেছন ফিরে তাকানো,
দৌড়, পকেটে খুচরো পয়সার হিসেব
হেরে যেতে যেতেও কখনও মরিয়া হয়ে কামড়ে
দিয়েছি তার ডান আঙুল।

এখন সে পেছনে, দু'হাতে ঘিরে আছে
আমি যে হেরে ভূত হয়ে গেছি এর মধ্যে
তা বুঝতেও পারি না
আমার কঙ্কালের কপালে ফোঁটা ফোঁটা চন্দন...

কোলাজ

কবিতার কালো খাতাটির ওপর এসে বসল একটা প্রজাপতি
অপ্সরার মতো তার দুটি ডানা
ও কি কোনও কবিতায় ঢুকে পড়তে চাইছে? প্রজাপতি নিয়ে আর
কত লেখা হবে?
ঝনঝন করে দেয়াল থেকে খসে পড়ল একটা ছবি
ওকে নেব, কি নেব না?
শুনতে পাচ্ছি নদীর ছলোচ্ছল শব্দ, পাড় ভাঙছে, ঝুপ ঝুপ করে
জলের ঝাপটায় ভিজে যায় সাদা পৃষ্ঠা
ওকে নেব, কি নেব না?
সারা দুপুর নির্জনতার কোলাহল, মেঘ ছোঁওয়া হাওয়া
রাস্তার ওপাশ দিয়ে চলে যায় বাসনওয়ালি, তার
ছাপা শাড়িতে রঙের ঝড়
তাকে নেব, কি নেব না?
ঝুপসি আমগাছটায় বসে আছে কোকিল

কোকিল কখনও দেখা যায় না, তিনবার কুহু ধ্বনি
পাঠিয়ে দেয় আকাশের দিকে
ওকে নেব? না, কোকিল আমার কবিতায় আসে না
খবরের কাগজের ফরফরানি অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যায়
কিন্তু ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠাগুলি উড়ছে, ওকে নেব?
সিঁড়িতে অদেখা পায়ের শব্দ, ওকে নেব?
যে মেয়েটি ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে এসে গান গাইছে
তাকে নেব?
একটু একটু খিদে পাচ্ছে, দুপুর গড়িয়ে গেল, টের পাই
এক তৃতীয়াংশ মানবতার জঠরের আগুন
কীসের যেন একটা সুগন্ধ এরই মধ্যে ভেসে এসে
কিছুটা অন্যমনস্ক করে দেয়
কাকে নিই, আর কাকেই যে বাদ দিই!

এক একটা স্বপ্ন

প্রথম স্বপ্নের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল
পঁয়তিরিশ বছর বয়সে
তারপরও কি বন্ধ হয়েছে স্বপ্ন দেখা
নদীর পাড় ভেঙে ঝুপুস করে ডুবে যায় বাড়িঘর
তার পরেও কি কেউ নদীর ধারে বাসা বাঁধে না?
এক একটা স্বপ্ন টুকরো টুকরো মিথ্যে হয়ে যায়
এখন সেই টুকরোগুলো চুষে চুষে খাই
মিথ্যেগুলোই বেশি সুস্বাদু মনে হয়

যৌবনের দীর্ঘশ্বাস মিশে যায় পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়ায়
আবার ফিরে আসে, প্রথমে চেনা যায় না
তারপর ইউক্যালিপটাসের পাতা কেঁপে ওঠে
হু হু করে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে জ্বর
মাটিতে গড়াতে গড়াতে মনে হয়, বাঃ বেশ তো
এইভাবে বয়স বাড়ে
মেঘ ভেঙে পড়ে দিগন্তের রক্তিম পাহাড়চুড়োয়।
একটা শিশু হামাগুড়ি দিয়ে যায় বয়সের উলটোদিকে...

নদীর কিনারে কালের রাখাল

চারদিকে এত মেঘ গর্জন-ছাপানো
বিস্ফোরণের দাপট
তা বলে কি আমি শুনতে পাব না সিঁড়িতে
তোমার পায়ের শব্দ?
বারুদ ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যায়, দাঁড়িয়ে
রয়েছি খোলা জানলায়
এ সময়ে চোখ আরও প্রদীপ্ত, আরও
স্বাধীন না হলে যে হারাব
জবাফুলে টুনটুনির ফুরুৎ দেখার
মতন শুভ মুহূর্ত!

সবাই ভাবছে চুপ করে আছি, আসলে
তো আমি ধ্যানে নিমগ্ন
এখন শ্রাবণ আরও সুতীক্ষ্ণ, এক
জন্মের বাজি ধরে রাখা
নাচুক কুঁদুক যত উল্লুক, আমি
কিছুতেই সুর ভুলব না
নদীর কিনারে কালের রাখাল মহিষ-
বাহন, স্থির পটে আঁকা!

ডানা মেলা গল্প

যে কোনও পড়ো বাড়ি দেখলেই মনে হয়
তার অনেক গল্প আছে
অজয় নদীর পারে সেই ভাঙা প্রাসাদ ও বিগ্রহহীন দেব দেউল
যেন একটা গল্পের জাহাজ
নদীতে এখন জল নেই, ক্ষীণ ধারাটি একপাশ দিয়ে
বয়ে যাচ্ছে ছির ছির করে
এই নদীর প্রমত্ত বর্ষার অনেক গল্প আছে
একলা দুপুরবেলা নদীর মাঝখানে বালি খুঁড়ছে এক কিশোরী

ওর উড়ন্ত আঁচলে পতপত করছে এক গল্প
বালির অনেক গভীরে শুয়ে আছে একদল রহস্য কাহিনী
তারা নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো ইঙ্গিত নিয়ে
হাসাহাসি করছে খুব
প্রত্যেক গল্পেরই নিজস্ব ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে
আনাচে কানাচে
ট্রেনের জানলায় বসে কয়েক মুহূর্তের জন্য এসব দেখা
ঝমঝম করে ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটছে ট্রেন
এই সেতুটির জন্ম কাহিনী মনে পড়তেই শিউরে উঠি
সমস্ত ডানা মেলা গল্পগুলোকে সরিয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

এত সহজেই

ছোটখাটো ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে নদীর কিনারে, বনে
ভোরের আলোয় লূতাতন্তুর টুকরো টুকরো চাদর
যে-ছন্নছাড়া অনেক উড়েছে, বারুদ পুড়েছে সমগ্র যৌবনে
একবার তার নিতে সাধ হয় নির্জনতার আদর।

মনে পড়ে যায় কথা দেওয়া আছে বানভাসি গ্রাম ভাঙা দেউলের কাছে
ফের দেখা হবে, পৃথিবী ঘুরছে, আমিও ফিরব আবার
চাঁদ উড়ে যায় চৈত্রের ঝড়ে, চোখ ঝলসায় অহংকারের আঁচে
মুঠোয় বাতাস, এত সহজেই পেয়েছি যা ছিল পাবার!

অপরাধ

একজন মানুষকে খুব চেনা মনে হচ্ছিল
কিন্তু সে চকিতে চলে গেল মুখ ফিরিয়ে
কিছুই না, কিছুই যায় আসে না
রোদ্দুর রয়েছে রোদ্দুরের মতন, বৃষ্টির ফোঁটা ঈষৎ মিহি ও বাদামি

বিশ্ব সংসার ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে নিজের নিয়মে
ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে আবহমানকালের দুরন্ত কৈশোর
দুঃখের মধ্যে ফুটে ওঠে নিজস্ব বিভা
ভালোবাসার মধ্যে মাঝে মাঝে আলপিন পতনের শব্দ
এইমাত্র একটি নদীর জন্ম হল
এইমাত্র শুকনো মাটি হা হা স্বরে তাকে ডাকল
কিছুই কিছু না, কিছুতেই অন্য কিছুর আসে যায় না
তবু, একজন মানুষকে মনে হচ্ছিল খুব চেনা
সে কেন চকিতে চলে গেল মুখ ফিরিয়ে?

আমরা শুনতে পাই না

হরিণ কি নিজে জানে, তার চোখ দুটি কত সুন্দর?
তার সারা জীবন-কাহিনীই শুধু ভয়
সে ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকালে
আমরা বলে উঠি, আহা, এ যে চকিত হরিণী প্রেক্ষণা
তার চামড়ায় স্নিগ্ধ রঙের ঝিলিক, একদিন
আমাদের পায়ে চটি-জুতো হয়ে শোভা পায়
তাড়া খেয়ে সে যখন পালায়, আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি
কী অপূর্ব তার ছন্দোময় গতি...
আমরা কত ফুলের গলা টিপে ছিঁড়ে এনে
ফুলের বন্দনাগান গাই
মৌচাক ভেঙে মধু চুরি করে আনি, মৌমাছিকে
নিয়ে লিখি কত কাব্য
নদীগুলিতে হত্যা করতে আমাদের একটুও হাত কাঁপে না
পাখিগুলিকে আকাশ থেকে ধরে এনে পুরে দিই খাঁচায়
ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু পায়ে পায়ে নোংরা হয়ে যায়...
মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে দুটো-একটা হরিণ
ছিটকে চলে আসে শহরে
তারা কী যেন বলতে চায়, আমরা বুঝি না
রাত্তিরবেলা একা একা পাখি ডাকে, নদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আমরা শুনতে পাই না!

আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে

আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে তোমার একটু না-জানা ঘুম
ট্রেনের জানলা, বিকেল বেলার ভিড়
একটিবার ঢুলে পড়লে, নাম জানি না, ক্লান্ত মুখ
শ্যামনগরে নেমে পড়লে হঠাৎ।

কখনও দিন ঘোড়সওয়ার, কখনও দিন স্রোতের ফুল
কে পাশে বসে, কেউ ক্বচিৎ ডাকে
দেশের জন্য দুর্ভাবনায় কত মানুষ গলা ফাটায়
দগ্ধ মাঠে ন্যাংটো ছেলে হাসে।

প্রতিদিনের যাত্রা শেষে মনের চোখ পরের দিন
যেদিন গেল, নিছক ঝরাপাতা
বাসনা ছিল নদীর ধারে জীবন ভোর কেলাধুলোর
নদীর পেট এখন ফুটিফাটা!

কিছু একটা ভুল করেছি, চতুর্দিকে ভুলের মুখ
তার মধ্যেও গোপন, অতি গোপন
আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে তোমার একটু না-জানা ঘুম
স্বপ্নটুকু ধার নিতে কি পারি?

ফিরিয়ে নাও

নাঃ, শুধু বন্ধুত্বও ফাঁপা আর হালকা লাগে
ফিরিয়ে নাও
মনে করো আমরা কাঁটা ঝোপ আর সেঁয়াকুল *ঠেলে ঠেলে*
অসংস্কৃত গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে, খাড়াই বেয়ে
পৌঁছোলুম এক নির্জনতম পাহাড় শিখরে
তখনও তোমার মাথার নিখুঁত চুলগুলি বিস্রস্ত হল না।
তোমার সাতরঙা তাঁতের শাড়ির একটি ভাঁজও কুঁচকে গেল না

এর নাম বন্ধুত্ব? ফিরিয়ে নাও
একটা বিজন নদী তোমাকে দিতে চাইলুম,
তুমি বিস্কুট ভাঙার মতন
তাকে দু'ভাগ করলে
কিংবা আমি জানলা বন্ধ করলুম, তুমি খুলে দিলে দরজা
আমি হাতখানা বাড়ালে তুমি এগিয়ে দিলে হাতপাখা
একটা পালক দুলতে লাগল অন্ধকারে
তুমি ঝড় দেখতে চলে গেলে বারান্দায়
এর নাম বন্ধুত্ব? ফিরিয়ে নাও
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে
সবকিছু ভাঙার মতন, সবকিছু
ফিরে পাওয়ার মতন উন্মত্ততা
পৃথিবীর সমস্ত সমান সমান ভাগ তুচ্ছ করে, একটা কালো পর্দা
বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে
আমি তোমার নগ্ন কোমরের কাছে গরম নিশ্বাস ফেলতে চাই...

মিল-অমিল

'চলো যাই, ধরো হাত, আরও একটু দূরে গিয়ে বসি
শহর মিলিয়ে যাক, নিজস্ব নির্জন এক মনোভূমি, মাথার
ওপরে পূর্ণশশী—'
'হা-হা-হা-হা, সামান্য মিলের লোভে রোজকার চেনাশুনো চাঁদ
হল কিনা শশী, তবে এবার কি আরও কিছু ঘটবে পরমাদ?'
'মাইকেল মন্দ লিখতেন না, জীবনের সঙ্গে যোগ যদিও নেই
এখনকার
তবুও গাল ভারী শব্দ, কৃত্রিম উপমা, চেষ্টাকৃত অলংকার
অনেকটাই উৎরে গেছে, মাঝে মাঝে মনে এসে যায়, বেশ
লাগে
এই যে পাথর একটা, তিমি মাছের আকৃতি, বসা যাক এর
পুরোভাগে।'
'তুমি যখন তখন ফিরে যাও পুরনো কালের দিকে, পুরোভাগে,
সে আবার কী?'

'এমনিই একটু মজা, জ্যোৎস্নার নীল আগুনে তোমার নতুন
মুখখানি একটু দেখি!
হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ল, পুরনো না পুরাতন, মনে আছে সেই
গানখানি
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, এতে দেখা যায় না
সময় ছাড়ানো হাতছানি?
রবীন্দ্রনাথ যে লিখলেন পুরনোর বদলে পুরাতন, তা কি শুধু
মাত্রা ঠিক রাখতে হবে বলে?'
'চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, সময় ওড়াচ্ছি আমরা নিতান্তই মিথ্যে
কথাচ্ছলে!
কাছাকাছি কেউ নেই, হু হু হাওয়া, এখন কি গাইতে পারি না
একটা গান?'
'জীবনানন্দ তো মাত্রা ফাত্রা গ্রাহ্যই করতেন না, মনে আছে,
এক মাইল,
শান্তি কল্যাণ?'
'আবার ওইসব শুরু করলে, কবিতাও না, নিছক শুকনো যত
ছন্দ প্রকরণ
বরং শোনাও না একটা সম্পূর্ণ কবিতা, আমি শুনতে চাই
তোমার নিজস্ব উচ্চারণ।'
'হবে, একটু পরে হবে। একটা প্রশ্ন মনে আসছে তবু বার
বার
জীবনানন্দ যে ছন্দ ভাঙলেন, সুভাষ, শঙ্খ ও শক্তি কেন তাতে
ফিরলেন আবার?'
'উত্তর তো স্বাভাবিক, বাংলা কবিতার পক্ষে ছন্দ-মিল
রীতিটাই ভালো'
'টিকটিকির ঠিক ঠিক, তোমার কথায় দেখো এইমাত্র বিদ্যুৎ
চমকাল!'
'আকাশেও চোখ আছে? বাতাস উৎসুক, তবু তুমি শুধু
দেখছ না আমাকে'
'কবিতা তোমার ওষ্ঠে, তোমার অঙ্গুলি স্পর্শে, নখের ধুলোয়
মিশে থাকে
ওষ্ঠে নাকি ঠোঁটে, যদি আরও কাছে আসি, চাই একটি চুম্বন
ও দৃঢ় আলিঙ্গন'
'তুমি একটি যা-তা, তুমি প্রত্যেক কবির মতো ন্যাকা, তুমি
শব্দের অছিলা নিয়ে

ডুব দিয়ে আছ সারাক্ষণ
আমার সময় বেশি নেই, ফিরে যেতে হবে, আমি চেয়েছি
কয়েকটি চুমু ও
তীব্র বুকে বুক ছোঁওয়া জড়াজড়ি
'চুম্বন' ও 'আলিঙ্গন', যত সব শব্দ মোহ, এখনও হলে না
আধুনিক, লেখো
চাঁদ নিয়ে কাব্য মরিমরি!'
'শোনো, শোনো, আরও কিছু কথা আছে, লিখিনি কিছুই, এই
দেখো চেয়ে
ব্যর্থ লেখকের করুণ আঙুল—'
'জানি জানি, এরপরও মিল দেবে, আঙুলের সঙ্গে ভুল,
কিংবা বুঝি
শিমুল-জারুল!'

কেউ নাম ধরে ডাকবে?

নিরুদ্দিষ্টের বিজ্ঞাপনের প্রতিটি মুখই খুব
চেনা মনে হয়
মনে হয় যেন কখনও দেখেছি আয়নায়
রাস্তায় যখন একা একা ঘুরে বেড়াই,
যে সব রাস্তার কোনও শেষ নেই,
অনবরত বাঁক ঘুরে যায়
মনে হয়, কেউ কি আমার নাম ধরে ডাকবে?
কেউ বাল্যসঙ্গীর কণ্ঠস্বরে বলবে, তোমারই
প্রতীক্ষায় ছিলাম!

বিকেলবেলার আলোয় মেশে হালকা লাল রং
বদলে যায় সমস্ত পৃথিবী
বদলে যায় মানুষের মুখ
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মনে হয়, গ্রামের কুঁড়েঘরে
পা ছড়িয়ে বসে আছেন শুকনো চোখে
আমার মা

'আমায় আর সবাই ভুলে গেছে, ওই একজন ছাড়া!'
এটাও একটা দৃশ্য মাত্র, আমার মা
ওরকমভাবে বসে থাকেননি কখনও
এ যেন হঠাৎ শখ করে কোনও পুরনো উপন্যাসের
মধ্যে ঢুকে পড়া
অন্য কোনও সংসারে গিয়ে সে বাড়ির মেজছেলের
জামাটি গায়ে দিয়ে
তারপর সেখানেই চিরকাল...

বৃষ্টির রাতে

বৃষ্টি কি কখনও কারুর কাছে পুরনো হয়ে যায়
নোয়ার নৌকো তো আর দ্বিতীয়বার ভাসেনি
খুব ঝড় বাদলের রাতে আমার জন্ম, মাতৃগর্ভে থেকেও
সেই শব্দ শুনেছি
নদী লাফ দিয়ে উঠেছিল, জিভ বাড়িয়েছিল উঠোনের আঁতুড় ঘরে
সেই দুঃখ স্মৃতি নিয়ে মা-মাসিরা এখনও হাসাহাসি করে
যদিও সে বাড়িও নেই, নদীও হারিয়ে গেছে
তবু ঘুমের মধ্যে আমি গাছের মতন আকাশের দিকে চেয়ে থাকি
হঠাৎ ডেকে ওঠে সুপুরুষ অভিনেতার মতন মেঘ
ঝমঝম করে বেজে ওঠে বাল্যকাল, বারবার খুলে যায় জানলা
মুখে এসে ঝাপটা লাগে, দেখতে পাই নির্জন রাস্তায় হেঁটে
যাচ্ছে একটি মাত্র দুঃখী মানুষ
সামান্য পা টেনে টেনে হাঁটছে, ভ্রূক্ষেপ নেই বৃষ্টিতে
কোনওদিন আগে তাকে দেখিনি, মুখটা তবু এত চেনা
ঠিক এইরকমভাবে পথের মোড়ে মিলিয়ে গিয়েছিলেন আমার বাবা।

এক সন্ধ্যায় দুই কবি

আরামকেদারায় দু' হাত ছড়িয়ে বসে আছেন খ্যাতিমান প্রৌঢ় কবি, তাঁর সুরেলা সংলাপ মুগ্ধ হয়ে শুনছে বন্ধুরা। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বাইশ বছরের একটি যুবক, পাতলা ছোটখাটো চেহারা, তবু ভারী রূপবান, মুখখানি কন্দর্পতুল্য।
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন, এ কে?
গৃহস্বামী শিল্পী বেঞ্জামিন হেডন বললেন, উইলিয়াম, এই ছেলেটির নাম জন, জন কিট্‌স, ডাক্তারি পড়া ছেড়ে কবিতা লিখছে, হাতটা বেশ ভালো, তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, তাই এই পার্টিতে আসতে বলেছি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই নবাগতের এক লাইন রচনাও পড়েননি, নামটা শোনা-শোনা, সংযত সৌজন্যে বললেন, শুভ সন্ধ্যা, তোমাকে দেখে খুশি হলাম।
তিনি করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিলেন ডান হাত, কিট্‌স এগিয়ে এসেও দ্বিধান্বিত, শরীর কাঁপছে তার। ওই হাত, প্রিয় কবির হাত, ওই আঙুলে ধরা কলমে লেখা হয়েছে লুসি সিরিজের অনবদ্য গীতিকবিতাগুলি, 'প্রস্তাবনা'র মতন কাব্য। ওই হাত স্পর্শ করার যোগ্য কি সে?

ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর মনোযোগ না দিয়ে ফিরে গেলেন তাঁর অসমাপ্ত বাক্যে, হোমার, ভার্জিল, শেক্সপিয়ার, মিলটন থেকে উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন অনবরত, তিনিই একমাত্র বক্তা, অন্য সকলে শ্রোতা। এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল কিট্‌স, তার ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে, ওই কবিতাংশ সবই তার মুখস্থ। একদৃষ্টিতে দেখছে সে তার প্রিয় কবিকে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাথার পেছনে দেয়ালে ঝুলছে হেডনের আঁকা যিশুখ্রিস্টের জেরুজালেমে প্রবেশ দৃশ্যমান বিশাল ছবিটি, পাশে ফায়ার প্লেসে রক্তিম আভা, জানলার বাইরে বেলাশেষের সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।
কিট্‌সের মনে পড়ল, এই কবি সম্পর্কেই তাঁর বন্ধু কোলরিজ বলেছিলেন, ও মহান, অতিমানব। ওয়ার্ডসওয়ার্থই একমাত্র ব্যক্তি, যার কাছে সর্ব সময়ে, সর্ব বিষয়ে আমি নিজেকে ছোট মনে করি। ...ইদানীং অবশ্য কিছু কিছু তরুণ আড়ালে বলাবলি করে, উনি কী সব লিখছেন আজকাল! আগেকার সেই অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। কিট্‌স নিজে তা ভাবে না, কবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতেই সে আবিষ্ট হয়ে আছে। সেই কবি আজ সশরীরে এখানে উপস্থিত, তাঁর চক্ষুদুটি, ওই চক্ষে যেন দিব্যদর্শন হয়েছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাণীপ্রবাহের মাঝখানে মূর্তিমান বিঘ্নের মতন প্রবেশ করলেন চার্লস ল্যাম। গেলাসে গেলাসে মদ ঢেলে সবার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, কার স্বাস্থ্য পান করব? তারপর ওয়ার্ডসওয়ার্থের দিকে ফিরে ধিক্কারময় কণ্ঠে

বললেন, ওহে হ্রদ-কবি, ওহে রাসকেল, তুমি কেন ভলতেয়ারকে স্থূল বলেছ?

কিট্‌স শিউরে উঠলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বন্ধুর কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে স্থূল তো বটেই।
শুরু হয়ে গেল তর্ক, কেউ কেউ সমর্থন করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। কিট্‌সের পছন্দ হল না। কবিতার ভাষা ব্যবহার নিয়ে কী অপূর্ব বলছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তার মধ্যে আবার গদ্যের অবতারণা কেন? ভলতেয়ার থেকে ফ্রান্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থের একদা-ফ্রান্সভক্তি এখন বিরূপতা, ফ্রান্সে তাঁর অবৈধ সন্তান, পরিত্যক্ত প্রেমিকা অ্যানেত্, ল্যাম আরও খোঁচা দিয়ে বললেন, প্রকৃতিমুগ্ধ ঋষিপ্রতিম কবিরও তা হলে অবৈধ সন্তান থাকে...
কিট্‌সের মন চলে গেল ফ্রান্স ছেড়ে গ্রিসে, প্রাচীন গ্রিস, বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পের জন্মভূমি... তারপর সে শুনতে পেল একটা পাখির ডাক। এটা কোন পাখি?

বিষয় থেকে বিষয়ান্তর, ল্যাম এবার শিল্পীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললন, ওহে, তুমি তোমার ছবিতে নিউটনের মুখচ্ছবি বসিয়েছ কেন? ও লোকটা তো ত্রিভুজের তিনটি দিকের মতন সরল প্রমাণ না পেলে কিছুই বোঝে না। অঙ্ক, শুধু অঙ্ক, ও ধ্বংস করেছে আকাশের একটি পরমাশ্চর্য কবিতা।
কিট্‌স আপন মনে বলে উঠল, ঠিক!
সবাই তাকালেন এই তরুণ কবির দিকে।
কিট্‌সের চোখ জানলার বাইরে ঈগল পাখির ডানার মতন অন্ধকারে নিমগ্ন। আকাশ দেখা যায় না, তবু সে আকাশ দেখছে। খানিকটা ভাঙা ভাঙা, দুঃখমাখা গলায় বলল, বাল্যকাল থেকে আমরা রামধনু দেখে কত না বিস্ময়বোধ করেছি। কী দরকার ছিল সেই বিস্ময়বোধ ভেঙে দেবার...

ল্যাম তীব্র স্বরে বললেন, ওই বিশাল রামধনু নিছক ত্রিশিরা কাচের বর্ণচ্ছটা? জলকণার বিচ্ছুরণ? হাঃ!

কিট্‌স ওয়ার্ডসওয়ার্থের উদ্দেশে বলল, আবৃত্তি করেছি আপনারই কবিতা, 'আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, যখন আমি দেখি, আকাশে এক রামধনু...'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ হেসে উঠলেন খোলা গলায়। খুবই উপভোগ করছেন এমন স্বরে বললেন, বাঃ, চমৎকার। তা হলে নিউটনকে কী শাস্তি দেওয়া যায়?

হাতের সুরার গেলাসে এখনও চুমুক দেয়নি কিট্‌স। হাত উঁচু করে সেও সহাস্যে বলল, আসুন, আমরা নিউটনের স্বাস্থ্যপান করি, এবং গণিতের প্রতি বিভ্রান্তির।

বাইরে আবার একটা পাখি ডেকে উঠল। ওটা কোন পাখি?
শুধু পাখি নয়, আকাশও ডাকছে। আকাশে এখনই এক কবিতা-সন্ধ্যা শুরু হবে।

প্রতীক্ষায়

গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায়
হাওয়া ঘোরে দূরে দূরে
ফুলকে সমীহ করে
সূর্যাস্ত থমকে থাকে।

দেখো দেখো
আমার বাগানে এক অগ্নিময়
ফুল ফুটে আছে
তার সৌরভেও কত তাপ!
আর সব কুসুমের জীবন-চরিত তুচ্ছ করে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চতুর্দিক
বৈদূর্যমণির মতো চোখ মেলে সে রয়েছে প্রতীক্ষায়
কার? কার?

অন্য গল্প

যেন কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প
জামালুদ্দিনের টিকিস টিকিস গোরুর গাড়ির পাশ দিয়ে ঝমঝমিয়ে ছুটে যায়
সাঁইথিয়া লোকাল
জামালুদ্দিন গাড়োয়ান অবশ্য গল্পটা জানে না।
বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ট্রেনটাকে গ্রাহ্যই করে না সে
আর ওইসব ইস্কুলে-পড়া গল্প আজকাল জীবনে মেলে নাকি?
কচ্ছপরা কবে হেরে ভূত হয়ে গেছে, আর
খরগোশরা টপাটপ বুক পেতে দিচ্ছে ছুরির নীচে

সাঁইথিয়া লোকাল বড় একটা লেট করে না, পেট ভর্তি মানুষ নিয়ে
ছুটে যাচ্ছে রোজ
কোনদিন কে ইঞ্জিন চালায় কেউ জানে না
গোরুদুটোর আগেই জামালুদ্দিন বুড়ো হয়, ঝুঁকে পড়ে
গতবারের খরায় একটা গোরু গেল গোভাগাড়ে, অন্যটাকে
তাড়াতাড়ি বেচে দিতে হল অণ্ডালের হাটে
এখন জামালুদ্দিন ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটে, মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে,
ট্রেনের শব্দ শুনে ফিকফিকিয়ে হাসে
এটাকে একটা অন্য গল্প বলা যায় না?

ব্যর্থতার তীব্র টান

একটা সীমানাহীন ধূ ধূ গেরুয়া রঙের প্রান্তরে, একা, খুব একা
শীতে কালো রঙের চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে আমার কৈশোর
তার ওষ্ঠে লেগে আছে ব্যর্থ প্রেমের বিষাদ, চোখ দুটি ঈষৎ ঝাপসা
দিগন্ত জোড়া আকাশে আকাশে ছড়িয়ে আছে তার অভিমানের
লাবণ্যময় আভা
এই সুন্দর ছবিটি আমি দেখছি দূর থেকে, বহু বছর পেরিয়ে
বুকে ব্যথা হয় না, এখন অনায়াসে কৌতুক করা যায়
ব্যর্থ প্রেমের আগে সত্যিই কি প্রেম ছিল? সেই বয়ঃসন্ধির সময়ে
আগুন জ্বলত অনবরত, কাঠকুটোর অভাবে আমি নিজেই কি
একদিন আহুতি দিইনি এক কিশোরীকে?
অসংখ্য চিঠির প্রতিটি শব্দই কি আসলে অস্ত্রে শান দেওয়া নয়?
অথচ নিজেও তো হাত পুড়িয়েছি বারবার, সেই কিশোরীটির জন্য
হৃৎপিণ্ড উপড়ে দিতেও রাজি ছিলাম না?
তবু কোথায় যেন ছিল সার্থকতার চেয়ে ব্যর্থতার প্রতি তীব্র টান
এক নদীর কথা মনে পড়ে, বারবার ফিরে আসে কবিতায়, তবু
সেই নদীকেও তো অনায়াসে ছেড়ে এসেছি
নদীকে এত ভালোবাসতাম, তার জলে শরীর মিশিয়ে তো থাকতে
চাইনি সারা জীবন!

ব্যর্থ প্রেম কি তবে নিজেরই অজান্তে এক গোপন স্বার্থপরতা?
দূর থেকে সেই কৈশোরের ছবিটি দেখি, হঠাৎ শুনতে পাই
পাহাড় কাঁপানো এক নিদারুণ হাহাকার

অমনি আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, আমার হাত থেকে
খসে পড়ল কলম।

সীমান্ত ভাঙা

আমি এখন মধ্যরাত্রির নির্জন ঘরে
আবার আমিই একটা দারুণ হুড়োহুড়ির রেলস্টেশনে
একলা দাঁড়িয়ে

এখন রাত বারোটা পঁয়তিরিশ
আমার বয়েস সাতাশ, পকেটে মাত্র সাত টাকা, ঠোঁটে তাচ্ছিল্য
রেলস্টেশনের আমি আর দশতলার একলা ঘরে
আমার অন্যরকম শরীর

আমার শান্ত ব্যস্ততা এবং আমার কঠিন যৌন উত্থান
গোপন, খুব গোপন

আমার শরীর টনকো, অথচ সাতাশ বছরে আমায় কেউ
কাজ দেবে না

তা হলে কেন আমি ধ্বংসের নেশায় মাতবো না?
দশতলার ঘরে আমি যুক্তিবাদী, সমাজতত্ত্ব নিয়ে
প্রবন্ধ মকশো করছি

যুক্তির পেছনে ছুঁচোবাজি জ্বালিয়ে হঠাৎ লিখে ফেলছি
এক একটি কবিতা
তুমি নারী, তোমার ভিজে ভিজে ওষ্ঠ ও গ্রীবার গর্বিত ভঙ্গি নিয়ে
বারবার লিখতে ইচ্ছে করে

অথচ রেলস্টেশনে সাতাশ বছরের ছেলেটির পেটে
জ্বলছে খিদে, সে কোথাও যাবে না
কবিতার নারী, তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না একবার?
এই সীমান্ত ভাঙবে না?
ভেঙে যাচ্ছে মধ্য রাত্রি, আমি দশতলা থেকে উড়ে যাচ্ছি
সেই রেলস্টেশনের দিকে!

ছুঁয়ে দেখা হবে

যাও, কুসুম-গভীরে, যাও সন্ধ্যার বিলীন আলো গায়ে মেখে
ঘর ছেড়ে ঘরের অন্দরে, দেয়ালের পর্দা ভেদ করে যাও
এখানেই দেখা হবে, পৃষ্ঠা খুলে খুলে দেখা হবে
বুকে এত তারা, জামা খোলা, একাকীত্বে আলিঙ্গন,
তবু ছুঁয়ে দেখা হবে।

সপ্তম গর্ভের কন্যা

সপ্তম গর্ভের কন্যা, কেন এলি যে বাড়িতে
উনুন জ্বলে না?
পুকুরের জলে ভাসছে ছোট্ট দেহখানি
চারপাশের গাছপালা মুখ ঝুঁকিয়ে বলছে দ্যাখো দ্যাখো,
মেয়েটার চোখ মুখে ঠিক তার মায়ের আদল
মা কোথায়? সে এখনও আঁতুড়ে পাথর হয়ে আছে
তার হাতে রক্ত, তার স্তনদুটি খটখটে ধুঁধুল
খিদের উত্তাপে সব মায়া-দয়া বাষ্প হয়ে উপে গেছে কবে!

ভাঙা কুঁড়েটার সামনে এইমাত্র থামল খুব ব্যস্ত জিপ গাড়ি
শুনুন দারোগাবাবু, একটা প্রশ্নের আপনি উত্তর দেবেন?
বাচ্চারা না খেয়ে মরলে সমাজ বা পুলিশ আসে না

আজ কেন এসেছেন শত কাজ ফেলে?
ওরে বাবা, এ যেন খুন, পরিষ্কার গলা-টেপা কেস!
দেশটায় একী হল, মায়েরাও খুনি হয়ে গেল!
দু'-চারটে চড়-চাপড় দিয়ে মাকে তোলা হল কয়েদ গাড়িতে
প্রতিবেশী মুখ লুকোয়, গাছগুলো বলল, ধিক, ধিক
গারদে আছড়ে ফেলে সদ্য প্রসূতিকে হল আজকের
কাজ সমাপন!

দারোগা রাত্তিরে যান অভিযানে ঝাঁপ ফেলা সোনার দোকানে
তাঁর পত্নী বনবালা ক্রিম পমেটম মেখে সাজেন গোজেন
ছেলেরা ক্যারাম খেলে, মেয়েরা দুধের বাটি ঠেলে ফেলে দেয়
নদীপথে নৌকো যায়, পাটাতন ভর্তি অস্ত্র, পিস্তল-কার্তুজ
ঈষৎ রঙিন চোখে মধ্যরাতে বড়বাবু-বনবালা হন গলাগলি
পোশাক লুটোয় মেঝে, রতিক্রিয়া চলতে থাকে হাপুস হুপুস
সপ্তম গর্ভের কন্যা, ফিরে আয়, এই ফাঁকা গর্ভে ঢুকে পড়
উনুন নেভে না কভু এ বাড়িতে, জননীর বুকে দুই দুধভরা ঘটি
কেন দাবি ছাড়বি তুই, শূন্যতার চেয়ে মর্তভূমি ঢের ভালো!

ঘূর্ণি

আর কিছু নয়, একটা মুহূর্তের ঘূর্ণি...
দৃষ্টি এক ঝলক

অনেক মুহূর্ত থেকে তুলে নেওয়া মায়ার উষ্ণতা
এমনকী সাদা গাছটির একটা ফুলও নয়
শুধু একটি পাপড়ি ছোঁয়া ঠোঁট

নদী নয়, নদীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া
পাখি উড়ে যায়, তার ফেলে যাওয়া শব্দ
আর কিছু নয়, একটা ঘূর্ণি
একটা ঘূর্ণি।

দেখা না দেখা

দেখা হবে কি হবে না ভেবে ভেবে কেটে গেল কতটা জীবন
শিউলি ফোটার দিন, কাশফুল ঝরে যাবে দেখা হয়, সেও দেখা নয়
দেখা না হলেও দেখি, বন্ধ জানালার কাচে যে-রকম স্থির প্রজাপতি
খুব গাঢ় ঘুমে দেখি, জেগে থেকে এ জগৎ যেন নিতান্তই স্বপ্নহীন
বিদ্যুৎ চমকে দেখি, বিদ্যুৎ দেখি না, শুধু দু' চোখের ঘুম ভাঙে বুঝি
এমনকী ঈশ্বরও যদি দেখা দিতে চান বলি, সে কোথায়?
সে কোথায়? সে কোথায়? কে সে? সে কি এক জীবনের সুপ্ত বিভা?
আমি হাসি, কত শত বঞ্চিত মানুষও হাসে, নিজের ব্যর্থতা নিয়ে হাসে
খিদে নিয়ে হাসে, কিংবা প্রেমের ব্যর্থতা নিয়ে, চোখে ভরা জল নিয়ে হাসে
না, নিছক নারী নয়, কিংবা নারী, কিংবা আরও কিছু, চোখ খোলা তবু,
কিছুই দেখি না।
চোখে মোহের অঞ্জন ভোরবেলা, চোখে সন্ধ্যাকালে জয়ের উল্লাস
কে বলেছে এই আমি দেখিনি, চিনিনি সব, চতুর্দিকে দেখার সাম্রাজ্য
অথচ মেঘের ছায়া, ঘাস ফুল চোখ টেপে, এত দেখা বাকি
যা দেখেছি, তার কিছুই দেখিনি, সমস্ত দেখার মধ্যে হা হা করে বিরাট শূন্যতা।

দিগন্ত কি কিছু কাছে

আজ বহু দূর এসে কংক্রিট ছাদের নীচে
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি,
ব'সে আছে নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা,
দুপুরের বর্ণদ্যুতি, বাতাস দ্বিখণ্ড করে
ভেসে ওঠে চিল,
একটু একটু মনখারাপ, কবিতার খাতা
মুড়ে আমি উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ
আকাশ অচেনা লাগে, দিগন্ত কি কিছু
কাছে এগিয়ে এসেছে?

রূপ

কড়ির মতন টেপা টেপা চোখ, নাক ছ্যাঁচা, ছিছি
লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা
একটা জীবন শরম-ভরম, শুধুই ভস্ম শয্যা!
পারুল ডাঙার প্রান্তে তিনটি বালিকা বলল, নদীর
ওপারে যাবি?
গেলে না, একলা রয়ে গেলে, হাতে পুরোনো হলুদ চাবি!
লকলক করে বাড়ে ফুলগাছ, শরীর না যেন খাঁটি
বিদ্যুল্লতা
তুমি তার পাশে দাঁড়াও না ভয়ে! বুক ভরা নীরবতা।

পুতুল খেলায় যারা মেতেছিল, তারা ক্রমে ক্রমে ঢুকে
গেল সংসারে
তুমি চৌকাঠ পেরুলে না, বসে রইলে দিঘির ধারে।
বর্ষা এল কি এল না কে জানে, শীতের বাতাসে খসে
খসে পড়ে পাতা
কোথা অদৃশ্য ঘর্ঘর নাদে ঘুরছে একটা জাঁতা।

ওলো ও কন্যা, আগুন জ্বলেনি, রক্তে কখনও ছলকে
আসেনি ঢেউ?
চোখের তারায় বিমূর্ত ছবি, দেখাল না বুঝি কেউ।
রূপের ফুলকি উড়ছে বাতাসে, স্বপ্ন যেমন জীবনকে দেয়
রংমশালের ঝড়
রূপও স্বপ্ন, স্বপ্ন না দেখে সারাটা জীবন রয়ে গেলে উলুখড়!

কলম

মাত্র একটাই কলম পকেটমার হয়েছে এ জীবনে
বাকি সব ফাউন্টেন পেন, পেন্সিল, ডট পেন, জটার
উধাও হয়েছে যে-যার নিজস্ব নিয়মে

জাহাজের রেলিং-এ ঝুঁকে থাকা হাত থেকে একলা হলুদ কলম
খসে পড়েছিল টুপ করে বঙ্গোপসাগরের জলে
খসে পড়েছিল, না ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছিলাম?
শব্দের অসহ্য অতৃপ্তির দাহে জ্বলে উঠেছিল আঙুল
কালি শুকিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল কলম থেকে
খাতার পাতার পর পাতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল
বিষের মতন একটা হিম নীলাভ শিখা হলুদ কলমকে
বলল, পরিণামদর্শী, তুমি ব্যর্থ,
তুমি যাও!

পকেটমার-কলমটি কোথায় কার আঙুল পোড়াচ্ছে কে জানে!

না-পাঠানো চিঠি

মা, তুমি কেমন আছ?
আমার পোষা বেড়াল খুনচু, সে কেমন আছে
সে রাত্তিরে কার পাশে শোয়
দুপুরে যেন আলি সাহেবদের বাগানে না যায়
মা, ঝিঙে মাচায় ফুল এসেছে?
তুলিকে আমার ডুরে শাড়িটা পরতে বলো
আঁচলের ফেঁসোটা যেন সেলাই করে নেয়
তুলিকে কত মেরেছি, আর কোনওদিন মারব না
আমি ভালো আছি, আমার জন্য চিন্তা করো না
মা, তোমাদের ঘরের চালে নতুন খড় দিয়েছ?
এবারে বৃষ্টি হয়েছে খুব
তরফদারবাবুদের পুকুরটা কি ভেসে গেছে?
কালু-ভুলুরা মাছ পেয়েছে কিছু?
একবার মেঘের ডাক শুনে কই মাছ উঠে এসেছিল ডাঙায়
আমি আমগাছ তলায় দুটো কই মাছ ধরেছিলাম
তোমার মনে আছে, মা?
মনে আছে, আলি সাহেবের বাগানের সেই নারকোল
চুরি করে আনিনি, মাটিতে পড়েছিল, কেউ দেখেনি

নারকোল বড়ার সেই স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।
আলি সাহেবের ভাই মিজান আমাকে খুব আদর করত
বাবা একদিন দেখতে পেয়ে চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়েছিল আমাকে
আমার কী দোষ, কেউ আদর করলে আমি না বলতে পারি?
আমার পিঠে এখনও সেই দাগ আছে
আলি সাহেবদের বাগানে আর কোনওদিন যাইনি
আমি আর কোনও বাগানে যাই না।
সেই দাগটায় হাত বুলিয়ে বাবার কথা মনে পড়ে
বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়
আমি ভালো আছি, খুব ভালো আছি
বাবা যেন আমার জন্য একটুও না ভাবে
তুলি কি এখনও ভূতের ভয় পায়?
তুলি আর আমি পুকুর ধারে কলাবউ দেখেছিলাম
সেই থেকে তুলির ফিটের ব্যারাম শুরু হল
দাদা সেই কলাগাছটা কেটে ফেলল
আমি কিন্তু ভয় পাইনি, তুলিকে কত ক্ষেপিয়েছি
আমার আবার মাঝরাত্রে সেই কলাবউ দেখতে ইচ্ছে করে
হ্যাঁ, ভালো কথা, দাদা কোনও কাজ পেয়েছে?
নকুড়বাবু যে বলেছিল বহরমপুরে নিয়ে যাবে
দাদাকে বলো, ওর ওপর আমি রাগ করিনি
রাগ পুষে রাখলে মানুষের বড় কষ্ট
আমার শরীরে আর দাগ নেই, আমি আর এক ফোঁটাও কাঁদি না
মা, আমি রোজ দোকানের খাবার খাই
হোটেল থেকে দু' বেলা আমার খাবার এনে দেয়
মাংস মুখে দিই আর তুলির কথা, কালু-ভুলুর কথা মনে পড়ে
তোমাদের গ্রামে পটল পাওয়া যায় না
আমি আলু পটলের তরকারি খাই, পটল ভাজাও খাই
হোটেলে কিন্তু কক্ষনও শাক রান্না হয় না
পুকুর পাড় থেকে তুলি আর আমি তুলে আনতাম কলমি শাক
কী ভালো, কী ভালো, বিনা পয়সায়
কোনওদিন আর কলমি শাক আমার ভাগ্যে জুটবে না
জোর হাওয়া দিলে তালগাছের পাতা সরসর করে
ঠিক বৃষ্টির মতন শব্দ হয়
এই ভাদ্দর মাসে তাল পাকে, টিপ টিপ করে তাল পড়ে
বাড়ির তালগাছ দুটো আছে তো?

কালু তালের বড়া বড় ভালোবাসে, একদিন বানিয়ে দিয়ো
তেলের খুব দাম জানি, তবু একদিন দিয়ো
আমাকে বিক্রি করে দিয়ে ছ' হাজার টাকা পেয়েছিলে
তা দিয়ে একটা গোরু কেনা হয়েছে তো?
সেই গোরুটা ভালো দুধ দেয়?
আমার মতন মেয়ের চেয়ে গোরুও অনেক ভালো
গোরুর দুধ বিক্রি করে সংসারের সুসার হয়
গোরুর বাছুর হয়, তাতেও কত আনন্দ হয়
বাড়িতে কন্যা সন্তান থাকলে কত জ্বালা
দু' বেলা ভাত দাও রে, শাড়ি দাও রে, বিয়ের জোগাড় করো রে
হাবলু, মিজান, শ্রীধরদের থাবা থেকে মেয়েকে বাঁচাও রে
আমি কি বুঝি না, সব বুঝি
কেন আমায় বিক্রি করে দিলে, তাও তো বুঝি
সেই জন্যই তো আমার কোনও রাগ নেই, অভিমান নেই
আমি তো ভালোই আছি, খেয়ে পরে আছি
তোমরা ওই টাকায় বাড়ি ঘর সারিয়ে নিয়ো ঠিকঠিক
কালু-ভুলুকে ইস্কুলে পাঠিয়ো
তুলিকে ব্রজেন ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ো
তুমি একটা শাড়ি কিনো, বাবার জন্য একটা ধুতি
দাদার একটা ঘড়ির শখ, তা কি ও টাকায় কুলোবে?
আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, সোনার দুল গড়িয়েছি
একদিন কী হল জানো, মা
আকাশে খুব মেঘ জমেছিল, দিনের বেলা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার
মনটা হঠাৎ কেমন কেমন করে উঠল
দুপুরবেলা চুপি চুপি বেরিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম
স্টেশনে নেমে দেখি একটা মাত্র সাইকেল রিকশা
খুব ইচ্ছে হল, একবার বাড়িটা দেখে আসি
রথতলার মোড়ে আসতেই কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল
কে যায়, কে যায়?
দেখি যে হাবুল-শ্রীধরদের সঙ্গে তাস খেলছে দাদা
আমাকে বলল, হারামজাদি, কেন ফিরে এসেছিস?
আমি ভয় পেয়ে বললাম, ফিরে আসিনি গো, থাকতেও আসিনি
একবার শুধু দেখতে এসেছি
হাবুল বলল, এটা একটা বেবুশ্যে মাগি
কী করে জানল বলো তো, তা কি আমার গায়ে লেখা আছে?

আর একটা ছেলে, চিনি না, বলল, ছি ছি ছি, গাঁয়ের বদনাম
হাবলু রিকশাঅলাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, ফিরে যা
আমি বললাম, দাদা, আমি মায়ের জন্য ক'টা টাকা এনেছি
আর তুলির জন্য...
দাদা টেনে এক চড় কষাল আমার গালে
আমাকে বিক্রির টাকা হক্কের টাকা
আর আমার রোজগারের টাকা নোংরা টাকা
দাদা সেই পাপের টাকা ছোঁবে না, ছিনিয়ে নিল শ্রীধর
আমাকে ওরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল
আমি তবু দাদার ওপর রাগ করিনি
দাদা তো ঠিকই করেছে, আমি তো আর দাদার বোন নই
তোমার মেয়ে নই, তুলির দিদি নই
আমার টাকা নিলে তোমাদের সংসারের অকল্যাণ হবে
না, না, আমি চাই তোমরা সবাই ভালো থাকো
গোরুটা ভালো থাকুক, তালগাছ দুটো ভালো থাকুক
পুকুরে মাছ হোক, খেতে ধান হোক, ঝিঙে মাচায় ফুল ফুটুক
আর কোনওদিন ওই গ্রাম অপবিত্র করতে যাব না
আমি খাট-বিছানায় শুই, নীল রঙের মশারি
দোরগোড়ায় পাপোশ আছে, দেওয়ালে মা দুর্গার ছবি
আলমারি ভর্তি কাচের গেলাস
বনবন করে পাখা ঘোরে। সাবান মেখে রোজ চান করি
এখানকার কুকুরগুলো সারা রাত ঘেউ ঘেউ করে
তা হলেই বুঝছ, কেমন আরামে আছি আমি
আমি আর তোমার মেয়ে নই, তবু তুমি আমার মা
তোমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, আমি আর মা পাব কোথায়?
সেই জন্যই তোমাকে চিঠি লিখছি, মা
তোমার কাছে একটা খুব অনুরোধ আছে
তুলিকে একটু যত্ন করো, ও বেচারি বড় দুর্বল
যতই অভাব হোক, তবু তুলিকে তোমরা...
তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো
তুলিকেও যেন আমার মতন আরামের জীবনে না পাঠায়
যেমন করে হোক, তুলির একটা বিয়ে দিয়ো
ওর একটা নিজস্ব ঘর সংসার, একজন নিজের মানুষ
আর যদি কোনওরকমেই ওর বিয়ে দিতে না পারো
ওকে বলো, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে

মরলেও ও বেঁচে যাবে!
না, না, না, এ কী অলুক্ষণে কথা বলছি আমি
তুলি বেঁচে থাকুক, আর সবাই বেঁচে থাকুক
তুলির বিয়ে যদি না হয় না হোক
হে ভগবান, গরিবের বাড়ির মেয়ে কি বিয়ে না হলে বাঁচতে পারে না?
বিয়ে না হলেই তাকে গ্রামের সবাই ঠোকরাবে?
দু' পায়ে জোর হলে তুলি কোথাও চলে যাক
মাঠ পেরিয়ে, জলা পেরিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে
আরও দূরে, আরও দূরে, যেদিকে দু' চোখ যায়
এমন জায়গা নিশ্চয়ই কোথাও আছে, কোথাও না কোথাও আছে
যেখানে মানুষরা সবাই মানুষের মতন
আঁচড়ে দেয় না, কামড়ে দেয় না, গায়ে ছ্যাঁকা দেয় না, লাথি মারে না
যেখানে একটা মেয়ে, শুধু মেয়ে নয়, মানুষের মতো বাঁচতে পারে
মা, তুমি আমার মা, আমি হারিয়ে গেছি
তুলিকে তুমি... তুলি যেন... আমার মতন না হয়!

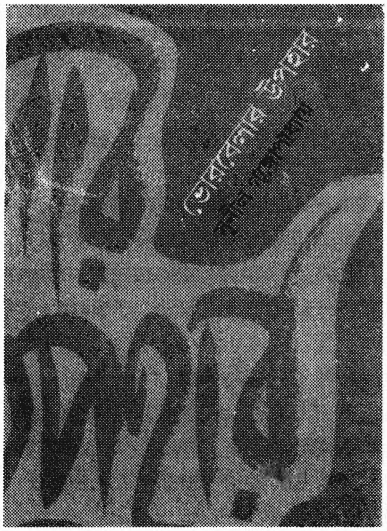

ভোরবেলার উপহার

সূচিপত্র

ভেঙে পড়েছে সাঁকো ৭৩, গাঙে ভেসে যায় সোনার নৌকো ৭৩, সংগীত ভ্রমণ ৭৪, দরজাটা বন্ধ হল ৭৬, শক্তি ৭৬, দু'-একবারই মাত্র ৭৮, জাদু বাস্তবতা ৭৮, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ৮০, সরস্বতীর বীণা ঝংকারে ৮০, সেই দিনটি ৮১, এবার বসন্তে ৮২, পিকনিকের আগে ৮৩, জয়দ্রথ ও দ্রৌপদী ৮৪, অন্য কবি ৮৫, কে লিখবে ৮৬, ভোরবেলার উপহার ৮৭, এত ঋণ এত ঋণ ৮৮, ভালোবাসার ভিখিরিগুলো ৮৯, বাবা ৮৯, সবই আছে ৯১, জন্মস্থান ৯২, উত্তরকালের জন্য ৯৩, স্নানের পরে ৯৪, সময় মিলিয়ে গেল ৯৫, কাল রাতের বেলায় ৯৬, লিখে যেতে হবে ৯৬, ওগো নারীবাদী তীব্র লেখনী ৯৮, বৃত্তের মাঝখানে ৯৯, হলুদ পাখি ১০০, সাঁকোর মাঝখানে ১০০, স্বপ্নে দেখা ছবির মতো ১০১, নিউটন ও ভ্যান গঘ ১০২, মাটি ১০৩, পানকৌড়ি ও মাছরাঙা ১০৪, কবি ১০৫, বই ১০৬, সহজ কথার গান ১০৭, এসো আমরা ১০৭, পরমার্থের ছবি ১০৮, দ্বীপ ১০৯, ওজন-পাল্লা ১১০, বারবার প্রথম দেখা ১১০, বন্ধুবান্ধব ১১১, লেখা, লেখা, লেখা ১১৩, ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া ১১৪, কে দেয় পরমায়ু বিসর্জন ১১৪, দুটি নাম ১১৫, বন্ধুস্মৃতি ১১৬, একটি গ্রাম্য দৃশ্য ১১৭

ভেঙে পড়েছে সাঁকো

অন্ধকারে নদী পেরুব, ভেঙে পড়েছে সাঁকো
ছোট্ট নদী, ছুঁড়ি প্রতিম, বৃষ্টি খেয়ে মাতাল
ছিঁড়ে খাচ্ছে গাছের ডাল, জিভে চাটছে মাটি
হিজল গাছের ঘাড় মটকে হা হা করছে বাতাস।

ওপারে কেউ যাবে না আর রাত্রি চোখ বন্ধ
আমি তা হলে কোথায় যাই, খিদের ধিকিধিকি,
ঘুমের টান, নেশার টান, কোথায় গিয়ে মেটাই
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে পৃথিবী গেল থেমে।

আমিটা কে? হেঁকে বলো হে, আছে কি কোনো নাম?
নদী পেরুতে এলে এখানে, পেরুতেই যে হবে
এমন মাথার দিব্যি কেউ তোমায় কবে দিল?
না পেরুলে আজ রাতেই দুনিয়া উল্টে যাবে?

আমির মধ্যে অন্য আমি, ঘুমের মধ্যে জাগা
মেঘের মধ্যে ভেজা বারুদ, ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না
গ্রন্থভুক পথ পাগল, প্রেমিক উদাসীন
একটা আমি ছাতা মাথায়, অন্য আমি নদীর জলে নামে।

গাঙে ভেসে যায় সোনার নৌকো

গাঙে ভেসে যায় সোনার নৌকো, ধরতে পারি না, দৌড়ে এসেও
ধরতে পারি না
হেঁতাল ঝোপের আড়ালে কে দিল হাতছানি, দিল হাতছানি, তাকে
দেখেছি কখনো, দেখেছি অচেনা
গেরুয়া জলের ভিতরে জলের ভিতরে শব্দ, জল গিলে খায়
জলের শব্দ
রোদ আঠা হয়ে নেমে আসে গায়, নেমে আসে নীচে, মাটিতে,
শিকড়ে

বেলা যায়, বেলা সমূহ গড়ায়, বেলা ভেসে যায় পায়ের তলায়

এখন সন্ধে নিকষ একলা, সন্ধে একলা, ফেরিঘাটে বসে
আমিও একাকী
এ নদীতে আর কিছুই যায় না, নদী ছাড়া আর কিছুই যায় না
জলের আঁচলে প্রতিমার ঘ্রাণ, খড়ের প্রতিমা, কুলুকুলু হাসি,
শরীরের ঘ্রাণ
মাঘ রজনীতে প্রথম শরীর, প্রথম রাত্রি, রাত্রিকে ভাঙা, ভেঙে ভেঙে
সারা জীবনে জড়ানো
এই ছেলেবেলা, এই যৌবন, সামনে পেছনে লুকোচুরি খেলা
কে ডাকে কে ডাকে হাওয়া উন্মন, হাওয়ার ডানায়
উড়ছে আকাশ
দুলছে আকাশ, নামছে আকাশ, জলে ডুব দিল আমার আকাশ...

সংগীত ভ্রমণ

শীতকালের বিকেল, কিছুই করার নেই, এরকম সময়ে চরম শত্রুকেও যেন
হোটেলের ঘরে একলা থাকতে না হয়
বই নেই, বাইবেল পড়ব? সকালের বাসি কাগজ?
দমবন্ধ ঘরে আরশোলার গন্ধ, জানলা খুলতেই কনকনে হাওয়া
টিভি দেখলে গা নিশপিশ করে, মনে হয় কোনো নিচুস্তরের গ্রহের সংস্কৃতি
হঠাৎ টেলিফোন, অশোক বাজপেয়ী বলল, চলো ইয়ার,
কিছুক্ষণ গান শুনে আসি
ভোপালের ভারত ভবনে ঘরোয়া আসরে এসেছেন এক শিল্পী
নীল হাতা শার্ট ও ধুতি পরা, প্রায় বুড়ো, ট্রেনের টিকিট চেকারের মতন গোমড়ামুখো
দেখলে একটুও ভক্তি হয় না, এ আবার কাকে ধরে এনেছে?
পাবলিক রিলেশানস যাচ্ছেতাই, মুখ তুলে ক্যামেরার দিকে চোখ
রাখতেও জানে না—
তানপুরায় মৃদু ঝংকার তুলে গান ধরলেন মল্লিকার্জুন মনসুর
সাত মিনিট শোনার পর মনে হল উঠে যাই, হোটেলের ঘরেই ফিরে
হুইস্কি পান করতে করতে ভালো কোনও ক্যাসেট শুনি
একা একা গান শোনাই বেশি আরামের,

পছন্দমতন গান দিয়ে ছবি আঁকা যায়
ঠিক ঠিক গান শুষে নেয় শরীর, ভেসে ওঠে নারীর মুখ,
আকস্মিক মিলন রোমাঞ্চ
এখানে এই ভিড়-ভর্তি ঘরে বসে আছি কেন?

একাদশ মিনিটে হঠাৎ একটা হলক্‌তানে কেঁপে উঠল নাদব্রহ্ম
ঘরভর্তি বাতাস ছিটকে সরে গেল, বাতাস নেই, শুধু সুর
মানুষের পায়ের ধুলো, মাকড়সার সূক্ষ্ম জাল, পায়রার খোপে খোপে
সুরের প্রতিধ্বনি
সমস্ত মুখগুলি সুরের ছোঁয়ায় অবনত
এ লোকটা কে? এখন আর চেনা যাচ্ছে না, মিলিয়ে গেছে তিন সপ্তকে
যেন ফৈয়াজ খান ও গহরজান দাঁড়িয়ে আছেন দু'পাশে
আকাশে ছবি আঁকছেন মল্লিকার্জুন, পাহাড়ের মতো মেঘ রাগ
'গরজে ঘটা ঘন কারি কারি...' নেয়ামত খাঁর বন্দেশ
আমার পায়ে ম্যাজিক আঠা, ওষ্ঠে সন্ধেবেলার তৃষ্ণা,
তবু উঠতে পারছি না
ওই নীল শার্ট পরা লোকটা মন্ত্রপড়া ধুলো ছিটিয়ে ধরে রেখেছে আমাকে
এক একবার তাকাচ্ছে বাঘের চোখে, যেন খুঁজছে হরিণ
রবীন্দ্র-সংগীতের মেঘ নয়, শোনা যাচ্ছে ভেতরে ও বাইরে বজ্রপাত
ওগো মল্লিকার্জুন, এবার থামো থামো, আমাকে যেতে দাও
অন্তরা থেকে সঞ্চারীতে অজস্র রঙিন সুতো
বিস্তার থেকে আরও বিস্তারে, কখন সমে ফিরে আসবে সেই রোমাঞ্চ
কে কাকে শোনাচ্ছে গান, কী তীব্রতম নিঃসঙ্গ গায়ক,
মাটির দিকে মুখ
রোগা রোগা হাতের আঙুলে তানপুরা, কক্ষটির ছাদ উড়ে গেল,
উন্মুক্ত হল দিগন্ত
মোটর দুর্ঘটনায় নিহত আমির খাঁ হাত চাপড়ি দিচ্ছেন দূরে দাঁড়িয়ে
দুই বোন হীরাবাঈ আর সরস্বতী রানে বাতাসে উড়ছেন পরীদের মতন
পটভূমিকায় সমস্ত গন্ধর্বলোক
আমি বসে আছি সমুদ্রের ধারে, সপ্তসুরের ঢেউ জলোচ্ছ্বাসের মতন
ঝাপটা মারছে শরীরে
নিচু হয়ে আসছে আকাশ...

এইবার বৃষ্টি নামবে!

দরজাটা বন্ধ হল

দরজাটা বন্ধ হল, তবু যেন বেশি শব্দ হল
কেউ এল? কেউ গেল? দরজা তাকে পছন্দ করেনি
প্যাঁচার পালক খসা রাত হল,
জোনাকিরা পিকনিকে মেতেছে

যেখানে দুপুর ছিল, সেখানে নিঝুম রাত ম্যাজিক দেখায়
কালো আঙরাখা সব ঢেকে আছে, কেউ উঁকি দেবে না এখন
আমি শার্ট খুলে গেঞ্জি...পা-জামায় গিঁট বাঁধতে গিয়ে

দু' এক মুহূর্ত থমকে থাকি
দরজাটা এপারে ওপারে
আমি বা আমার মতো, তার ইচ্ছে ভাবিনি কখনো
কে ওদিকে? একা রাত, এখন ঘুমের শব্দে
এত বাল্যকাল।

শক্তি

রাত বারোটা কি দেড়টায় কবিতার খাতা খুলতেই বাইরে
কে আমার নাম ধরে তিনবার ডাকল?
গলা চিনতে ভুল হবার কথা নয়, তবু একবার কেঁপে উঠি
এই তো তার আসবার সময়, বরাবরই তো সে রাত্রির রুটিনে
পদাঘাত করে এসেছে
দুনিয়ার সমস্ত পুলিশ তাকে কুর্নিশ করে, রিকশাওয়ালারা ঠুং ঠুং
শব্দে হুল্লোড় তোলে
গ্যারাজমুখী ফাঁকা দোতলা বাসের ড্রাইভার তার সঙ্গে
এক বোতল থেকে
চুমুক দেয়
উঠে গিয়ে বারান্দায় উঁকি মেরে বলি, শক্তি, চলে এসো,
দরজা খোলা আছে

খাকি প্যান্ট ও কালো জামা, মাথার চুল সাদা, মুঠোয়
সিগারেট ধরা
শক্তি একটু একটু দুলছে, জ্যোৎস্না ছিন্নভিন্ন করে হেসে
উঠল
ঠিক যেমন রূপনারান নদীর তীরে দুরন্ত ছোটাছুটির সময়
হেসেছিল
ঠিক যেমন হেসাডির বাংলোয় সর্বনাশ তুচ্ছ করে হেসেছিল
মুখ তুলে বলল, কবিতা লিখছিলে, সুনীল? না, লিখো না,
লিখো না, আমি লিখছি না, তুমিও লিখবে না।

এমন কিছু পান করিনি যে আমার দৃষ্টি বিভ্রম হবে,
হলোগ্রাম দেখব
কোথায় শক্তি? মাঝরাতের রাস্তা শুনশান, অতি নিঃসঙ্গতার
মতন মোহময়
শক্তি আর কখনও আসবে না, যখন তখন এসে রাম চাইবে না,
তা কি আমি জানি না?

আবার ফিরে আসি কবিতার খাতার কাছে, কলম তুলে নিই
আঙুলে
পরক্ষণেই সিগারেট ধরাতে গিয়ে দপ দপ করে আগুন, মুখের
মধ্যেও টের পাই আগুন
সমস্ত শব্দের মাত্রা ও ছন্দ হারিয়ে যায়, সাদা পৃষ্ঠা জ্বলজ্বল
করে
শক্তি নেই, কবেকার সেই দু'জনে মিলে লেখা লেখার খেলা
হঠাৎ শেষ হয়ে গেল
আমি চুপ করে বসে থাকি, রাত্রি ঝরে পড়ে, যেন উড়ছে
আমাদের লেখাগুলির ছিন্ন পাতা
আমি চুপ করে বসে থাকি, সাদা দেওয়াল, কানে তালা
লাগিয়ে দিচ্ছে স্তব্ধতার বাজনা
খাকি প্যান্ট ও কালো জামা, সাদা চুল, মুঠোয় সিগারেট ধরা
শক্তি একটু একটু দুলছে...

দু'-একবারই মাত্র

আজ আর ঘুম এল না, জেগে উঠে দেখলাম ঘুমকে
এ রকম হয়
মানস নদীর ধারে মাথায় চাঁদ জাগা সেই এক রাতে
আর কিছু দেখিনি, অন্ধকার রাত্রির শরীর দেখেছি
জীবনে দু'-একবারই মাত্র এ রকম দেখা হয় চকিতে
তেইশ বছর বয়সের সেই যে বুক ফাটা চোখ ভেজা
দুঃখ পাওয়া
যা নিয়ে লিখেছি কত না কবিতা
আজ তা বুঝতে পারি, অনেকটাই ছিল ভুল
মেয়েটি নয়, সেই প্রথম আমি দুঃখকে দেখেছি স্বচক্ষে
বরাইবুরুর কাছে একটি ঝর্নার ধারেকাছে কেউ ছিল না
ঝর্নাটি নিজেই সেখানে স্নান করছিল আপন মনে
যেমন একটা বই মাঝে মাঝে পাতা উল্টে নিজেকেই পড়ে
একটা থেমে থাকা গান নিজেকেই গানটা শোনায় কখনো
আগুন এক এক সময় মুগ্ধ হয়ে দেখে আগুনেরই রূপ
শুধু আজও তেমন করে দেখতে পেলাম না ভালোবাসাকে
সমস্ত শরীর ছাপিয়ে তার এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা!

জাদু বাস্তবতা

এ গ্রামটায় আগে আমি কখনো আসিনি
তবু মনে হয় যেন, স্বপ্নে আধো জ্যোৎস্নায় সব কিছু
আগে থেকে দেখা
জামরুল গাছের নীচে খাটিয়ায় বসা, হুঁকো হাতে
বৃদ্ধটি কে? আমার ঠাকুর্দা নয়!
দুটি নারী পুকুরের দিকে গেল জল সইতে, মুখে
সায়াহ্নের আলো মাখা
শান্তি আর বিন্তি পিসি দু'জনে যমজ বোন, ভুল করে
কত না হেসেছি

নৌকোর মাঝিকে দেখে ফৈজুদ্দিন বলে প্রায় ডেকে
উঠছিলুম আর কি!
রান্নাঘর থেকে পাছ-দুয়োরের দিকে যাচ্ছে মা
ওই তো চেতন স্যাকরা, মা-র শেষ দু'গাছা সোনার চুড়ি
বন্ধক নিয়েছে কাল রাতে
বাবা নিরুদ্দেশ, তাই ঠাকুর্দা মাঝে মাঝেই হাঁক পাড়েন
কে আসে? কে আসে?
খালধারে অতিকায় বট বৃক্ষটির গর্তে তক্ষকের বাসা
ঠিক সাতবার ডাকে, কোনোদিন সংখ্যাটা ভোলে না
পাট খেতে ফিসফিসানি, ঝুরো বৃষ্টি, দিঘিতে ডুবন্ত চাঁদ
সব একই ছবি
গোয়াল ঘরের পাশে মাঝরাতে বোবা কালা প্রেতটিও
খুব যেন চেনা...

আসলে আমার কোনো গ্রাম নেই, কখনো ছিল না
ঠাকুর্দা সবারই থাকে, আমার ছিলেন যিনি, তিনি চোখ
বুজেছেন আমি এই পৃথিবীতে
চোখ মেলবার ঢের আগে
বাবা কেন নিরুদ্দেশ হতে যাবেন, চিরকাল মুখে রক্ত তুলে
তিনি তো করে গেলেন শহরে মাস্টারি
ফৈজুদ্দিন নামে কোনো মাঝিকেই আমি সারাজীবনে দেখিনি
তক্ষকের ডাক? হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার শুনেছি বটে
রাজা-ভাত-খাওয়া ইস্টিশানে
তবু যেন এই গ্রাম, এই যে মাটিতে পা, জল-কাদা
এসব আমারই
সবই চেনা দৃশ্য, সব প্রিয় মুখগুলি
ধারালো সত্যের মতো ঝলসে ওঠে আসন্ন সন্ধ্যায়
সকলেরই নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে হয়, তবু গলা বুজে গেছে
চোখ কেন জ্বালা করে, আসে তো আসুক
এ মাটিতে মিশে থাক, অকারণ, অনধিকারীর মতো
আমার দু'-এক ফোঁটা অশ্রু, লোকে
বলে তো বলুক, সেটা
নিছক ন্যাকামি!

তোমার সঙ্গে দেখা হলে

তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি মানুষকে ভালোবাসো না, অথচ দেশকে ভালোবাসো কেন?
দেশ তোমাকে কী দেবে?
দেশ কি ঈশ্বরের মতন কিছু?
তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
গুলি বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিলে দেশ কোথায় থাকবে?
দেশ কি জন্মস্থানের মাটি, না কাঁটাতারের সীমানা?
বাস থেকে নামিয়ে যাদের তুমি হত্যা করলে
তাদের বুঝি দেশ নেই?

তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি কী করে জানলে, আমি তোমার শত্রু?
কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তুমি আমার দিকে
রাইফেল তুলবে?
এমন ভালোবাসাহীন দেশপ্রেমিক হয়!

সরস্বতীর বীণা ঝংকারে

সকালবেলার দিকবধূটির বরতনু ভরা
ফুলের গয়না
ভেজা চুল, যেন স্বর্গ নদীতে স্নান সেরে উঠে
এসেছে সদ্য
ওকে নিয়ে আজ একটা চম্পুকাব্য লিখলে
মন্দ হয় না
বেলা বাড়ে যেই হিংসার মতো লকলকে রোদ
গদ্য গদ্য!

বেলা বাড়ে, শুধু দিন নয়, যেন সোনার বদলে
শস্তা গিলটি

দিগঙ্গনারা তাই নেড়ে চেড়ে দেখে আর বুক
ফোলায় গর্বে
রূপ আর কূপ এই নিয়ে বাঁচা? মনে মনে ভাবে
কেমন মিলটি
মিল নেই কিছু, বিন্দু বিন্দু আয়ু চলে যায়
কালের গর্ভে!

আমার আয়ুর আমিই বিনাশী, রাতে ঝরে পড়ে
লঘু মুহূর্ত
অন্ধ গলিতে শুধু হুড়োহুড়ি, ঠোঁটে সিগারেট
গেলাসে মদ্য
কবিতার খাতা ইঁদুরে কাটছে, দেখাও যায় না
এমনই ধূর্ত
সরস্বতীর বীণা ঝংকারে গানের বদলে
এখন গদ্য!

সেই দিনটি

গান্ধীজি বললেন, পানি পিলা দেও

স্কুল বালক আমরা খাকি হাফ প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে
সারবদ্ধ হয়ে গেছি বেলেঘাটা
শহরের এখানে ওখানে পোড়া ক্ষত, বাজার লুট, জানলা ভাঙা বাড়ি
রাস্তা থেকে লাশগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, দুর্গন্ধ যায়নি
এখনো কান পাতলে বাতাসে শোনা যায় কাপুরুষ খুনিদের চিৎকার
এরই মধ্যে এই গোরুর গাড়ির দেশে বিমানে চেপে হুড়মুড়িয়ে চলে এসেছে স্বাধীনতা

বেলেঘাটায় মুসলমান বসতির পাশে এক বাড়ির উঠোনে
খাটিয়া পেতে শুয়ে আছেন গান্ধীজি
তাঁর চোখের নীচে শুকনো অশ্রুর রেখা
দূরে ব্যান্ড বাজছে, পতপত করে উড়ছে অসংখ্য তেরঙ্গা ঝাণ্ডা
রঙিন কাগজের শিকলি ঝুলছে অনেক বারান্দায়

যারা দেশকে মা বলে ডেকেছিল, তারা দেখছে সেই মাকে
কুচিয়ে কুচিয়ে কাটছে র‍্যাডক্লিফের ছুরি
ফিন্‌কি দিয়ে উঠছে রক্ত, সেই রক্ত গায়ে মেখে কত মানুষ
মেতে উঠেছে স্বাধীনতার উৎসবে
ভাড়াবাড়ির স্যাঁতসেঁতে একতলার ঘরে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন বাবা
প্রায় অন্ধ ঠাকুমা কিছুই বুঝছেন না, ব্যাকুল ভাবে একে ওকে
জিজ্ঞেস করছেন, কী হল, অ্যাঁ? আমরা আর
বাড়িতে ফিরতে পারব না? আম গাছগুলো, আমার
নিজের পোঁতা তুলসী গাছ,...পুকুর ঘাটে কে
বসে আছে?

গান্ধীজি ভাঙা ভাঙা গলায় মুসলমান ছেলেদের বললেন, হিন্দু ভাই লোগোঁকো
পানি পিলা দেও
আমরা ছুটে গিয়ে তাদের হাতের গেলাস থেকে জল খেলাম, কী অপূর্ব স্বাদ,
যেন অমৃত, কত হর্ষময় কোলাকুলি হল
তবু ভাগ হয়ে গেল নদীগুলো, শূন্যে তারকাঁটা, এক পাশে পানি
আর এক পাশে জল!

এবার বসন্তে

এবার বসন্তে কিছু ফুল ছেঁড়া হল
কোকিলও ডেকেছে খুব বাঁশের খাঁচায়
এবার বসন্ত লাস্যে কিছু দিক ভুল
অন্ধকারে সমুত্থিত তৃতীয় বিষাদ।

এবার বসন্তে গান শুরু হল ঠিকই
মাঝপথে কারা যেন দুন্দুভি বাজাল
কোথাও পাথর ফেটে বেরিয়েছে জল
অনেকেই ছুটে গেল, একজন গেল না।

এবার বাতাসে ছিল কিছুটা অমিয়
একাকী আঘ্রাণ নিলে স্পষ্ট বোঝা যায়

উৎসবের রাতগুলি কে কোথায় একা
হাতে হাত ধরাধরি, সবাই অচেনা।

এবার বসন্তে ঠিক মধ্য যামিনীতে
এল এক ডাকপিওন, অন্ধ, জিভকাটা
সে বড় মজার খেলা, কত হুড়োহুড়ি
সকলেরই চিঠি আছে। কারো নাম নেই।

পিকনিকের আগে

কে যে কার সঙ্গে যাবে, তিনখানা গাড়ি
আমরা এগারোজন, ফাল্গুনের লোধ্ররেণু মাখা সেই ভোর
লাল গাড়ি, কচি কলাপাতা শাড়ি, মানায় না মানায় না মোটে
কেউ কেউ হেসে ওঠে, আকাশে জবাকুসুম, ভিন্‌দেশি মেয়ে
স্টিয়ারিং ছুঁয়ে আছে, সিগারেট নেই তবু মুখে তার ধোঁয়া
যার যার গোঁফ আছে কালো গাড়িটিতে তারা উঠতে পারবে না
একটি শালিক দেখে হরিণী-নয়না আরও খোঁজে ইতি উতি
মন্দিরের সামনে গিয়ে চটি খোলে দুর্দান্ত পঁচিশ
এই মাত্র বয়ে গেল নদীর মতন এক হিমেল বাতাস
সঙ্গে কিছু নিয়ে গেল, কয়েকটা কথার টুকরো, গোপন ঝিলিক
পায়ে পায়ে অস্থিরতা, তিনজোড়া স্তনবৃন্ত অতীব উন্মুখ
বিয়ার বোতলগুলি খোলা হবে, ভুলে গেলে বটল ওপনার?
উরুতে চাপড় মারে দুর্যোধন, সেই আজ দ্রৌপদীকে পাবে?
তবে আর দেরি কেন, এখানেই খেলা শুরু হোক।

জয়দ্রথ ও দ্রৌপদী

অতঃপর জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে
বনপথে দ্রুত ধাবমান
ক্রোধ ও বিস্ময় ভরে হীরকাক্ষী দ্রুপদতনয়া
দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, হে নৃপকুমার,
উচ্চবংশে জন্ম তবু এ কী নীচ আচরণ তব?
আমার স্বামীরা কেউ আশ্রমে এখন নেই, তবুও তোমাকে
আতিথ্য দিয়েছি আমি, প্রাতরাশ প্রস্তুত করেছি
মৃগ ও শরভ, শশ, বরাহ, মহিষ মাংস দিয়ে
কিছুই ছুঁলে না, তুমি আমাকে ছুঁয়েছ পাপ মনে
জানো না কি শাস্তি এর? চেনো না আমার স্বামীদের?
কুক্কুর বোঝে না বুঝি সিংহের বিক্রম!

বৃষ্টিভেজা কদম্বের মতন আপ্লুত স্বরে বলল সিন্ধুরাজ
তোমার স্বামীরা আজ রাজ্যচ্যুত, দীন ও শ্রীহীন
কী হবে তাদের কথা মনে রেখে, আমাকে ভজনা করো তুমি
তোমাকে, হে বরারোহা, দর্শন মাত্রই আমি তড়িৎ আহত!
এতকাল সুন্দরের যত বিভা গোচর করেছি
তোমার রূপের কাছে সব যেন তুচ্ছ হয়ে গেল
লাবণ্য যৌবনবতী নারীদেরও কম তো দেখিনি
তোমার তুলনা দিলে তাদের বানরী মনে হয়!
তোমার গোড়ালি উচ্চ নয়, ঊরুদ্বয় পরস্পর
স্পর্শ করে আছে
স্তন দুটি নিতম্বের প্রতিবিম্ব, নাসিকা উন্নত
নিম্ননাভি স্বভাবেরই মতন গভীর
পদতল রক্তবর্ণ, যেমন ওষ্ঠ ও করতল
কাশ্মীরী তুরগীসম সুদর্শনা, হে সুকেশী, শ্যামা
অধরে অমৃতমাখা, পীন পয়োধর যেন অয়স্কান্ত মনি
দু' চক্ষু ভরেও দেখা শেষ হয় না এ শরীরী রূপ
শরীর শরীর চায়, বক্ষে বক্ষ টানে
এ রমণীরত্ন দেখে উন্মত্ত হওয়া কি অপরাধ?
পাপ নেই, পুণ্য নেই, আজ আমি সকলই ভুলেছি
কাম জীবনেরই ধর্ম, কামানল প্রকৃতি জানায়
কামার্ত পুরুষ আর নারীর মিলন, সেও প্রকৃতির খেলা

সকল সুখের শ্রেষ্ঠ রমণ-সম্ভোগ, কেন সময় হরণ?
হে অগ্নিশিখারূপিনী, আমার অগ্নিকে দীপ্ত করো!

এই কথা শুনে কৃষ্ণা ঘৃণা ভরে দূরে সরে গিয়ে
বললেন, ওরে মূঢ়, তোর ওই স্তুতিবাক্যগুলি
শুধুই কদর্য নয়, যেন কোনও রোগীর বিকার
সবলে নারীকে যারা পেতে চায়, তারা কি পুরুষ, নাকি পশু?
কাম শরীরের নয়, মনোবাঞ্ছা, এবং সে মন দু' জনের
দুটি মন যদি মেলে, তখনই শরীর জেগে ওঠে
নারীর বাসনা, সাধ যে জানে না, জানাই যে মিলনের সার কথা
তাও যে জানে না
সারাটা জীবন তার মরুভূমি, ব্যর্থ বাঁচা, সে পুরুষ নয়
পেশি শক্তি দিয়ে যারা নারীর শরীর চায়, তারা সম্ভোগের সুখ
জীবনে জানবে না
ওরে দুরাচার, শোন, অমৃত পাবি না তুই,
দগ্ধ হবি নিজের আগুনে!

অন্য কবি

আহা সে পায়নি কিছু, না প্রেম, না প্রতিষ্ঠার সুখ
বহুকাল আগে এক মৃত কবি, দগ্ধ আয়ু, অপর ভাষার
সরু নদীটির পাশে সে এক নারীর দুই বিস্তীর্ণ উরুতে
রাখা খাতা,
না-লেখা অক্ষরে এসে শুতে চায়...

না, এটা কবিতায় কোনো ভূতের গল্প নয়। দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই আমি, অকস্মাৎ। ফার্নান্দো পেসোয়া, পর্তুগিজ, ক'জনই বা চেনে এ দেশে! আমিও পড়েছি যৎসামান্য। ক্ষীণকায়, দুর্যোগতাড়িত, হাহাকারময় এক কবিতা-সর্বস্ব জীবন। এ কালের ঐ নারীটিকেও তেমন চিনি না, কখনো সে নিজে কিছু লেখে, কখনো প্রিয় কবিতা বুকে তুলে নেয়, কখনো সে শব্দ-পংক্তির নেশায় কাঁদে। দুই দেশ, মধ্যে কত নদী পর্বত-অরণ্য, সেসব পার হয়ে সেই অভিমান-হত কবিটি ছায়া মূর্তি হয়ে এই রমণীটির কোলের খাতার মধ্যে শুয়ে, নিতে চায় আদর।

আমি তাকে দিতে চাই আয়ু, সে জীবন্ত হোক,
আনুক উত্তাপ
দু' জনের আঙুলে আঙুল...

সত্যিই দিতে চাই? নাকি ভাবের ঘরে চুরি? মাঝে মাঝে নিজের ব্যর্থতাবোধ এত তীব্র, যেন একটা অলঙ্ঘনীয় পাহাড় এসে দাঁড়ায় সামনে, কবিতা মুচড়ে দিচ্ছে বুক, তবু খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক শব্দ, অসহ্য ছটফটানি, তখন মনে হয়, আমার বদলে লিখুক না অন্য কেউ...

অথবা উঠুক জেগে সপ্তর্ষি ও পাতাল-যামিনী
এক সঙ্গে, বাতাসের বিভাজন, রণরঙ্গ, শব্দ শব্দ খেলা
হে কবি, হে কবিতা-মথিত নারী, আরও গাঢ়
দৃশ্যমান হও
দু' জনের আঙুলে আঙুল
আমাকে বাঁচাও, আমি ব্যর্থতার গ্লানি ধুতে তোমাদের কবিতায়
ডুব দিতে চাই!

কে লিখবে?

—পৃথিবীতে অলৌকিক কি আর কিছু নেই?
—আছে, আছে, সে সব কথা পরে হবে, তবে খিদে জিনিসটা
একেবারেই লৌকিক
যেমন আকাশ ভরা এত দুর্বোধ্যতা
কিন্তু একমাত্র ক্ষুধার্ত মানুষই একটুও দুর্বোধ্য নয়
—এ কী অদ্ভুত কথা, মানুষ দুর্বোধ্য নয়?
—মানুষ বলিনি, বলেছি ক্ষুধার্ত মানুষ!
—ক্ষুধার্ত মানুষের সব কিছু বোঝা যায়? শুধু
খিদেটাই তার মনুষ্যত্ব, আর কিছু না?
—খিদের সময় যে আর সবকিছুই অবান্তর হয়ে যায়, সে
ফুলের দিকে তাকায় না, সে গান শোনে না
—তুমি কী করে জানলে?
—এই পোড়া দেশ, তাকালেই দেখা যায় চারদিকে।

নিরন্ন, অপমানিত মানবতা, খিদের জ্বালায়
যখন শিশুরা কাঁদে...
—তোমার সন্তান কখনো না খেয়ে থেকেছে সারাদিন?
তুমি কি দিনের পর দিন পেট পুড়িয়ে
থেকেছ? তুমি দিনের পর দিন আকাশের দিকে
না তাকিয়ে খুঁজেছ খুদ-কুঁড়ো? জানো কি
তার কান্নার মধ্যে স্বপ্ন থাকে কি না?
তুমি কী ভাবে সাতকাহন করে লেখো তার দুঃখের কথা?
—সে যে নিজে কখনো লেখে না! সে কলম চেনে না, সে
খিদের জ্বালায় কাগজ খেয়ে ফেলে
তা হলে কি কেউ লিখবে না তার কথা?
—লেখার আগে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও!
—ঐ ক্ষমার ব্যাপারটাই অলৌকিক, তখন চোখ ঝাপসা হয়ে যায়!

ভোরবেলার উপহার

ভোরবেলার জানলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে
ঘুম ভাঙিয়ে কাছে ডাকে হাতছানি দিয়ে
তখন অন্ধকারে আলপনা আঁকছে সদ্য-ভূমিষ্ঠ এক বালিকার
আঙুল
আলপনার মধ্যে একটা চিরহরিৎ গাছ
তার প্রত্যেকটি পাতায় এক এক বিন্দু শিশির
একটা বিন্দু এই মাত্র খসে পড়তে পড়তে বলল, এসো
জানলা বলল, এই নাও, তোমার নতুন জন্মের উপহার
কাল রাত্তিরে আমি নরকে ডুবেছিলাম, আবার স্বর্গদর্শন হল।

এত ঋণ, এত ঋণ

ভোরের বাতাস কিছু চায়
হিরণ্য আঁচলখানি দিগন্তে ছড়িয়ে কিছু চায়
কী দেব তোমাকে?
টগর, মল্লিকা, জুঁই, বৃষ্টিতে গা ধুয়ে
চুল বাঁধে, টিপ পরে, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই
কলস্বরে বলে ওঠে, শুধু নেবে, কিছু কি দেবে না?
দিতে হবে, কী দেব ওদের?

মাটিতে পায়ের ছাপ, কোনোদিন ক্ষমা চেয়েছি কি?
সকলেই স্বার্থপর দৈত্য, শুধু নিয়ে যাচ্ছি,
অনর্গল ভোগী
চুষে, ছিঁড়ে কামড়ে খেতে দ্বিধা নেই, দিই না কিছুই
দেশ দেশ বলে এত কান্না, এত গলা ফাটাফাটি
এত কবিতা ও গান
সব ভান! জননী না ছাই! তলপেট ছিন্নভিন্ন করে
দিতে দ্বিধা নেই

ভোরের বাতাস কিছু চায়
নদীটির কুলুকুলু ধ্বনি কিছু চায়
ঘুম ভাঙা আকাশের বিমূর্ত কিরণ কিছু চায়
ভাঙা বাড়িটার পাশে নিঃসঙ্গ নয়নতারা, সেও কিছু চায়
চারিদিকে সুন্দরের অজস্র আসন পাতা, কাদা মাখা পায়ে
আমরা দৌড়োচ্ছি সব লণ্ডভণ্ড করে
এত ঋণ, এত ঋণ, চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই।

ভালোবাসার ভিখিরিগুলো

ভালোবাসার ভিখিরিগুলো কবিতা লেখে নিরালায়
যেমন অন্ধ ছড় টেনে যায় ভাঙা মাটির বেহালায়
দুনিয়া-জোড়া রক্তচোখ, দুনিয়া-জোড়া খাই-খাই
দুনিয়া-জোড়া ছুরি ও কাঁচি, দুনিয়া-জোড়া ভাই-ভাই
যে-পাখি ছিল বসন্তের এখন তার পাখনায়
লাগে না আর মলয়ানিল, বিষের ধোঁয়া পাক খায়
যেখানে ছিল ছেলেবেলার মালতী, যূথী, রঙ্গন
সেখানে বেড়া কাঁটাতারের, যুযুধানের অঙ্গন
ভালোবাসার কথা কে বলে? যে শোনে তার হাসি পায়
যেন নোংরা রুমাল একটা পথের পাশে ফেলে যায়
নারীর পাশে পুরুষটি কে? কত কথার ফুলঝুরি
প্রেমবিহীন প্রেমের দৃশ্য, যে যার করে মন চুরি
কিংবা মন, কেন-বা মন, মনেরই বা কী দরকার
শরীর ঘিরে গণতন্ত্র, শরীরবাদী সরকার!

কবির দল ভিখিরি আর কাঙাল, ওরা দিনরাত
ভালোবাসার জন্য শুধু বাড়িয়ে রাখে দুই হাত
ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি, বৃষ্টি ভেজে অকারণ
যার কৃপা চায় ঠোঁট বেঁকিয়ে সে বলে যায়, আ মরণ!
পাবে না কিছু জেনেও বুক উজাড় করে চায় দিতে
নেবেই বা কে, সব শুনশান, কেউ নেই তার চার ভিতে
তবু এমনই জেদির দল, এমনই ওদের ভুল আশা
ধ্বংস হয় হোক পৃথিবী, বাঁচিয়ে রাখবে ভালোবাসা!

বাবা

বাবা বললেন,
অন্ধকারে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাক আমার জন্য
মাটির তলার একটা সুড়ঙ্গে নেমে গেলেন
খুব আস্তে আস্তে

আকাশে প্রান্ত নির্ণয় ভুল করে ছুটে গেল একটা উল্কা
বন্দরে একটাও জাহাজ নেই, রাস্তাগুলো দুলে ওঠে
কী যে হল
বুঝতে বুঝতেই কেটে গেল আরও উনিশটা বছর
এর মধ্যে কত হুড়োহুড়ি, কত মধুলোভীদের সঙ্গে ঘুরপাক
বাবা, বাবা!
বোতাম বোতাম মাশরুম খুব ইচ্ছে করে
বাবাকে খাওয়াতে
আর রুমালি রুটি
অন্তত একবার কাস্পিয়ান হ্রদের মাছের ডিম
ইচ্ছে করে একটা বারান্দাওয়ালা ঘর উপহার দিতে
বাবার থেকে এখন আমি বয়েসে অনেক বড়
আমার একুশটা হাত
তিনটে চোখ
প্রতিদিন সাতশো দরজা পেরিয়ে যাই
শ্যামপুকুর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আমার অল্পবয়েসি বাবা
বলে উঠি, সাবধানে যাও, গাড়ি চাপা পড়বে যে
ফুটপাথে ওঠো
পাঞ্জাবিতে বগলের নীচে ফুটো, আমার পাঞ্জাবি
লাগবে না বাবার গায়
একটাও দশতলা বাড়ি দেখেননি, আমি সেখানে থাকি
জেনে গেলেন না বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশ হয়েছে
তাঁর জন্মস্থান ঘিরে...
আমার ছেলে ঠাকুমার পাশে শুয়ে গল্প শোনে
ঘুম পাড়ানি গল্প
ঐ সব গল্প কিছুদিনের মধ্যেই শরীরে আঁট হয়ে যায়
নতুন নতুন গল্প বানাতে ছেলের দল হৈ হৈ করে ছুটছে
বিমানে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে
আমি
যতদিন বাবার ছেলে ছিলাম
তার চেয়ে বেশিদিন নিজেই বাবা
আমার বুকের সব রোম পাকা, সকালবেলা কাশতে কাশতে
লক্ষ করি, রক্ত পড়ছে কিনা
বাবা ছবি হয়ে থেমে আছেন

নিজের থেকে কমবয়েসি কারুকে কি বাবা বলে ডাকা যায়?
তবু দেখতে পাই মাঝে মাঝে
আমিই চেয়ে থাকি স্নেহের দৃষ্টিতে
তাঁর ঘামে ভেজা মুখ, পরিক্রমা ক্লান্ত পা
কিছু দিতে ইচ্ছে হয়, যা যা পাননি
আমার ছেলের কাছ থেকে কিছু নেবার আগের মুহূর্তে
একবার আমার হাত কাঁপে!

সবই আছে

শ্মশানে একটাও চিতা জ্বলছে না
গ্রামটির স্বাস্থ্য ভালো আছে
গ্রামটির গণ্ডি অনেকটাই রুপো দিয়ে বাঁধানো
তিন দিকে ঘুরে গেছে নদী
কালবৈশাখীতে বটগাছটায় যে ডাল উড়ে গিয়েছিল
সেখানে গজিয়েছে নতুন চকচকে পাতা

চেতন মিস্তিরির খড়ের চালে তৃপ্ত ইষ্টকুটুম পাখিটি
গৃহস্থের খোকা হোক বলে ডাকল দু'বার
এ বাড়িতে কেউ নেই, হাওয়া আছে
বর্ষায় ঝলমল কুন্দকলির মতন স্বপ্ন আছে
মাটির মোহময় গন্ধের মতো প্রেম আছে
একটি জন্মান্ধ গিরিগিটির মতন বাসনার ছটফটানি আছে

ভাঙা শিবমন্দিরটার গায়ে চেতন মিস্তিরির আঙুল
চৌধুরীদের সিংহ দরজায় চেতন মিস্তিরির চোখ
রাস্তার এদিকে ওদিকে চেতন মিস্তিরির নিশ্বাস
গরম বাতাস ডাকছে—চেতন মিস্তিরি, চেতন মিস্তিরি
আকাশ থেকে লকলক করে নেমে এল বিদ্যুৎ
একটা শূন্য বাড়ি, কিন্তু সবই আছে!

জন্মস্থান

জুতো খুলব কি খুলব না, এই দ্বিধায় গাড়ি থেকে
নেমে পড়লুম জলকাদার রাস্তায়
কৈশোর-ভাঙা বয়েসের কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে চতুর্দিকে
দু'পাশে ধান ক্ষেত, তার বাতাসের হিল্লোল নিয়ে কবিত্ব প্রথাসিদ্ধ
কুঁড়ো জাল নিয়ে যে লোকটি মাছ ধরছে আপনমনে
সে আমার মগ্ন চৈতন্যের কেউ নয়
প্রকৃতি পাঠ থেকে সরে গিয়ে চোখ অনেক ঘষামাজা হয়ে গেছে
কালভার্টের পাশে উবু হয়ে বসে আছে একটা নির্লজ্জ লোক
এ দৃশ্য কি দেখার মতন?
হাতঘড়িতে শহরের পিছুটান, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেলেও
এখানকার এক বিন্দু জল খাওয়া চলবে না
একটু দূরে দুটি তালগাছ নন্দলাল বসুর ছবি, আর
বড় জোর মিনিট পাঁচেকের পথ
আমার সঙ্গীটি বলল, যারা নার্সিংহোমে জন্মায়
তারা কি সেখানে বারবার ফিরে যায়?

এবার বুক ঠেলে হাসি উঠে এল, এর মধ্যে বাস্তবতার
নামগন্ধ নেই
কাদায় যার পা ডুবে যাচ্ছে, সে অলীক, সে বেদান্তের ভ্রান্ত দর্শন
একটু আবেগ না দেখালে চলে? মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করব নাকি?
এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজব বাতাবি লেবুর গাছটি?
মাজা-ভাঙা অচেনা বৃদ্ধাটিকে ডেকে উঠব, প্রভা পিসিমা?
এ সব করলেও চলে নকল হাবভাবে, কেননা
আসল মানুষটি নেই এখানে
এখানে থাকলে সে নিজের কাছে কোনোদিনই মানুষ হত না!

উত্তরকালের জন্য

ঠাকুর্দা আমাকে বসুমতী সংস্করণ উপনিষদ
উপহার দিয়েছিলেন
ভালো করে পড়িনি, কবেই সে বই ভেসে গেছে বন্যায়
বাবা দিয়েছিলেন নেসফিল্ডের গ্রামার
আর টেনিসনের কাব্য
সে সবের পাতা ছিঁড়ে চানাচুরওয়ালারা ঠোঙা বানিয়েছে
চানাচুর বিষয়েই আমি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি বলা যায়
জানি, নুন কেমন করে ধরে রাখে আর্দ্রতা, তেলে কতটুকু
ভেজাল
বিয়েবাড়িতে কেন পাঞ্জাবি পরতে হয়
চাকরির ইন্টারভিউতে কেন কোট টাই...

কৈশোরের দু'গালে থাপ্পড় মেরেছে দুই বিপরীত সভ্যতা
তাই রক্তাভ মুখ নিয়ে আমি গেছি পড়ন্ত বেলার মিছিলে
নগরের আকাশ রেখার অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে
কতবার
পাশের মানুষটির সঙ্গে পা-মেলানো কম শক্ত নয়
পায়ে পায়ে অনেক জটিলতা
অথচ একলা সরে দাঁড়ালেই সবাই ছি ছি করে
দেশপ্রেমের গান গাইতে গাইতে দেখেছি
চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে দেশ
আন্তর্জাতিক হয়ে গলা জড়াজড়ি করতে গেছি যার সঙ্গে
সে তুলে দিয়েছে সীমান্তের কাঁটাতার
তবু যেখানে নদীর পাড় ভাঙছে, সেখানে গিয়ে বসে থেকেছি
চাবুকের মতন ঝলসে উঠেছে বিদ্যুৎ, ফণা তুলেছে জলস্রোত
আবার ভোরের স্বর্ণাভ আলোয় সব শান্ত, মানুষের জন্য
মন কেমন করে
ফেরার পথ খুঁজে পাই না, চেনাশুনো কারুকে দেখিনা
বিংশ শতাব্দীর শেষ বেলায় গোটা পৃথিবীটাই পথভ্রান্ত?
উত্তরকালের জন্য রেখে যাব দু' চার ফোঁটা চোখের জল...

ওসব কথার কথা, কবিতা ছাড়া আর কোথাও
কান্না নেই!

স্নানের পরে

তারপর সে বলল, চলো এবার নদীকে সারা গায়ে মাখি
নদীর সব জায়গায় কুয়াশা, শুধু মাঝখানে
একটি ছোট্ট বৃত্ত দু'জনের জন্য
এই কুয়াশা কি যোজনগন্ধার?
নিজেকে যোগভ্রষ্ট, কামমোহিত সন্ন্যাসী ভাবতে মন্দ লাগে না
সে রমণীও যেন শুধু আমারই জন্য রেখেছে খেয়ার নৌকো
নীল জলে এসো একটু ডুবি, আরও একটু, আরও গভীরে
সে ডুবছে, আমি তুলছি
আমি ডুবছি, সে হয়ে যাচ্ছে মৎসকন্যা
জল-প্রাণীদের মতন পোশাক না-পরা দু'খানি শরীর
ধুয়ে যাচ্ছে মিলন গন্ধ, ধুয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের ময়লা

ভুস করে একবার মাথা তুলে দেখি, সে অন্য মানবী
তার কানের লতির কাছে অজস্র হিরে কুচি, বুকে স্থলপদ্ম
তার চোখের পল্লবে সূক্ষ্ম জলকণার পবিত্রতা
সে চলে যাচ্ছে শিল্পময়তার দিকে, ত্বকে ও বর্ণে
বতিচেল্লির তুলি
দু'জনের মাঝখানে রচিত হচ্ছে সুদূর
আলিঙ্গনের মাঝখানে চলে আসছে বিশ্বপ্রকৃতি
আমাকেও যেন টান মারছে চির সন্ন্যাস

তখন নিজেকেও যেন মনে হয়, শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি
দূর ছাই, এই শুদ্ধতা নিয়ে আমি এখন কী যে করি!
এর চেয়ে দু'জনের পিঠের বিনবিনে ঘাম আর
ভাঁটফুলের ঘ্রাণ মাখা দিন ও রাত্রি
কত ভালো ছিল!

সময় মিলিয়ে গেল

কোথা থেকে কখন কোথায় চলে যাই, মনেও থাকে না
এই জায়গাটার কী নাম? ওঃ হো, এর্নাকুলাম, কেন এখানে এসেছি?
সারাদিন কত হৈ হট্টগোল, ঘোরাঘুরি, পুরোনো গির্জায়
ভাস্কো ডা গামার কবর
সন্ধেবেলা কয়েকজন জোর করে নিয়ে গেল এক নাচের অনুষ্ঠানে
আমি নাচ কী বুঝি? শুধুই বাধ্যতামূলক বসে থাকা
অদূরে অস্থায়ী মঞ্চ, আমরা খোলা আকাশের নীচে, শীত শীত ভাব
একটা পুরনো প্রাসাদ, তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, এখনো নাম জানি না
এক বন্ধু বলল, দূর দূর, এসব দক্ষিণি নাচ কতক্ষণ দেখবে
পাঁচ মিনিটে আধ ইঞ্চি নড়ে না
সত্যিই তাই, জবরজং পোশাক ও মুখোশ, বড় বেশি চড়া রং
নর্তকরা আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে
উসখুস করছি, সিগারেট ধরানো যাচ্ছে না, গলায় সন্ধেবেলার তৃষ্ণা
হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল, কোথায়? আকাশে তো নয়,
বুকের মধ্যে নাকি?
না, না, তা হয় না, ওসব কথার কথা
ঈষৎ ধোঁয়াশার পোঁচ লাগানো তারা ভর্তি তকতকে আকাশ
কেউ যেন আমায় দেখছে, কেউ যেন তরঙ্গ পাঠাচ্ছে আমার দিকে
আমি ভাবছি, নাচ কখন শেষ হবে, আর নাচ ভাবছে,
কখন আমি উঠব
আমি ভাবছি, মুখোশের আড়ালে ঐ মানুষগুলোর সঙ্গে
কথা বলা যায়?
নাচ ভাবছে, আমায় অস্থিরতা আঁকা একটা মুখোশ পরিয়ে দেবে
আমি ভাবছি, ঐ যে পায়ের পাতার মৃদু কম্পন, ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি,
বিলম্বিত লয়, এর কোনো অর্থ আছে?
নাচ ভাবছে, এই মানুষটির বিমানের টিকিট, হোটেলের ঘর
ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখা। এর কি অর্থ আছে কিছু
আমি নাচকে দেখছি, নাচ আমায় দেখছে, এবার দু'জনের
হাত ধরাধরি হল, সময় মিলিয়ে গেল
এক ফুঁয়ে!

কাল রাতের বেলায়

'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে...'
তখন আপনি ছিলেন আমার সঙ্গে
সবগুলি গুনগুন সংগীতের স্রষ্টা
পূজা থেকে বিরহ, প্রকৃতি থেকে আরও দুঃখ ভরা গান
এ দুঃখ আমার নয়, যিনি লিখেছেন, তিনিও কি এত দুঃখী?
কিংবা প্রত্যেক কবির মতন তিনিও বৈপরীত্যের বরপুত্র? সব প্রশ্নের
উত্তর ঘুলিয়ে দেবার সম্রাট?

জীবন চরিতে তাঁকে সত্যিই খোঁজা যায় না
কাল রাতের বেলায় এত গান, সর্বাঙ্গ জড়ানো গান
সেই সব সুরের মীড় ছবির রঙের মতন গড়িয়ে যায়, আয়তনে মেশে
যেন মাতিস্-এর আঁকা গান, ঝর্নায় অনেকক্ষণ ধারাস্নান
চোখ জড়িয়ে আসে
তারপর একঝলক স্বপ্ন দেখি আলখাল্লা পরিহিত তাঁকে
এ মূর্তি প্রভাত মুখুজ্যের গড়া নয়, বইয়ের র‍্যাকের পাশে ঠেস দিয়ে
থুতনিতে আঙুল, বড় ব্যাকুল ও কৌতূহলী, খুবই মহান ও সামান্য
আমার কোনো প্রশ্ন আসে না
কান্নায় আমার গলা বুজে যায়, আমি ফুঁপিয়ে উঠি
একটু পরেই দেখি ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর
বাইরে প্যাঁচার ডাক শিহরিত রাত, থমথমে পৃথিবী
কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ে আমার বিস্ময়
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ আমার কান্না এলো কেন
আমারও কান্না জমে ছিল?
আঃ বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

লিখে যেতে হবে

লিখে যেতে হবে এই কথাগুলি পাথরে খোদাই
শাশ্বত অক্ষরে লেখা থাক
যখন গোধূলি ধোঁয়াশা লিপ্ত, কেউ কেউ ছিঁড়ে খায় ইতিহাস
কেউ কেউ হাত মিলিয়েছে চোর-খুনির সঙ্গে

তখনো নিভৃতে অকলুষ হাতে ওরা লিখে গেছে
ছেঁড়া চটি আর শূন্য পকেট, কিছুই চায়নি
ওরা লিখে গেছে কবিতা শুধুই কবিতা এবং
রাত ভোর করা শব্দ মন্ত্র
ঐ যে মেয়েটি, কী নাম তোমার? কে তোমায় এই
মাথার দিব্যি, দায় দিয়েছিল, যখন বাতাসের ক্রোধ ও হিংসা
আলু-পেঁয়াজের দর ওঠা নামা, সব খবরের কাগজে শুধুই
আস্তাকুঁড়ের ছবি ও গন্ধ
তবু তুমি প্রতি কবিপক্ষেই বার করে যাবে যোগব্রতর
কবিতাপত্র, সে নিজে কবেই মেঘ হয়ে গেছে
তুমি ভালোবেসে প্রেমে ও ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে
কী তীব্র জেদ
লিখে যেতে হবে এই দেশে তুমি, তুমিও রয়েছো!

লিখে যেতে হবে, নতুন শতকে, কিংবা ত্রিংশ শতাব্দী পরে
কে কোথায় আছো, শুনছো তোমরা?
মহাফেজখানা যে দলিল রাখে কাগজে কালিতে ভুল বোঝাবুঝি
খল খল হাসে মুণ্ড শিকারি, বাক্ বিভূতিতে মিথ্যের নানা
প্রলেপের মতো রং ফুলঝুরি
কুম্ভীপাকের নরকে চলেছে সিংহাসনের আজব লড়াই
আগুন জ্বলেছে দাউ দাউ আর দশ দিক জুড়ে
দাও দাও ধ্বনি
তবু কিছু কিছু সদ্য তরুণ এবং তরুণী
কিছুই পায়নি, ওষ্ঠ উল্টে কিচ্ছু চায় না
রাত জাগা চোখে কলম কামড়ে কোন উপাসনা
নিয়ে মেতে আছে
যমদূত আর দেবদূতরাও দু' পাশে দাঁড়িয়ে
ওরা হতবাক, সময় চিহ্নে এদের চেনে না
লিখে যেতে হবে, অনাগত কাল, লিখে রাখা হলো
একবার শুধু দেখে নিও এই
উল্টোপাল্টা সময়ের আবছায়া শিলালিপি!

ওগো নারীবাদী তীব্র লেখনী

ওগো নারীবাদী তীব্র লেখনী
একটিবার কি কোমল আননে
চেয়ে দেখবে না, এই নতজানু
হাত-জোড়-করা পুরুষ পাপীকে?

ওগো নারীবাদী তেজি তর্জনী
একটি বার কি যুদ্ধ থামিয়ে
চেয়ে দেখবে না পুরুষ ছাড়িয়ে
অপৌরুষেয় মেঘসম্ভার?

হে অভিমানিনী, ঘোর অরণ্যে
ঝড়ে নেচে ওঠে যে-সব বৃক্ষ
তারা কি পুরুষ অথবা রমণী?
ভোরের আলোয় কারা খেলা করে?

মাটির দাওয়ায় আছড়ে পিছড়ে
কাঁদছে শিশুটি, বাতাসে ভাসছে
শিমুল তুলোর যাযাবর বীজ
ছিন্ন পাতায় কোন ইতিহাস?

এ সবই আসলে পুরুষের ফাঁদ?
তোমার চক্ষু ফেরাতে চাইছে?
মুখোশের ঠোঁটে শান্তির বাণী
আড়ালে শানিয়ে চলেছে অস্ত্র?

হায়রে যুদ্ধ, কাগজ যুদ্ধ
কোনটা সত্য, কোনটা ছলনা?
তবু ওরা লেখে প্রেম-বন্দনা
তুমি কি শুধুই রণসংগীত?

বৃত্তের মাঝখানে

মৌমাছিটা শুকনো ফুলকে ছুঁল না, সে কাল
ওখানে রভস করেছিল
বেড়ার ধারে সদ্য যৌবনবতী রঙ্গন ও টগরেরা
নাচ শুরু করে দিয়েছে
সেজেছে খুব
গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি খেয়েছে, নেশা করেছে
ভোরের বাতাসে চুমুক দিয়ে
ওরা ডাকছে, বুকের ওড়না খুলে ডাকছে মৌমাছিটাকে
আমি এই রতি-চঞ্চলতা উপভোগ করি, শুনতে পাই
মৌন শীৎকার
বেশিক্ষণ না
একটা গুণ্ডামতন সবল ছাগল দু'পা উঁচিয়ে
বেড়ার ওপর মুখ বাড়ায় রাক্ষসের মতন
প্রেম ও ধ্বংসের শব্দের মধ্যে প্রথমে খুব একটা
তফাত বোঝা যায় না
ধারালো দাঁতে পিষে যাচ্ছে ফুলগুলো, তবু মনে হয় খেলা
ক্রমশ হতে থাকে রং ও সারল্যের বিনাশ
আমি বাধা দিই না, ফুল আমার প্রেমিকা নয়, মৌমাছির
এটা আমার বাগান নয়, ডাকবাংলো
ছাগলটাকে তার খিদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করব কেন
কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটকের পরবর্তী দৃশ্য
লুঙ্গি পরা, বেঁটে লাঠি হাতে একটা লোক
ছুটতে ছুটতে এসে ছাগলটার গলা চেপে ধরল
নিষ্ঠুরভাবে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে
ঐ দিকেই বুঝি কশাইখানা?

এই লৌকিক বৃত্তের মাঝখানে আমি একটা অলৌকিক বিন্দু...

হলুদ পাখি

হলুদ পাখিটি নিম গাছে গিয়ে বসে
নিমের মাথায় দোল খায় তার ছবি...
সত্যিই একটা হলুদ পাখি গোয়ালপাড়ার দিক থেকে উড়ে এসেছিল। একলা।
কেন সে নিমগাছটাই বেছে নিল, সেটা একটা রহস্য না? কদম গাছ ছিল,
ইউক্যালিপটাস, এমনকী পেয়ারাও, কোনোটাই পছন্দ হল না? নিম ফল আমি
খেয়ে দেখেছি, তেতো নয় মোটেই। এখন ফল নেই, ফুল নেই।
ওই নিমগাছে কি হলুদ পাখির কোনো স্মৃতিকথা লেখা আছে?
আকাশে পাতলা মেঘ ছিল, একটুকরো মেঘ সরে গিয়ে ঝলমলিয়ে
উঠল রোদ। সে কি সরে গেল হলুদ পাখির রং আরও উজ্জ্বল করে
তোলার জন্য? কোনোদিন জানা হবে না।
নিমের সবুজ, ইউক্যালিপটাসের সবুজের চেয়ে আলাদা। পাখিরা
রং চেনে? হলুদ পাখি কি জানে, সে হলুদ?
এ পৃথিবী কি জানে, তার নাম পৃথিবী?
পাখিটা স্বয়ং বসে আছে, তবু তাকে ছবি বলে মনে হচ্ছে কেন? সেই
ছবিটা দুলছে।
কদম গাছটির ঈর্ষা হয়েছে? হঠাৎ কেন তার নিস্তব্ধতার মধ্যে
শুরু হল বাতাসের হুড়োহুড়ি?
হলুদ পাখিটি তিনবার ডেকে উঠল। ঠিক তিনবার কেন?
কোনোদিন জানা হবে না।

সাঁকোর মাঝখানে

সাঁকো পেরুলেই ওপারে দুঃখী গ্রাম
এপারে শুধুই শিল্পের আনাগোনা
তুমি কোন দিকে পুরাবে মনস্কাম?
ওপারে ক্ষুধার হাহাকার যায় শোনা।

শিল্পই সার? কবিতা আত্মরতি
দুখী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে না?

রূপের তৃষ্ণা, শব্দে অরূপ জ্যোতি
বাস্তবতার কাছে নেই কিছু দেনা?

ওপারে মানুষ মানবতা থেকে দূরে
সারা দিন শুধু ব্যস্ত বেঁচে থাকায়
পৃথিবী চেনে না, ছোট গণ্ডিতে ঘুরে
অনিয়ন্ত্রিত আয়ু ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

তুমিও দুঃখী, সে দুঃখ সৃষ্টিতে
ওদের ব্যথার হয় না শিল্পরূপ?
তুমি কি পারো না দু'-দিক মিলিয়ে দিতে
তবুও সাঁকোর মাঝখানে কেন চুপ?

স্বপ্নে দেখা ছবির মতো

নদীর ধারে বসে রয়েছে সেই নদীটির বাল্যসখী
একা
বাতাস তার মাথার চুলে বিলি কাটছে
শেষ বিকেলের নরম রোদ
পিঠের ডান পাশে
জলে দুলছে মুখচ্ছবি, অনেকদিন পর দু'জনে
দেখা
ঘাটের সিঁড়ি, কদম গাছ, ফিঙে পাখিটি
ওরাও চেনে, কচুরিপানা
এদিকে ভেসে আসে...

এ-দৃশ্যটি স্বপ্নে দেখা ছবির মতো বাঁধিয়ে রাখাই
ভালো
নীরার মন মেয়ে-বেলার হারানো দিনে
ফিরে গিয়েছে, আমরা কেউ
ওর জগতে নেই
ছিল না মেঘ, আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাল

গোপন কথার মায়া নদী মিলিয়ে যাবে
ভুল করে ওর সামনে গিয়ে
শব্দ করব যেই!

শব্দ নয়, স্পর্শ নয়, বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ
না-পাওয়াগুলি মিলিয়ে দিয়ে ছবিটি হোক আঁকা!

নিউটন ও ভ্যান গঘ

তিনটে দেবদারু গাছ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে
আপেল চিনতেন নিউটন; সিকামোর, সাইপ্রেস দেখেননি?
এই দু' লাইন লিখেই খটকা লাগে। বাংলা কবিতা যুক্তাক্ষর
দিয়ে লাইন শেষ করার তেমন রীতি নেই। তা ছাড়া ক্রিয়াপদ
'যাচ্ছে'র সঙ্গে কীসের মিল? মিল দিতেই বা হবে কেন? একটু
ঘুরিয়ে প্রথম লাইনটা অনায়াসে এভাবে লেখা যেত, 'তিনটে
দেবদারু গাছ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে'। নাঃ, ভাল শোনায়
না, 'উঠে যাচ্ছে'ই এখানে প্রধান।

প্রথম পর্বে, 'তিনটে দেবদারু গাছ' ঠিকই আছে, উচ্চারণ হবে
তিন্টে দেবদারু গাছ, পরিষ্কার আট মাত্রা। কিন্তু দ্বিতীয়
লাইনের 'আপেল চিনতেন নিউটন'? যদি উচ্চারণ এ রকম হয়,
আপেল চিন্তেন নিউটন, তাতেও মাত্রা বেশি হয়ে যায়। হোক
না। বুদ্ধদেব বসু খুবই আপত্তি করতেন, হসন্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে
আমার মত পার্থক্য কোনো দিন মেটেনি।

দেবদারু গাছগুলি যেন সত্যিই দেবতাদের হাতছানি পেয়ে উঠে
যাচ্ছে ওপরে, মাত্রা ছাড়িয়ে, আরও ওপরে, পাহাড়ের শিখর ছাড়িয়ে, মেঘের
সঙ্গে জড়াজড়ি শেষ করে, মাধ্যাকর্ষণকে তুড়ি মেরে!

সেটাই তো কথা। নিউটন আপেল গাছ থেকে আপেল খসে
পড়তে দেখে...। কিছু কিছু মানুষ অন্য মানুষদের ছাড়িয়ে
যায়। কিছু কিছু গাছ আর সব গাছকে ছাড়িয়ে উঁচু হতে হতে,

আরও উঁচু হতে হতে...দেবদারুর সঙ্গে সাইপ্রেসের অনেকটা
মিল, এমনকি সিকামোর বা পপলার, যেমন পাহাড়ের পাশে
উদ্ধত তেজস্বী ঝাউ, ছায়া জয় করে রোদের দিকে যাবেই,
অনবরত মাথা উঁচু করে যাচ্ছে, ভূমি থেকে রসের স্রোত নাচতে
নাচতে উঠে যাচ্ছে ডগা পর্যন্ত, যেন নস্যাৎ করে দিচ্ছে
নিউটনের গণিত, মনে পড়ে আকাশজোড়া রাত্রির বৃক্ষ, ভ্যান
গঘের ছবি দুটি সাইপ্রেস নিউটনের আপেলের পাশে
প্রতিস্পর্ধীর মতন বিস্ময় হয়ে থাকে!

মাটি*

একদিন কেউ কাছে এসে বলেছিল
অকূল সাগর ডেকেছে তোমার নামে
হালভাঙা সেই জাহাজ ফিরিয়ে দেবে
কেন শুয়ে আছো ব্যর্থ মনস্কামে?

যে শুয়ে রয়েছে একদা সে ছিল নাবিক
আকাশের মতো বুক ভরা নীল নেশা
এখন পেয়েছে নরম মাটির ঘ্রাণ
নারীর মতন দুঃখ-রভসে মেশা!

এ মাটি গভীর, আরও তরঙ্গময়
মধ্যজীবন জানে শুধু এর ভাষা
পুরনো শরীরে আবার নতুন রতি
ইচ্ছে করে না আর কোনো যাওয়া-আসা!

*এটাই আমার কমপিউটারে সরাসরি কবিতা লেখার প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা। বোঝাই যাচ্ছে, যুক্তাক্ষরের সংখ্যা কেন এত কম।

পানকৌড়ি ও মাছরাঙা

পুকুরে জোরালো ডুব দিচ্ছে একটা পানকৌড়ি
তিনটে হাঁস আড়ষ্ট হয়ে জল ছেড়ে উঠে গিয়ে
বসে রইল গাছের তলায়
ওরা কি পানকৌড়িকে ভয় পায়?

এই বহমান জীবনের যেকোনো একটু টুকরোই হয়ে
উঠতে পারে কবিতা
দোতলার জানলা দিয়ে আমি দেখছি পানকৌড়িটার
চোরা ডুব-সাঁতার
ওকে নিয়ে একটা কবিতা লেখা যায় না?
কাগজ কলম নিয়ে বসতেই প্রথমে এই লাইনটা ঝলসে উঠল
'যেন একটা উল্‌কা ফুল, ঝুপ শব্দে পড়ল এসে জলে
একটা মাছরাঙা'
আমি কলম থামাই, পানকৌড়িটা মাছরাঙা হয়ে গেল কী করে?
আমি তো মাছরাঙা দেখছি না, তবু কবিতায় সেই পাখিটা
উড়ে এসে জুড়ে বসল
সে কি নানা রঙে সুন্দর বলে?

কিংবা নিছক বাস্তব নিয়ে কবিতা হয় না, শিল্পের
নিজস্ব নিয়মে দৃশ্য বদলে যায়?
অথবা পানকৌড়িটা বঞ্চিত হল তার রঙ কালো, তার রূপ নেই বলে?
আমরা কালো দেশের মানুষ
আমার গায়ের রঙ ঝিরকুট্টি ছাতার মতন
তবু কবিতায় ফিরে ফিরে আসে
চন্দন রঙের মেয়েরা...
বাস্তবে তারা নাচের ছন্দ তুলে মুখ ফিরিয়ে
চলে যায় অন্য দিকে।

কবি

কবিকে দেখলে মনে হয় যেন সন্তর্পণ একটা শালিক
অথচ তার হৃদয়টা শাঁ শাঁ উড্ডীন বাজপাখির মতন
কী মুস্কিল!

কবিকে হঠাৎ তুলে ফেলে দেওয়া হোক অগাধ সমুদ্রে
সে কিন্তু তখনও চিত হয়ে ভাসবে ছেলেবেলার ছোট্ট নদীতে
সাঁতার কাটবে স্বপ্নে!

কবিকে খাতির করে নিয়ে যাও না পাঁচতারা হোটেলে
গেলাসটা ধরেছে দেখো, যেন চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ের চায়ে
নিজেই হাসছে মনে মনে।

কবি হাঁটছে মিছিলে, অথচ সে কী দারুণ একাচোরা।
বিয়ে বাড়িতে সবার সঙ্গে গল্প করছে হেসে হেসে, আসলে সে
কিছুই বলছে না।

অন্ধকারের মধ্যে একটা একরত্তি স্ফুলিঙ্গ তাকে শাসন করে
বাঁ দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে ডান দিকে, ঠিক যেন লক্ষ্মীট্যারা
বেশি দেখে দেয়াল!

রাস্তাটা তার আয়না, সেই জন্যই, সে নিজেকে দেখতে পায় না
আঙুল ডুবিয়ে রাখে জলে, সে জল কিন্তু অসমতল
তেষ্টায় বুক ফাটে।

বাসের জানলার নারীকে সে বসিয়ে দেয় নির্জন ঝর্নার ধারে
মুহুর্মুহু ভাঙছে গড়ছে স্বর্গ, যেন পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
নরকও বেশ চেনে।

গলির মধ্যে পাহাড় চুড়ো, তাকে ঘিরে রেখেছে গোলোকধাঁধা
সেইখানে তার বাড়ি, সর্বক্ষণ গোলমালে কান ঝালাপালা
তার মধ্যে সে অদৃশ্য!

কবি যে কতবার হোঁচট খায় তার গোনা গাঁথা নেই
ভুলে ভর্তি জীবন, সে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ
দেবতারাও তাকে ভয় পায়।

তার চুপ করে থাকার মধ্যে দারুণ ব্যস্ততা, যখন মনে হয়
তন্ময় হয়ে সে লিখছে, আসলে সে তখন ঘুমোচ্ছে
ওকে ক্ষমা করে দাও!

বই

খিদের সময় কচমচ করে আস্ত একটা রান্নার বই খেলেই তো হয়
বই যদি লাগে শুকনো শুকনো একটু একটু জল ঢেলে নিয়ে বেশ খাওয়া যায়
কচি-কাঁচাদের জব্দ করবে, মাথায় চাপাও খান দু'তিন থান ইট বই
বন্যার দিনে কাজে লেগে যাবে, বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে কাগজের নৌকো ভাসাও
সেই নৌকোয় দিগন্ত পার, এ দুনিয়া ছেড়ে অন্য দুনিয়া
বাঘ সিংঘিরা বই কী জানে না তাই তো তাদের সংখ্যাটা আজ দোদুল্যমান
অনেক মানুষও বই ভয় পায়, বইরা তাদের দিকে চেয়ে হাসে দন্ত কপাটি
বই দিয়ে খুব ভালো হয় জেনো, ভাঙা টেবিলের পায়ার ঠেকনো
তেমন তেমন বই খুললেই আঃ কী আরাম, চোখ বুজে আসে, ঘুমের ওষুধ
বই খোলা রেখে মুখটা লুকিয়ে কেঁদে নেওয়া যায় কী জানি কীসের দুঃখে না সুখে
বইয়ের সঙ্গে এক বিছানায় ভালবাসাবাসি গোপন তো নয়, দেখুক না লোকে
শুনেছি স্বর্গে লাইব্রেরি নেই, বইটই নেই, দান্তেও কিছু লেখেননি, সব
দেব-দেবীরাই নিরেট মূর্খ
তাই তো স্বর্গে যাবার ইচ্ছে কখনও হয় না, জ্ঞানপাপীরাই হুড়োহুড়ি করে
বইতে থাকুক শক্ত মলাট, কখনও সখনও ছুড়তে তো হবে টিভির বাক্সে
সবাই বলছে, আসছে শতকে যুদ্ধ লাগবে, বই হারবেই, বই বলে আর কিছু
থাকবে না
হারে তো হারুক, মৃত বইগুলি ভূত তো হবেই, যখন তখন কম্পুটারের দেবে গলা
টিপে!

সহজ কথার গান

বাঁচার জন্য বাঁচতে হবে, এমন একটা সহজ কথার গান হয় না
কেমন সহজ, যেমন আগুন, ভূমিকম্প, তুষার ঝড় পেরিয়ে
আসে একলা শিশু
যেমন বন্যা উথাল পাথাল, তার মধ্যেও জেদ ছাড়ে না, মাটি
ছাড়ে না ছোট্ট একটা নয়নতারা
আকাশমণি বনের ঝাড়ে আগুন লাগল, ও জোনাকি,
ওদের বল না বেঁচে থাকতে
আগুনকেও তো বাঁচতে হবে, আমি আগুন খেতেও পারি
উদর জুড়ে আগুন আমার, এতকাল তো সেই আগুনই
বাঁচিয়ে রাখলো
ক্লেদে ডুবছি, দু'হাত তুলে বলি, আমায় বাঁচাও আগুন,
এসো আগুন এ সংসারে
কথায় কথায় জ্বলে আগুন, আলেয়া নয়, চুলোর আগুন,
ছাই উড়ছে
এর মধ্যেই ভালোবাসার দু'চার বিন্দু, খরার মাঠে
যেমন বৃষ্টি
বাঁচাই যদি না যায় তবে সব সৃষ্টিই অনাসৃষ্টি, ওগো তোমরা
লোকাল ট্রেনে, আঁতুর ঘরে, কয়েদখানায়, কেরোসিনের
লম্বা লাইনে
বাঁচো এবং বাঁচার জন্য আঙুল তোলো, আমি একটা
গান লিখছি
বাঁচার মতন বাঁচতে হবে, স্বর্গে কিংবা নরকে নয়,
এই মাটিতে, এই মাটিতে...

এসো, আমরা

এসো, আমরা এখন সেই ভাষায় কথা বলি, যা
কেউ বুঝবে না
তুমিও না, আমিও না!
এসো আমরা স্বপ্ন বদলাবদলি শুরু করি

যেমন স্বপ্ন আমি আজও দেখিনি
তুমিও না।

এসো আমরা বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে দিই
অভূতপূর্ব সব ফুলের চারা
যদিও আমাদের নিজস্ব কোনো বাগান নেই

কারা যেন দুন্দুভি বাজিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে
একটি নদী শুকিয়ে গেল এই মাত্র
সীমান্তে নতুন করে বেড়া দেওয়া হচ্ছে
হাসছে প্রহরীরা
এ একটা খাঁচার মধ্যে, ও একটা খাঁচার মধ্যে
বন্দিরাও হাততালি দেয়
কারা যেন দুন্দুভি বাজিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে

এসো আমরা পৃথিবী জুড়ে এমন একটা ধ্বংসের উৎসব
শুরু করি
সে-রকম ধ্বংস পৃথিবীও কখনো দেখেনি।

পরমার্থের ছবি

পা মাড়িয়ে কেউ চলে গেল আগে আগে
ফিরে তাকাবে না, পিঠে লেগে আছে চোখ
রাস্তা ছুটছে, গাড়ির ভেতরে গাড়ি
স্বপ্ন দেখে না নব্বই ভাগ লোক!

যেমন স্বপ্ন ধুলো থেকে উঠে আসে
পরমাণুতেও বিশ্ব ঘূর্ণ্যমান
মায়া সংসার নদীর সঙ্গে দোলে
ও কার বাছা রে, কেঁদে হলো খানখান?

কোথাও একটা নিশানা রয়েছে পোঁতা
প্রেমিক ও খুনি পিঠোপিঠি দুটি ভাই

কেউ ঘর ভাঙে, কেউ গাছে দেয় জল
সহসা বাতাসে রব ওঠে যাই যাই!

বিকেলের ঘুম ভেঙে গেলে ভ্রম হয়
এটা কোন দেশ, এই শরীরটা কার?
মেঘলা আকাশে পরমার্থের ছবি
ঝলসে উঠেও মুছে যায় বারবার!

দ্বীপ

দ্বীপটি জঙ্গলে ভরা, সরু পথ, শুকনো পাতায় দুটি মানুষের পা
কিছু কথোপকথন, কিছু নিস্তব্ধতা, পাখ পাখালির সমস্বরে কিছুটা ব্যঞ্জনা
দৃশ্যটি বাস্তব থেকে মাঝে মাঝে অলীকের দিকে যেতে চায়
যেমন, নারীটি নেই, পুরুষটি ঝুঁকে পড়ে মাটিতে কী খোঁজে
পুরুষও মিলিয়ে যায়, নারীটি তখন যেন ফুল থেকে ঝরে পড়া শিশিরের মতো
আঁচলে কাঁটার টান, ফিরে দেখে পুরুষটি অবিকল গাছ হয়ে আছে
অন্যান্য গাছেরা আজ বৃষ্টিধন্য, স্নান সেরে তরল রোদ্দুর খাচ্ছে গেলাসে গেলাসে
এখানে ফুলের কোনো নাম নেই, রমণীটি বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে রেণু
পুরুষ-ওষ্ঠের ধোঁয়া পতঙ্গেরা ভুরু কুঁচকে পছন্দ করে না
এখানে কী জন্য আজ এসেছে এই দু'জন, ভ্রমণে না কুটির বাঁধার সাধ নিয়ে?
বস্তুত এ দ্বীপ কার? দুনিয়ার কোনো দ্বীপ অ-মালিক, শূন্য পড়ে আছে;
দূরে কাছে সমুদ্রের শব্দ নেই, নদী আছে, ক্ষীণতনু, স্বচ্ছ জলে ছায়া দেখা যায়
একটি, না দুটি দ্বীপ? পুরুষটি হাত রাখে হাস্যমুখী সঙ্গিনীর কাঁধে
নারীটি ঘুরে দাঁড়াল, শরীর দেখাল খুলে, চক্ষুদুটি জলে ভরা, স্তব্ধতা বাঙ্ময়
সহসা অদৃশ্য হল দু'জনেই। অথবা শরীর নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে
নারীটি কাতর স্বরে বলে উঠল, খেয়া নৌকো নেই, কিন্তু সেতুও থাকবে না!
ফেরার ব্যস্ততা নয়, এ এক জীবনব্যাপী ব্যাকুলতা, বারবার সেতু গড়তে হয়।

ওজন-পাল্লা

আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক নারী
ওজন-পাল্লায় তারা দু'জনেই, কিছুতেই সমতা আসে না
বাটখারা ক্ষয়াটে, কিংবা একদিকের দড়ি কিছু বেঁটে?
আমি মাঝে-মাঝে দেখি, যে-পাহাড়ে উঠেছি দু'জনে
একসঙ্গে, সে-পাহাড়ে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টির কুয়াশা
বন্ধুটির দেওয়া বেল্ট আমার কোমরে আঁট হয়
কলমটা ফেলে গেছে, তার কালি ফুরোবার বড়ই ব্যস্ততা
মদের গেলাস ছুঁয়ে একা রাত্রে বলি, হারামজাদা
চলন্ত ট্রেনের দরজা, সেই ঝাঁপ-মারা, মনে নেই?

আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক নারী
অথবা সে-নারীকেই নিয়ে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি?
ওজন-পাল্লাটা তুলি, খালি দোলে, দুলতে থাকে, দোলে
দুঃখ নাকি রাগ? কিংবা ব্যর্থতা না বঞ্চনার বোধ?
সে-নারীর স্তনবৃন্তে আমার জিভের আঠা মুছে গেছে বুঝি?
দিগন্ত-আচ্ছন্ন-করা উরু, তার মধ্যে ভাটফুল
আঙুল নাকের কাছে আনি, গন্ধ পাই, মৃদু কান্না শোনা যায়
আমি কি বিরহী, নাকি হেরে-যাওয়া নিঃসঙ্গ জুয়াড়ি?
বন্ধু না নারীটি, কে যে কাকে নিল, হাত ধরে দূরে চলে গেল
দুঃখের ভেতরে রাগ, বঞ্চনা-বোধের মধ্যে পরিত্রাণ, সব জড়াজড়ি
এখনও আমার ঠোঁটে লেগে আছে নারীটির চুম্বনের থুতু
বন্ধুর মাথার মধ্যে ঢুকে আছে আমাদের শব্দার্থের মোহ
পাহাড়ে বৃষ্টির শব্দ, গভীর জঙ্গলে পথ-হারাবার খেলা
ওজন-পাল্লাটি তবু উঁচু-নিচু, দুলতে থাকে, দোলে!

বারবার প্রথম দেখা

নীরার হাত-চিঠি এল পড়ন্ত বিকেলবেলায়
আমি তখন হিজিবিজি জট-পাকানো সুতোর মধ্যে আছি
তার মধ্যে একটি সদ্যস্নাত জুঁইফুল
ডুবন্ত মানুষ যেমন নিশ্বাসের জন্য আকুপাকু করে ওঠে

আমিও সূর্যকে বললুম, আজ একটু দেরি করো
নীরা আমায় ডেকেছে, দিগন্তরেখা, আবছা হয়ে যেও না
জানলায় এত ঝনঝন শব্দ কীসের, ছিটকিনি, শান্ত হও
বইয়ের খোলা পৃষ্ঠা, প্রতীক্ষায় থাকো
আঙুলে কালির দাগ, লক্ষ্মীটি, অদৃশ্য হও
জুঁইফুলটি চেয়ে আছে, সদ্য-জন্মানো ঝর্নার মতন হাসছে
একটি ঝর্নার পাশেই বারবার নীরাকে আমার প্রথম দেখা
মেঘভাঙা দ্যুতি এসে পড়েছে তার চিবুকের রেখায়
নতুন বসন্ত-বৃক্ষের পাতার মতন তার চোখের আলো
তার বুকে দুলে দুলে উঠছে কৈশোরের সমুদ্র-স্নান
নীরার ডাক এসেছে, মেঘ, নিরুদ্দেশে যাও
দরজায় আর কে এসে দাঁড়াল, আমি কোথাও নেই
শব্দ, তুমি থামো, বাক্, তুমি নিশ্চুপ হও
সমস্ত সুতোর পাক লণ্ডভণ্ড করে আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে...

বন্ধুবান্ধব

চলো দীপক, আর একবার ধলভূমগড়ে যাই
বালিশ দিয়ে চোখ চাপা, শক্তি বলল
ভাস্করটাকে নেবে না?
শংকর, শংকর, তুই এবার অন্তত চল, কোনোদিন যাসনি
দু'হাত নেড়ে শংকর বলল, ট্রেন আমার সহ্য হয় না
শক্তি ওকে লাথি কষিয়ে বলল, দে শালা সিগারেট
সন্দীপন মিচকি হাসছে, ও নিজে যা করতে পারে না
শক্তিকে তা করতে দেখলে দুশো মজা পায়
শরৎ চাপড়ে দিল তারাপদ'র কাঁধ, বাদাম ওড়াচ্ছে সমরেন্দ্র
পলিমাটির মতন সরল মুখ করে শ্যামল বলল,
তোরা আমায় নিবি না?
সবাই জানে, নিতে চাইলেও শ্যামল যাবে না, এক্ষুনি
শেষ ট্রেনে পাড়ি দেবে চম্পাহাটি
দীপেন সরু চোখ করে বলল, তোরা সব হারামজাদাগুলো

পেটি বুর্জোয়া রয়ে গেলি, ক্লাস স্ট্রাগল
কিছুই বুঝলি না
দীপেনের থুতনি ধরে চুমু খেয়ে বিমল বলল, মাস্তু, মাস্তু,
আমি ভাই আমার বউকে নিয়ে যেতে পারি?
সবাই সমস্বরে বলে উঠল, না, না, না...

আমি সমীর রায়চৌধুরীকে বললাম, আর কেউ না যাক
তুই আর আমি যাচ্ছিই
পাশ থেকে ভুস করে মাথা তুলে শক্তি বলল, আমাকে
বাদ দেবে, অ্যাঁ
সব ভুষ্টিনাশ করে দেব
ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলো তো, ধলভূম জায়গাটা ঠিক কোথায়?
ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে শক্তি বলল, সবাই জানে,
মেঘালয়ের একেবারে বুকের মধ্যে
সেখান থেকে ধলভূম পালিয়ে গেল মা উত্তর কাশীতে?
বিশাখাপত্তনেও একদিন ধলভূমগড়কে দেখেছি
কে যেন বলল, ধলভূমগড়ের নাম বদলে এখন
হয়ে গেছে চাঁইবাসা
তারপর আবার এফিডেভিট করে হয়েছে দিকশূন্যপুর
বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে একলা একলা গান গাইছে দীপক
দীপেন আর বিমল বেশ অনায়াসে কাঁধ ধরাধরি করে
হাঁটছে কুয়াশার মধ্যে
যেখানে জঙ্গল ছিল, সেখানে পাথর ফাটছে, নদীর ধারে
শক্তি বসে আছে জলে পা ডুবিয়ে
চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল, হঠাৎ নদীটা উত্তাল হয়ে
ছাপিয়ে যেতে লাগল দু'তীর
আঃ এত অন্ধকার কেন? এটা কি ব্রহ্মপুত্র নাকি?
দাঁড়া, শংকর, আমি উঠে এসে আলো জ্বালছি।

লেখা, লেখা, লেখা

বইগুলো ভয় দেখাচ্ছে
সেই সাড়ে চার বছর বয়সে অক্ষর পরিচয়
তারপর, ওঃ, কতগুলো যুগ ও কল্পান্ত কেটে গেল যেন
শুধু ছাপার অক্ষর, চোখের সামনে হাজার হাজার পৃষ্ঠা
পড়েছি যত, লিখেছি কি তার চেয়ে বেশি?
কত যে সাদা পৃষ্ঠা কালিমালিপ্ত করেছি তার ইয়ত্তা নেই
তারা বাঁধানো বই হয়ে ফিরে এসেছে, স্বাতীকে বানাতে হয়েছে
দ্বিতীয় আলমারি
খেলাচ্ছলে লিখেছি, কালপুরুষকে টুসকি মেরে লিখেছি
বেঁচে থাকার জন্য লিখেছি, সামান্য টাকার জন্য লিখেছি
দু'-তিনজন আপন মানুষকে আমার স্বপ্ন ও বেদনা
মনে রাখবার জন্যে লিখেছি
মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে এসে ভূতগ্রস্তের মতন লিখেছি
কত মানুষ যখন দুলেছে, ভেসেছে, হেসেছে, মেতেছে
আমি লেখার টেবিলে আয়ু নিঙড়ে দিয়েছি
সিগারেট টেনে টেনে ফুসফুস ঝাঁঝরা, ঘাড়ে গোঁয়ার
ধরনের ব্যথা
মাঝপথে ছুটে গেছি অভিধানের দিকে, নারীকে দেখিনি,
আকাশ দেখিনি
তাতে কোনো পাপ হয়েছে কি? এতগুলো বছর ব্যর্থ গেল?
কেন নিজের লেখা বইগুলির দিকে তাকাতে ভয় করে?
কেন নিজের নাম শুনলে মনে হয়, অন্য মানুষ, অন্য মানুষ
চতুর্দিকে নশ্বরতার এমন হিমেল ঘুমঘুম গন্ধ।

ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া

ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া, আবার পেছন ফিরে দেখা...

এ ভাঙনে ধ্বংস নেই, চক্ষে লাগে ধাঁধা
একদা কারো ছেলে ছিলাম, এখন নিজেই বাবা
বাবার মুখ ঝাপসা, যেন চকখড়িতে আঁকা...

লক্ষ চিঠি লেখার নারী দূর বিদেশে পাড়ি
এখন চিঠি গাছের পাতায়, এখন চিঠি ঘাসে
ফিরে তাকাই, ভাঙা দেউলে ফুল ফুটেছে কত
ছিল যেখানে গন্ধরাজ, এখন নয়নতারা...

দেয়ালে গ্রুপ ফটোর মধ্যে ভীত মুখটি কার
দেয়ালগুলি শূন্য সব উড়ে গিয়েছে ঝড়ে...

মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না, লিখি মাতৃস্মৃতি
খেলার সঙ্গী বদলে যায়, বদলে যায় খেলা
আমি কোথায় ছুটছি, আমার পায়ে ফুটেছে কাঁটা...

ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া আবার পেছন ফিরে দেখা...

কে দেয় পরমায়ু বিসর্জন?

বাতাসে দোল ওঠে। বাতাস নয়
বইয়ের পাতা খোলা, সারা জীবন
কাগজ মুড়ে শোওয়া, কাগজ ঘুম
শব্দ অক্ষরে খিদে মেটায়

দেয়ালে প্রজাপতি, এল কখন?
দেখিনি কতদিন নারীর রূপ
শুধুই রূপ নয়, অভিমানের
ভেতরে বিদ্যুৎ, ছন্দ মিল!

রক্ত গোধূলিতে নদীর তীর
ওপারে ঝাউবন দৃশ্য নয়
শব্দ ভেঙে ভেঙে খেলার ছল
যদি বা নদী আছে, আকাশ নেই।

খেলারও শেষ নেই, সারা জীবন
আঙুলে আগুনের তীব্র আঁচ
বুকের কাছে নেই অন্য মুখ
অথচ উপমায় এক ঝলক!

কবিরা উদাসীন, যা ভুলো মন
সত্যি তাই বুঝি, তবে এখন
সাতটি মাত্রায় প্রখর কান
কে দেয় পরমায়ু বিসর্জন?

দুটি নাম

নাথুলা পাস পার হবার সময়
সাকলিন মুস্তাক কী বলেছিল তার বন্ধুকে?
প্রীতম সিং-এর পায়ে তুষার ক্ষত, সে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে
সাকলিনকে যেতে হবে, যেতেই হবে, সামনের চেক পোস্টে তার দায়িত্ব
সাকলিনও কি থেমে যাবে বন্ধুর জন্য, কেঁদে কেঁদে পাহাড় ফাটাবে?
মুমূর্ষু প্রীতম কি বন্ধুর গলা জড়িয়ে বলবে, ওরে আমায় বাঁচা, ফেলে যাসনি!
তবু যদি সাকলিনকে চলে যেতে হয়, সেটা কি অন্যায়?

আমরা জানি না কী ঘটেছিল সেখানে সেই সংকটে
জানুয়ারির নাথুলা পাসে রক্তারক্তি ঝড় বয়েছিল
ধরা যাক উল্টোদিকে, সাকলিন মুস্তাকই তুষার ঝড়ে কাতর,
এগিয়ে যাচ্ছে প্রীতম
প্রীতম সিং-এর বুকে অনেক অক্সিজেন এবং কর্তব্যের জেদ
অন্তরীক্ষ থেকে নেমে আসছে সব রকম প্রতিরোধ
প্রীতম কি বন্ধুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে মুখ ফিরিয়ে?
আমরা ঠিক জানি না

কে কাকে টানছে, কে দুর্জয় সাহস নিয়ে অবহেলা করছে প্রকৃতিকে
কে থাকবে, কে যাবে, কে বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি মূল্য দেবে
তার ডিউটির নিষ্ঠাকে
সেটা বড় কথা নয়, ধরা যাক ঝড় তখন প্রলয়ের মতন
ওগো পাঠক, তুমি তার থেকে অনেক দূরে, রয়েছো
নিজের ঘরের নিশ্চিন্ত আরামে।
ওগো পাঠক, তুমি মন ঠিক করো, সাকলিন আর প্রীতম
এই দুটো নাম নিয়ে তুমি আগেই আলাদা মতামত
তৈরি করে নেবে কি না!

বন্ধুস্মৃতি

এক ফোঁটাও জল নেই, তবু নদী
এক ঝাঁক ভ্যাবাচ্যাকা ফড়িং শুনতে পাচ্ছে তরঙ্গের ধ্বনি
ব্রিজের ওপর দিয়ে ঝমঝমিয়ে যাচ্ছে ট্রেন, জানলায়
কৌতূহলী কিশোর নদী দেখছে
লাল রঙের বাঁধানো ঘাটে পা ধুচ্ছে চাষি বউ
ভিজে গেছে তার ছলনাময়ী সায়া
জল নেই, কিন্তু খেয়া নৌকো ভাসছে, বিড়ি টানছে মাঝি
আসুক না নিশুতি রাত, আরও গাঢ় হোক অন্ধকার
ঐ নদীতে দোল খাবে চাঁদ
কলকলানি গল্পে মেতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে
সাঁওতাল রমণীরা
এপার থেকে কেউ হাঁক দিচ্ছে ভাটিয়াল টানে
অনেক গভীর থেকে উঠে আসছে শতদল...

এক ফোঁটাও জল নেই, তবু নদী
শুয়ে আছে আমার বন্ধু, শরীরে প্রাণ নেই
তবু তার নাম দীপেন
সে ভেসে যাবে ঐ নদীতে, ভেসে চলে যাচ্ছে...

একটি গ্রাম্য দৃশ্য

মাটির দাওয়ায় খুদে মাস্টার ক্লাস সিক্সের গুটুলি
হাতে বেত নেই, তর্জনি তোলা, নাকের ডগায় চশমা
খেলনা চশমা, চশমা ছাড়া কি মাস্টার সাজা মানায়?
মেঘ ভাঙা চাঁদ, পোষা বেড়ালটা এই দৃশ্যটা দেখছে।

ছাত্রী মাত্র একটিই, তার মন নেই পড়াশুনোয়
ছটফটে ভাব, পালাবার তাল, বড় চঞ্চল চাহনি
চুল বাঁধা নেই, শাড়ির আঁচল ঘাম মুছে মুছে ময়লা
কাতর গলায় জানাল, 'গুটুলি, এবার আমায় ছেড়ে দে?'

গুটুলি চক্ষু পাকিয়ে বলল, 'হাতের লেখাটা দেখাও
যা পড়া দিয়েছি শেষ না করলে কোথ্থাও যেতে পাবে না
ভারি ফাঁকিবাজ, এখনো নিজের নামের বানান শেখোনি
দীর্ঘ ঈ-কার লিখতে দু'বার চকখড়িখানা ভাঙলে!'

'মেঘ ডাকছে রে, ভিজে যাবে সব, খোলা আছে বুঝি জানলা!'
'এখনো বৃষ্টি আসেনি আগেই ওঠার জন্য ব্যস্ত?'
'রান্না-বান্না কিচ্ছু হয়নি, রাত্তিরে তোরা খাবি কী?'
'সে সব জানি না, পড়ার সময় শুনব না কোনো বায়না।'

কড়া মাস্টার গুটুলি কিছুতে ছাত্রীকে ছুটি দেবে না
মাতৃভাষাটা মাকে শেখাবেই ক্লাস সিক্সের ছেলেটা!

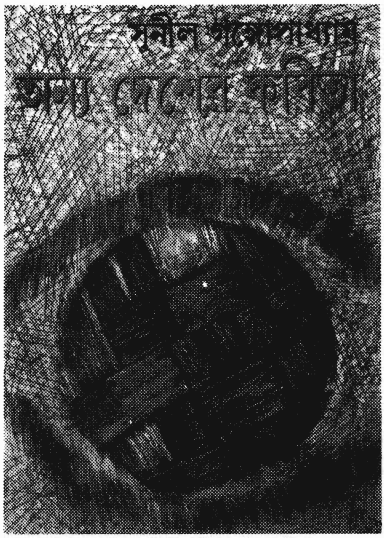

অন্য দেশের কবিতা

সূচিপত্র

অন্য দেশের কবিতা: বিংশ শতাব্দী ১২১ **ফরাসি** ফরাসি কবিতা: সুররিয়ালিজমের উন্মেষ ১২৭ গিয়ম আপোলিনেয়ার ১৩১ আন্টোনিন আর্তো ১৩৩ পল ভালেরি ১৩৫ পল ক্লোদেল ১৩৭ সাঁ-ঝঁ প্যার্স ১৩৯ ব্লেইজ স্যাঁদরার ১৪২ পিয়ের রেভার্দি ১৪৫ জাঁ কক্‌তো ১৪৭ পল এলুয়ার ১৪৯ লুই আরাগঁ ১৫২ আঁরি মিশো ১৫৪ ফ্রাঁসিস পঁঝ ১৫৭ জাক প্রেভের ১৫৯ রেনে শার ১৬২ রেনে গি কাদু ১৬৪ ইভ বন্‌ফোয়া ১৬৬ পিলিপ জাকোতে ১৬৯ দু'জন নিগ্রো কবি: এমে সেজার এবং লেওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর ১৭১ **ইতালীয়** ইতালির কবিতা: গোধূলি ও ভবিষ্যৎ ১৭৪ গুইদো গৎসানো ১৭৫ দিনো কামপানা ১৭৬ উমবার্তো সাবা ১৭৮ জুসেপ্পে উনগারেত্তি ১৮০ উজিনো মনতালে ১৮৩ সালভাতোর কোয়াসিমোদো ১৮৫ পিয়ের পাওলো পাসোলিনি ১৮৭ মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চি ১৯০ **জার্মান** জার্মান কবিতা: দৃষ্টি বদল ১৯৩ স্টেফান গেয়র্গ ১৯৪ হুগো ফন হফমান্সথাল ১৯৭ রাইনের মারিয়া রিল্‌কে ১৯৯ রুডলফ আলেকসান্ডার শ্রয়েডর ২০২ গটফ্রিড বেন ২০৪ গেয়র্গ ট্রাকল ২০৭ বের্টল্ট ব্রেহ্‌ট ২০৯ ইনগেবর্গ বাখমান ২১২ আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো ২১৪ **স্প্যানিশ** স্প্যানিশ কবিতা: রূপের অনুসন্ধান ২১৭ মিগুয়েল দে উনামুনো ২১৮ আনতোনিও মাচাদো ২২০ হুয়ান র‍্যামোন হিমেনেথ ২২৩ লেয়ন ফেলিপ ২২৫ সেজার ভায়েহো ২২৭ ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা ২২৯ রাফায়েল আলবের্তি ২৩৩ পাবলো নেরুদা ২৩৫ নিকোলাস গিয়েন ২৩৮ অকতাভিও পাজ ২৪১ মিলারেস ও দে লা সিলভা ২৪৩ সলোমন দে লা সিলভা

২৪৫ রুশ রুশ কবিতা: প্রতীক্ষিত ক্রান্তিকাল ২৪৬ আলেকসান্দর ব্লক ২৪৮ আনা অখমাতোফা ২৪৯ বরিস পাস্তেরনাক ২৫১ ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি ২৫৪ সার্গেই এসেনিন ২৫৬ এফগেনি এফতুশেংকো ২৫৯ আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি ২৬১

অন্য দেশের কবিতা: বিংশ শতাব্দী

প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই বইতে যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতার রস খুঁজতে যাবেন, তাঁদের নিরাশ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশি। এ বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা। অনুবাদ কবিতা একটা আলাদা জাত, ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক। অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে নানা ব্যক্তির নানা মত আছে, আমি এতগুলি কবিতার অনুবাদক, তবু আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, অনুবাদ কবিতার পক্ষে কিছুতেই বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া সম্ভব নয়, কখনও হয়নি। কোলরিজ বলেছিলেন, একটি কবিতার সেইটুকুই বিশুদ্ধ কবিতা, যার অনুবাদ সম্ভব নয়।— সেই বিশুদ্ধ ব্যাপারটি কী তা বুঝতে হলে, আর একটি বিশুদ্ধ কবিতা পড়ে দেখতে হবে, আজ পর্যন্ত কোনও সমালোচক তার বর্ণনা করতে পারেননি। কবিতার সংজ্ঞা, ব্রহ্মেরই মতন, অনুচ্ছিষ্ট। সংজ্ঞা না হোক, এই সরল সত্যটি সর্ববিদিত যে, কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার শব্দ ব্যবহার, বিংশ শতাব্দীর কবিতা সংগীতের প্রভাব কাটিয়ে শব্দের গভীর অর্থের প্রতিই বেশি মনোযোগী, এবং এক ভাষার শব্দ-চরিত্র অপর ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব।

আর একটি স্বীকারোক্তি এই যে, আমি পাঁচটি প্রধান ইয়োরোপীয় ভাষার কবিতা এখানে উপস্থিত করেছি, কিন্তু এই ভাষাগুলির কোনওটিই আমি সম্যক অবগত নই। ইংরেজিতে নানান দ্বি-ভাষা সংস্করণ পাওয়া যায়, আমার প্রধান অবলম্বন সেইসব গ্রন্থাবলী, যেখানে তাও পাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে শুধু ইংরেজির মাধ্যম থেকেই আহরণ করেছি, মূল ভাষা না জেনে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা, গুরুতর ধৃষ্টতা বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এজন্য আমি নিজেকে তেমন অপরাধী হিসেবে মনে করি না, তার প্রথম ছোট কারণ, শব্দের সৌকুমার্য যখন ভাষান্তরিত করা অসম্ভব, তখন মূল ভাষা জানার প্রশ্ন জরুরি নয়; দ্বিতীয়ত, আমার আগে এই ধরনের অনুবাদের কাজ বাংলাদেশে করেছেন আরও অন্তত পঞ্চাশজন কবি, যাঁদের শিরোভাগে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশে যাঁরা বিদেশি ভাষায় পণ্ডিত তাঁরা হয় কবিতার অনুবাদ করতে চান না, অথবা কবিতা অনুবাদ করার যোগ্যতা নেই তাঁদের। কিন্তু বিদেশের কবিতার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের এইজন্যই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বুঝতে সুবিধে হবে এবং অহেতুক হীনমন্যতা বা অহংকার কেটে যাবে। সুতরাং, কবিরাই যতদূর সম্ভব প্রস্তুত হয়ে এ-কাজ করছেন। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, কবিতা পড়ে বোঝার মতন

বিদেশিভাষার জ্ঞান খুব কম লোকের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব, অনুবাদ করা তো দূরের কথা। যে-ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমরা আবাল্য পরিচিত, সেই ইংরেজি কবিতারও সম্পূর্ণ রস আমরা পাই কিনা, সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ এখনও আমার রয়ে গেছে। সমালোচকের সমর্থন না পেয়ে, কোনও নবীন ইংরেজ কবিকে আমরা এখানে প্রশংসা করতে সাহস পাই না। অন্যদিকে বহু বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবিকেও কোনও অজ্ঞাত কারণে গোপনে খারাপ লাগে। অন্যভাষার কবিতার মূল কবিত্ব থেকে পাঠককে বঞ্চিত থাকতেই হয়, যেটুকু পাই, তা হল কবিতার ভিতরের গল্পটুকু, অর্থাৎ বর্ণিত বিষয়ের প্রতি কবির মনোভাব, তাঁর চিন্তার ভঙ্গি, বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, নতুন ধরনের কলাকৌশল, সভ্যতা বা ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে তাঁর দর্শন। এইগুলি জানার জন্য, তিন বছর বা পাঁচ বছর শেখা জার্মান ভাষায় জার্মান কবিতা পড়ে যেটুকু উপকৃত হওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি উপকৃত হওয়া সম্ভব পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে শেখা ইংরেজি ভাষায় জার্মান কবিতা পড়ে। তারচেয়েও বেশি সুবিধাজনক, মাতৃভাষায় জার্মান কবিতার অনুবাদ পড়া। সুতরাং বিশুদ্ধ কবিতা আস্বাদনের তৃষ্ণা বিশুদ্ধ বাংলা কবিতাতেই নিবদ্ধ রেখে, কিংবা আপাতত ভুলে গিয়ে, উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেই শুধু যাঁরা কৌতূহলী হবেন, তাঁদের কাছে এই অনূদিত কবিতাবলী অকিঞ্চিৎকর হয়তো মনে হবে না।

কবিতার অনুবাদ গুণ সম্পর্কে আমি ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়েও কেন এতগুলি কবিতার অনুবাদ করেছি—সে কারণও আমি জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকার জন্য বিদেশি কবিতার অনুবাদ করতে আমায় অনুরোধ করেন। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মানুষ চিনতে দু'-একবার ভুল হয়ে যায়, হয়তো সেইরকম কোনও ভুলের বশেই তিনি আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে এরকম গুরুতর কাজের জন্য বেছেছিলেন। তিনি না বললে, এরকম কোনও পরিকল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু আমি এ দায়িত্ব নিতে যে পরাঙ্মুখ হইনি, তার কারণ আগেই বলেছি, এ কাজটাকে আমি খুব গুরুতর মনে করি না। আমি নিজে যেমন অনুবাদ কবিতার কাছে বিশেষ কিছু দাবি করি না, যা দাবি করি, (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তা আমার পক্ষেও পরিবেশন করা সম্ভবত শক্ত নয়। এখানে বিশেষ কোনও প্রতিভা বা মেধার প্রশ্ন নেই, প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত ইংরেজি কবিতাই পড়েন, কিন্তু সাম্প্রতিক পৃথিবীর সাহিত্যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে ইংরেজি কবিতার স্থান অনেক নিচুতে। আলস্যবশে, কিংবা সুলভ নয় বলেই আধুনিক ফরাসি-জার্মান-ইতালিয়ান ইত্যাদি কবিতার অনুবাদ সাধারণ পাঠকদের চোখে পড়ে না। আমি সেইসব ভাষার আধুনিক কবিদের নির্বাচন করে, জীবনী সাজিয়ে, সাহিত্যে আন্দোলনগুলির পরিচয় জানিয়ে ধারাবাহিকভাবে কবিতার সচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করছি মাত্র। আমার কৃতিত্ব শুধু পরিশ্রমের। আর কিছু না।

পত্রিকায় প্রকাশের সময়, একজন অচেনা তরুণ আমায় চিঠি লিখে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন এই বলে যে, আমি আমেরিকা মহাদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলুম

বাংলা কবিতা অনুবাদ করার জন্য, সেখানে সে-কাজ না করেই ফিরে এসেছি, অথচ দেশে ফিরেই অন্য দেশের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছি কেন? উত্তর খুব সরল। আমি ইংরেজি জানি না, কিন্তু বাংলা ভাষা জানি। সাহিত্য পদবাচ্য হবার মতন ইংরেজি আমার পক্ষে ইহজীবনে লেখা সম্ভব নয়, ইংরেজি থেকে যেকোনও বিষয় আমার পক্ষে নির্ভুল বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব। এ কথাটা জানার জন্য আমার পক্ষে আমেরিকা পর্যন্ত যেতে হল কেন? যাবার সুযোগ পেলে কে না যায়? তা ছাড়া, বিদেশে গিয়েই স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, অন্য ভাষায় লেখার চেষ্টা বা অনুবাদ করার চেষ্টার মধ্যে অত্যন্ত দীনতার ভাব প্রকাশ পায়, আমি এরকম চেষ্টা আর কখনও করব না। ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে লাভজনক, কিন্তু সম্মানজনক নয়। পরভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে এরকম উদাহরণ এপর্যন্ত দু'-তিনজন মাত্র, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে এখনও একজনও না। শুভাচার বা অনাচার শুধু মাতৃভাষাতেই সম্ভব।

কবির কাছে তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দই মূল্যবান ও অবধারিত। সেইজন্য কবিতার অনুবাদ আক্ষরিক হওয়াই অনেকের মতে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আক্ষরিক অনুবাদ যে অসম্ভব— তা তো বলাই বাহুল্য, একই কবিতার তিনজনের করা আলাদা অনুবাদ দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। আবার এর চরম বিপরীত উদাহরণ দেখিয়েছেন 'ইমিটেশান্‌স' বইতে রবার্ট লোয়েল। সেখানে তিনি বিখ্যাত বিদেশি কবিদের রচনা অনুবাদ করেছেন সম্পূর্ণ নিজের মতন করে, লাইন ভেঙেচুরে, উলটে-পালটে। এমনকী, বোদলেয়ারের কবিতায় পারম্পর্য বোঝবার জন্য দুটি নিজস্ব স্তবক পর্যন্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, মূলের স্বাদ যখন পাওয়া যাবেই না, তখন অনূদিত কবিতাটি যেন মৌলিক কবিতা হয়ে ওঠে যেকোনও প্রকারে। আমার অনুবাদের পদ্ধতি এইরকম: আমি প্রথমে মূল কবিতা ও ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করেছি, তারপর প্রুফ দেখার সময় মূল কবির কথা প্রায় ভুলে গিয়ে, রচনাটি যাতে বাংলায় সুসহ হয় এইজন্য বেপরোয়াভাবে শব্দ কেটেছি এবং বদলেছি। ফলাফল এখনও দুর্বোধ্য। যেসমস্ত কবিদের রচনা বাংলায় আগেও অনূদিত হয়েছে, আমি যতদূর সম্ভব সেই সমস্ত বাঙালি অনুবাদকদের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। এবং বিদেশের কবিতা সম্পর্কে যাঁরা সত্যিকারের উৎসাহী, তাঁরা অবশ্যই শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' সংকলনটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখবেন, সেখানে আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদের করা আরও বহু দেশের বহু সংখ্যক কবিতার অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে। আমার এই বইটির যেটুকু আলাদা মূল্য, তা হল, পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ভাষার আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন, মুখ্য চিন্তা, প্রধান কবিদের জীবনী, হৃদয়ের সংবাদ, দুরূহ প্রয়োগের টীকা ইত্যাদি সংক্ষেপে একসঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। অন্য দেশের কবিতা বুঝতে এগুলি নিশ্চিত সহায়ক। প্রত্যেক ভাষা নিয়ে আলাদা বই বার করলে কাজ আরও সুষ্ঠু সম্পূর্ণ হত। আশা করে রইলুম, অন্য কেউ পরে সে কাজ করবেন।

এই বই পড়ে পাঠকদের যদি কোনও লাভ হয়, খুবই সুখের কথা। আমার অন্তত যথেষ্ট উপকার হয়েছে। প্রায় একবছর ধরে নানান দেশের কবিদের রচনা ও জীবনের সঙ্গে জড়িত থেকে তাদের সঙ্গে কীরকম যেন আত্মীয়তা হয়ে গেছে। এই গ্রন্থের অনেক কবিকে এখন আমার ব্যক্তিগত বন্ধুর মতন মনে হয়।

কবিদের নির্বাচন করার সময় কখনও সমালোচকদের সাহায্য, কখনও ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেছি। স্প্যানিশ কবিতায় গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল কিংবা জার্মান কবিতায় নেলি শাখ্‌স-এর রচনা আমি গ্রহণ করিনি, কারণ ওঁদের খ্যাতি ও সম্মানের কারণ শুধু সাহিত্য নয়। আবার, ফরাসি কবিতায় সুররিয়ালিজম আন্দোলনের নেতা ও প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেঁতো কিংবা ইতালির ফিউচারিজম আন্দোলনের হোতা ফিলিপ্পো মেরিনেত্তি—যাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন পৃথিবীর সমকালের মহাকবিরা—এঁদের কবিতা যে আমি অন্তর্ভুক্ত করিনি, তার কারণ, সাহিত্যে এঁরা নতুন দর্শনের সৃষ্টি করে গিয়েছেন, কিন্তু কবি হিসেবে কালোত্তীর্ণ হতে পারেননি। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ইস্তাহারগুলি ইতিহাসের সামগ্রী হতে পেরেছে, তার থেকে কিছু নমুনা এখানে উদ্ধার করছি।

ফিউচারিস্টিক মেনিফেস্টো

১. বিপদকে ভালোবাসা, বিপদের অভ্যাস এবং হঠকারী দুঃসাহসের গান আমরা গাইতে চাই।

২. আমাদের কবিতার মূল উপাদান হবে, সাহস, অকুতোভয়তা এবং বিদ্রোহ।

৩. চিন্তামগ্ন জড়তা, আনন্দ এবং ঘুম— সাহিত্য এপর্যন্ত এগুলোকেই উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছে। এবার আমরা তুলে ধরব, আক্রমণ, আচ্ছন্ন অনিদ্রা, খেলোয়াড়ের পদক্ষেপ, বিপজ্জনক লাফ, কানমলা এবং ঘুষোঘুষি।

৪. আমরা ঘোষণা করছি যে পৃথিবীর বিস্ময় সম্প্রতি ধনী হয়েছে এক নতুন সৌন্দর্যে: গতির সৌন্দর্য। কামানের গোলার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়া একটি গর্জমান মোটরগাড়ি "ভিকট্রি অব সামোথরেসের" চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

৫. স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে যে মানুষ তার গান গাইতে চাই— যার আদর্শ দণ্ড ভেদ করে যাচ্ছে পৃথিবী, যে তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান।

৬. বিলাসী অপব্যয়, উজ্জ্বলতা ও তাপে কবি নিজেকে নিঃশেষ করতে বাধ্য—যাতে আদিম উপাদানগুলির জ্যোতি উজ্জীবিত হয়।

৭. যুদ্ধ ছাড়া আর কোথাও কোনও সৌন্দর্য নেই। আক্রমণকারীর চরিত্র ছাড়া কোনও মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবিতাকে হতে হবে অজ্ঞাত শক্তির বিরুদ্ধে হিংস্র আঘাত যাতে তারা মানুষের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে।

৮. আমরা সমস্ত শতাব্দীর দূর উপকূলে দাঁড়িয়ে আছি! আমাদের তো কাজ

অসম্ভবের রহস্যময় দ্বার ভেঙে ফেলা, সুতরাং পেছনে তাকিয়ে কী লাভ? টাইম এবং স্পেস গতকাল মারা গেছে। আমরা এখনই বেঁচে আছি অনন্তের মধ্যে, কারণ আমরা ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছি শাশ্বতের সদা জাগ্রত গতি।

৯. আমরা গৌরবময় করতে চাই যুদ্ধ—যুদ্ধেই পৃথিবীর একমাত্র স্বাস্থ্য ভালো থাকে— সামরিক শাসন, দেশাত্মবোধ, সন্ত্রাসবাদীর ধ্বংসচেষ্টা, হত্যার মহৎ আদর্শ, নারীর ঘৃণা।

১০. মিউজিয়াম, লাইব্রেরিগুলো ধ্বংস করব আমরা, যুদ্ধ করতে হবে নীতিবাদ, নারীর স্বাতন্ত্র্য আর সব সুবিধাবাদী, উপকারবাদী কাপুরুষতার বিরুদ্ধে—ইত্যাদি।

ফিলিপ্পো মেরিনেত্তির এই ইস্তাহারের অনেকখানিই এখন ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। কিন্তু এর সারবস্তু, পুরনো বিশ্বাসের প্রতি উচ্চারিত বিদ্রোহ ও ভাঙনের আহ্বান অন্যান্য প্রতিভাবান কবিদের প্রেরণা দিয়েছিল একসময়। এই ছেলেমানুষির বশেই মেরিনেত্তি কবিতার আঙ্গিকে যেসব উদ্ভট ভাঙাচোরা ও রীতিবদলের চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তাঁর নিজের কবিতা সার্থক হয়নি কিন্তু অপর কবিদের নতুন রীতি প্রণয়নে সাহায্য করেছে। মেরিনেত্তি নিজের কাছেও পরাজিত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, এতসব বিদ্রোহের কথার পরও— তিনি স্বয়ং যোগ দিয়েছিলেন মুসোলিনির ফ্যাসিস্ত দলে, প্রচুর খেতাব ও সরকারি সম্মান পেয়ে ব্যর্থসুখে কাটিয়েছেন বৃদ্ধ বয়েস। ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রথম ছাপা হয়েছিল প্যারিসে, ১৯০৯ সালে।

আঁদ্রে ব্রেঁতো-র সুররিয়ালিস্ট মেনিফেস্টো—প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯২৪-এ, তারপর তিনি আবার লিখেছিলেন দ্বিতীয় মেনিফেস্টো, দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার সমগ্রভাবে সুরারিয়ালিজমের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখেন। সে দীর্ঘ রচনার অনুবাদ এখানে সম্ভব নয়, তবে তার সারমর্ম আমি বিভিন্ন সুররিয়ালিস্ট কবিদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

ছোট ছোট শাখা আন্দোলনগুলির প্রতিভূ হিসেবে আমি একজন বা দু'জনকে বেছে নিয়েছি; কিন্তু সব সময় তাঁরাই যে সে দলের শ্রেষ্ঠ কবি এমন নয়। যাঁদের কবিতা অনুবাদে কিছুই বোঝা যায় না, তাঁদের বাদ দিয়ে আমার পক্ষে সুবিধাজনকদেরই নির্বাচন করেছি। যেমন জার্মানিতে অগুস্ট স্ট্রাম একজন প্রধান কবি, কিন্তু তাঁর কবিতা অনুবাদে প্রায় অর্থহীন দাঁড়ায়, এইরকম:

যুদ্ধক্ষেত্র

উৎপন্ন কাদা ফিসফিসিয়ে লোহাকে ঘুম পাড়ায়
রক্ত চাপ বাঁধে সেখান থেকে তারা গড়াচ্ছিল
মরচে গুঁড়োয়

মাংস থিক থিক
লোভ চোষে ক্ষয়ের চারপাশে।
হত্যার ওপর হত্যা
চোখ মারে
ছেলেমানুষি চোখে।

অনেক কবির দীর্ঘ কবিতা সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে পারিনি, কারণ আমি ধৈর্যহীন। তবে, তথ্য, তারিখে যাতে ভুল না থাকে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কোনও ত্রুটি কারুর চোখে পড়ে সে সম্পর্কে আমাকে উপদেশ বা পরামর্শ জানালে কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করব। অকপটে স্বীকার করি, নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে আমার কোনও ভুল ধারণা নেই এবং সত্যিই খুব সংকোচের সঙ্গে এই বইটি প্রকাশ করছি।

নানা সময়ে আমাকে বই দিয়ে সাহায্য করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, জ্যোর্তিময় দত্ত, বেলাল চৌধুরী, শুদ্ধশীল বসু। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ফরাসি কবিতা: সুররিয়ালিজমের উন্মেষ

ত্রিস্তান জারা নামে একজন তরুণ রুমানিয়ান, উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন সুইটসারল্যান্ডে। জুরিখের 'ক্যাবারে ভলতেয়ার' নামে এক রেস্তোরাঁয় ত্রিস্তান নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সাহিত্য-আন্দোলনের নামে প্রচুর হই-হুল্লোড় শুরু করে দিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, নীতি, আশা, মমতাবোধ বিপন্ন ধ্বংসের কাছে। বস্তুত, প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত পৃথিবীর মানুষের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশি প্রচণ্ডভাবে লেগেছিল— কারণ, সেই প্রথম সভ্য পৃথিবীতে ব্যাপক মহাযুদ্ধ— তাও দীর্ঘদিন শান্তির পর, অকস্মাৎ। যুদ্ধের নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় বহু সাধারণ মানুষ এমনিতেই পাগল হয়েছিল—সুতরাং কবি-শিল্পীদের মধ্যে খানিকটা পাগলামি দেখা দেবে— সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। ত্রিস্তান জারা তাঁর পাগলামির আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন ডাডা (পরে ডাডাইজম নামে পরিচিত)— কথাটা ডিকশনারি থেকে হঠাৎ তুলে নেওয়া, চলতি অর্থ খেয়াল-খুশিতে যা ইচ্ছা করা, অর্থাৎ কথাটার কোনও মানে নেই— সেইটাই ওঁরা চেয়েছিলেন, ত্রিস্তান চেয়েছিলেন তাঁর আন্দোলনের কোনও উদ্দেশ্য থাকবে না, কোনও অর্থ না, কোনও কারণ না— সম্পূর্ণ নৈরাজ্য।

কিন্তু ত্রিস্তান ভেবেছিলেন, তাঁর আন্দোলন একটা বিশাল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। খুব লম্বা লম্বা চিঠি লেখা তাঁর স্বভাব ছিল, এন্তার চিঠি লিখতে লাগলেন জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকার তরুণ লেখক-শিল্পীদের কাছে— তাঁর বিপ্লবে যোগদান করার জন্য। শেষ পর্যন্ত জুরিখ শহর তাঁর কাজের তুলনায় খুব ছোট জায়গা মনে হওয়ায়, সদলবলে চলে এলেন সভ্যতার মুকুটমণি প্যারিসে।

এই সময় প্যারিসে একজন ডাক্তারি ছাত্র, আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে— লুই আরাগঁ, পিলিপ সুপো ইত্যাদি— একটি চটি পত্রিকা বার করতেন, নাম 'সাহিত্য'। এই তরুণ দল ছিলেন কিছুটা বিক্ষুব্ধ, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রতি আস্থাহীন, অস্থির, ক্রুদ্ধ। পল ভালেরির মতো মহৎ কবিও তখন অ্যাকাডেমিতে সদস্যপদ পাবার জন্য তদারকিতে ব্যস্ত, সুতরাং তরুণরা ওঁর প্রতি খানিকটা নিরাশ, পল ক্লোদেলের মতো বড় কবিও তখন সদ্য ক্যাথিলিক হয়ে চরম গোঁড়া হয়ে উঠেছেন—(আঁদ্রে জিদ ক্লোদেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'উনি আগে ছিলেন সূক্ষ্ম পেরেক, এখন হয়েছেন হাতুড়ি!') এবং আঁদ্রে জিদ—যাঁর রচনায় তরুণরা অনেক সময় আত্মপ্রতিকৃতি দেখতে পেয়েছে—তিনিও কিছুটা ঈষদুষ্ণ। একমাত্র যে বিশাল, দুর্দান্ত, বল্গা-হীন,

কুসুম-কোমল কবিকে (তখন প্রায় অপরিচিত) তরুণরা মনপ্রাণ সঁপে ছিল, সেই গি.ম আপোলিনেয়ার যুদ্ধ থেকে মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে ফিরে, যুদ্ধ বন্ধ হবার ঠিক আগের দিন হাসপাতালে মারা গেলেন। আর, মার্শেল প্রুস্ত যদিও 'সাহিত্য' কাগজে লিখলেন না—কিন্তু বারো পাতার চিঠি লিখে সমর্থন জানালেন।

সুতরাং ত্রিস্তান জারার হইহই দলের সঙ্গে প্যারিসের যুবারা একসঙ্গে মিলে গেলেন। শুরু হল ডাডাইজমের নামে অনেক উদ্ভট কাণ্ড, রাস্তাঘাটে গোলমাল, থিয়েটারে গিয়ে চেঁচামেচি, পথের উপর বসে পড়ে কবিতা লেখা—খবরের কাগজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যাবতীয় চেষ্টা। ত্রিস্তান জারার বিখ্যাত উক্তি, 'সব রকম নিয়মের অভাবও একটা নিয়ম— এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম'— তরুণদের খুব মনে লেগেছিল।

কিন্তু ফরাসি দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনেও বহুরকম পাগলামি প্রশ্রয় পেতে পারে— কিন্তু সাহিত্য-আন্দোলনে সাহিত্য ছাড়া অন্য উপসর্গ বেশিদিন মনোযোগ পায় না। ত্রিস্তানের নৈরাজ্য অবিলম্বেই একঘেয়ে হয়ে গেল। তখন আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর দলবল নিয়ে সরে দাঁড়ালেন, শুরু করলেন নতুন শিল্প-আন্দোলন, ১৯২৪-এ প্রকাশিত হল প্রথম সুররিয়ালিজমের ইস্তাহার। এবং সুররিয়ালিজম এ-শতাব্দীতে এপর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান শিল্পদর্শন।

সুররিয়ালিজম শব্দটা ব্রেতোঁ পেয়েছিলেন আপোলিনেয়ারের রচনায়— কিন্তু এর বীজ ছিল আরও অনেক আগে র‍্যাম্বোর লেখায় বা আরও আগে নার্ভাল, বালজাকের মধ্যে। পৃথিবীর সেই চরম বিস্ময়কর কবি, দুর্দান্ত বখাটে বালক র‍্যাম্বো— আজ সুররিয়ালিজমের প্রধান পুরুষ, সিমবলিস্টদের প্রধান হিসেবে খ্যাত, এমনকী এক্‌জিস্‌টেনশিয়ালিজমের প্রবক্তা হিসেবেও গণ্য, আবার ক্লোদেল ওঁর রচনা পড়েই ক্যাথলিক হবার প্রেরণা পেয়েছেন। (Rimbaud বাংলায় লেখা হয় র‍্যাঁবো। কিন্তু দেখেছি ফরাসিরা ও উচ্চারণ শুনে চিনতেই পারে না। ওরা যেভাবে উচ্চারণ করে— সেটা বাংলায় লিখলে অনেকটা শোনায় র‍্যাম্বো। আমি বিদেশি উচ্চারণের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে নই, জ্ঞানও খুবই কম, নিতান্ত নতুনত্বের লোভেই র‍্যাঁবোর বদলে র‍্যাম্বো লিখতে মাঝে মাঝে লোভ হয়।)

সুররিয়ালিজমের মূল বক্তব্য, কবিকে হতে হবে দ্রষ্টা, সে শুধু ভবিষ্যৎ দেখবে না— দেখবে নিজের অন্তঃকরণ, ছায়া, মগ্নচৈতন্য— হৃদয় খুঁড়ে জাগাবে বেদনা, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, ললাটলিপির মতো যুক্তিহীনতা। এই সময় সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এনে দিয়েছিলেন অবচেতনার ধারণা, ব্রেতোঁ নিজেও ছিলেন মনোবিজ্ঞানী— সেই থেকে আসে লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, মাদক সেবনের পর পারম্পর্যহীন প্রতিফলনের লিখিত রূপ— অটোমেটিক রাইটিং বা কলম হাতে নিয়ে বসে থাকার সময় যাবতীয় বিদ্যুৎস্মৃতি ধরে রাখা। সব প্রয়াস সফল হয় না, কিন্তু বহু দুর্লভ কবিতা বা ছবি এর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অবচেতনের উদ্ধার— এ ছাড়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে মেলাবার আর কোনও উপায় নেই সাহিত্যে।

আমাদের ভারতবর্ষে সুররিয়ালিজমের প্রভাব যথাকালে আসেনি। অথচ এ তো ভারতবর্ষেরই। সুররিয়ালিজমের মূল খুঁজতে অনেক চলে গেছেন প্রাচীন গ্রিসে— যেখানে ডেল্‌ফির দেবতা সক্রেটিসকে বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো'। কিন্তু তারও বহু আগে আমরা শুনেছিলাম 'আত্মানং বিদ্ধি'। ধ্যানের সাহায্যে অপরলোকে উত্থান, শরীর ছাড়িয়ে গিয়ে দৈববাণী শ্রবণ, বেদ যে কারণে অপৌরুষেয়, অ্যালকেমির সমান্তরাল তান্ত্রিক উপাসনা— ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্যে আমরা এগুলো ভুলে গেছি অনেকদিন, সম্ভবত ইংরেজদের প্রভাবে। ইয়োরোপে যখন আত্মার পুনরাবিষ্কার হয়, আমরা তখনও তাকে গ্রহণ করতে পারিনি।

সুররিয়ালিজমের প্রভাব পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, ক্রমে বিভিন্ন মহাদেশে—। দলগত আন্দোলন হিসেবে সুররিয়ালিজম বেশিদিন টেঁকেনি। ক্রমে এসে যোগ দিয়েছিলেন পল এলুয়ার, জাক প্রেভের, আন্টোনিন আর্তো, হ্রেনো শার— প্রমুখ। শিল্পীদের মধ্যে মিরহো, মাক্স আনর্স্ট, চিরিকো, পিকাবিয়া, টালি, ম্যান রে, সালভাদর দালি প্রমুখ। প্রথম দল ভাঙতে শুরু করে, ব্রেতোঁ যখন রাশিয়ার দৃষ্টান্তে কমিউনিজম সমর্থন করলেন। পরে অবশ্য, ব্রেতোঁর আশাভঙ্গ হয়েছিল এবং কমিউনিজমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তখন ভাঙা দল আর জোড়া লাগেনি। এ ছাড়া, কবিদের মধ্যে যা খুব স্বাভাবিক— ছিল ক্ষমতার লড়াই ও ঈর্ষা— আঁরি মিশোর মতো বড় কবি যেমন ব্রেতোঁর নেতৃত্বে কখনও সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিতে চাননি, বরং প্রকাশ্যে নিন্দে করেছেন, কিন্তু উত্তরকাল জানে মিশো মনেপ্রাণে সুররিয়ালিস্ট। এ আন্দোলনে চরম আঘাত হানেন ১৯৪০-এ জাঁ পল সার্ত্র, তাঁর অস্তিত্ববাদ দিয়ে— নতুন করে জেগে ওঠার জন্য আমেরিকার নির্বাসন ছেড়ে আঁদ্রে ব্রেতোঁ আবার প্যারিসে এসে তাঁর 'সিংহের কেশর' নেড়ে ভাঙা দল জোড়ার চেষ্টা করলেন— কিন্তু, ততদিনে দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

কিন্তু দল হিসেবে অস্তিত্ব না থাকলেও আদর্শ হিসেবে প্রবলভাবে আছে। সারা পৃথিবীর সচেতন লেখকদের মধ্যে এমন বোধহয় একজনও নেই— যিনি সুররিয়ালিজমকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবেন। যোগাযোগহীন হলেও বাংলাদেশের জীবনানন্দ দাশ এই জাতের কবি। এরপর আর কোনও নতুন সাহিত্য-দর্শন পৃথিবীতে আসেনি। এমনকী ইংল্যান্ডের অ্যাংরি ইয়ংমেন এবং আমেরিকার বিট জেনারেশন— সেই সুররিয়ালিস্টদেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের পুনঃপ্রকাশ। সুররিয়ালিস্টদের মধ্যে কে কত বড় লেখক ছিলেন এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে— কিন্তু এদের আদর্শ প্রভাবিত করেছে পৃথিবীর মহত্তম লেখকদের।

সুররিয়ালিস্টদের আর একটি বড় কীর্তি, গদ্যের কবল থেকে কবিতার উদ্ধার। গত শতাব্দী থেকে শুরু হয় গদ্যের প্রবল প্রচার, উপন্যাসের রবরবা— এবং উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন হল যুক্তি এবং বাস্তবতাবোধ, প্রতিটি পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য, যার চরম প্রকাশ ডিটেকটিভ নভেলে— যেখানে প্রতিটি কথা এবং প্রত্যেক মানুষের চলাফেরার মধ্যেই একটা ছদ্ম কারণ দেখানোর চেষ্টা। এর সঙ্গে

পাল্লা দিতে গেলেই কবিতার সর্বনাশ। ব্রেতোঁ এইজন্য উপন্যাসকে বলতেন 'দাবা খেলা'। কবিতার মুক্তি অলৌকিকে, রহস্যে, স্বপ্নের মতো আপাত যুক্তিহীনতায়। সুররিয়ালিস্টরা এই জন্য আক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে (খ্রিস্টধর্ম)— নিৎসের 'ঈশ্বরের মৃত্যু'ও ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন— কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু আনতে হলে— ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হয়, নচেৎ যা ছিলই না তার মৃত্যু হয় কী করে। খ্রিস্টধর্মে অলৌকিক বা রহস্যের স্থান নেই, যেমন অডেন 'হোমেজ টু ক্লিয়ো' কবিতায় লিখেছেন:

A Christian ought to write in prose
For poetry is Magic.....

সুররিয়ালিস্টের দল প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন রহস্যের, স্বপ্নের, আলোছায়ার (যার প্রভাবে পাশ্চাত্যের বহু লেখক ঝুঁকেছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে)— এবং ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সাহিত্যের তথাকথিত বাস্তবকে— এবং শুধু কবিতায় নয়— এই রহস্যময়তা ছড়িয়ে গেল চিত্রশিল্পে, ফিল্মে, নাটকে— সুররিয়ালিস্টদের অন্যতম প্রধান আন্টোনিন আর্তো আজ পৃথিবীর আধুনিক নাট্যকারদের— ব্রেখট, বেকেট আয়োনেস্কো, জেনে— এঁদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। এই আক্রমণের হাতে অসহায় হয়ে গিয়ে ফরাসি গদ্যও অনেক যুক্তি ত্যাগ করে আশ্রয় নিল 'নিউ নভেল' আন্দোলনে, এবং সারা পৃথিবীর আধুনিক উপন্যাসই আজকাল আর তথাকথিত বাস্তব বা যুক্তিপ্রধান নয়।

সুররিয়ালিজম আন্দোলন যে আমাদের দেশে যথাসময়ে আসেনি— তাতে যে আমাদের সাহিত্যের কোনও ক্ষতি হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যেরই একটা নিজস্ব গতি আছে, বাংলা সাহিত্য সেই নিজস্ব মহিমায় অগ্রসর হয়েছে, এবং আন্দোলন না হয়েও ব্যক্তির আবিষ্কার চলেছে বাংলা গদ্য ও কবিতায়। সেদিক থেকে কলকাতা-প্যারিস-নিউ ইয়র্ক এক, দান্তে যেমন বলেছিলেন, পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই অচেনা কবি মাঝে মাঝে মুখোমুখি কথা বলে।

গিয়ম আপোলিনেয়ার

[মা পোলিশ, বাবা ইতালিয়ান, উভয়ের বিবাহ হয়নি, আপোলিনেয়ার বাবাকে ভালো চিনতেন না। তিনি নিজের নাম নিজে ঠিক করেছিলেন। জন্ম ১৮৮০, শরীরে এক বিন্দু ফরাসি রক্ত নেই, উচ্চশিক্ষা পাননি, কিন্তু আপোলিনেয়ার খাঁটি ফরাসি কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। জীবনটা অনেক ব্যর্থ-প্রেমের মালা, বিশাল চেহারা ছিল, আমুদে— হই-হুল্লোড়ে, নিজের উৎসাহে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, মাথায় গোলার ঘা খেয়ে ফিরে আসেন, সে আঘাত সারেনি, বিয়ে করলেন— তার ছ' মাস পরেই যুদ্ধ থামার আগের দিন মৃত্যু। ওঁর শব বহে নিয়ে গিয়েছিলেন পিকাসো এবং অন্যান্য শিল্পী-বন্ধুরা। নিজে ছিলেন বলিষ্ঠ শিল্প সমালোচক, কবি হিসেবে জীবিতকালে প্রায় অপরিচিত, এখন খ্যাতির শীর্ষে।

ভালোবাসায় নিবেদিত জীবন

হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
শুকনো ফুলের মালা
এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
সন্দেহ আর জ্বালা

নানা ক্যানভাসে এ ছবি সাজানো
নকল রক্তধারা
একটি বৃক্ষে ফুলের মতন ফুটে আছে বহু তারা
নীচে কেউ নেই এক বিদূষক ছাড়া

শীতল রশ্মি পারিপার্শ্বিকে খেলে ঝরে যায়
তোমার চিবুকে ভাসে
গুলির শব্দ চিৎকার উঠে আসে
আঁধারে একটি আঁকা-মুখ একা হাসে

এ ছবির ফ্রেমে বাতাসের কাচ ভাঙা
অচেনা হাওয়ার সুর
ভাবনা এবং ধ্বনির মধ্যে করে এসে ঘুরঘুর
স্মৃতি ও ভবিষ্যতের ভিতরে ঘুরে যায় বহু দূর

হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
শুকনো ফুলের মালা
এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
পরিতাপ আর যুক্তির বহু জ্বালা

বন্ধন

চোখের জলে তৈরি করা রজ্জু
সারা ইওরোপ জুড়ে ঘণ্টা বাজে
শতাব্দীরা ফাঁসিতে ঝুলছে

আমরা মাত্র দু'জন কি তিনজন মানুষ
সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত
এসো আমরা হাত ধরে থাকি

ভয়ংকর বৃষ্টি চিরে যায় ধোঁয়া
দড়ি
পাকানো দড়ি
সমুদ্রের নীচে টেলিগ্রাফের তার
ব্যাবেলের স্তম্ভগুলি বদলে হয় সেতু

মাকড়সা—মোহান্ত
এক সূত্রে সমস্ত প্রেমিকরা বাঁধা
আরও সব সূক্ষ্ম বন্ধন
আলোর সাদা রেখা
সুতো ও সমতা

হে অনুভব হে প্রিয় অনুভব
স্মৃতির শত্রু
বাসনার শত্রু
অনুতাপের শত্রু

অশ্রুর শত্রু
আমার সমস্ত প্রিয় জিনিসের শত্রুরা
আমি শুধু তোমাদেরই গৌরব দিতে লিখে যাই

[আপোলিনেয়ার কবিতায় সাধারণত কমা, ফুলস্টপ ব্যবহার করতেন না। প্রথম কবিতার মূল নাম লাতিনে, Vitam Impendere Amori, তাঁর দ্বিতীয় গান, অনূদিত হল, পরপর লাইনে মিল ছিল, অনুবাদের সময় আমার হাতে অন্যরকম মিল এসে গেছে। এ কবিতা লেখার সময় কবির বয়স সবে তিরিশ পেরিয়েছে, মারি লরাঁসাঁ নামে শিল্পীর সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের পর, সেইজন্যই এ কবিতায় ওইরকম ছবির উল্লেখ। আপোলিনেয়ারও আলফ্রেড দে মুসের মতো এক নারী থেকে অন্য নারীতে ভালোবাসার পর্যটনে বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয় কবিতার নাম Liens, অমিল মুক্ত-ছন্দে লেখা, শেষ স্তবকের প্রথম লাইনটি আমি অনুবাদে ইচ্ছে করেই একেবারে স্তবকের শেষে বসিয়েছি।]

আন্টোনিন আর্তো

[আর্তোর কবিতা আজকাল অনেক সংকলনে থাকে না, কারণ আর্তো তাঁর প্রতিভা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বহু ধারায়, কবিতা, নাটক, নাটকে অভিনয়, পরিচালনা, ফিল্ম, চিত্রনাট্য লেখা, সমালোচনা; বিশেষত অভিনয়। এ ছাড়া জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর কেটেছে পাগলা গারদে। কিন্তু আর্তোর প্রভাব এখন পৃথিবীর অনেক কবির রচনায়, বিশেষত আমেরিকায় খুব প্রবল। এ ছাড়া আধুনিক নাটকে তাঁর চিন্তা বিশেষ সম্মানিত।

জন্ম ১৮৯৬, ভালো ছাত্র ছিলেন, কবিতা লেখা শুরু ১৪ বছর বয়সে, এর চার বছর পরেই মেলানকলিয়া রোগ, দু' বছর কাটে মেন্টাল হোমে, সেই থেকেই ধারাবাহিক অসুস্থতার শুরু।

সুররিয়ালিস্ট দলের এক সময় তিনি ছিলেন সবচেয়ে জীবন্ত, দুর্দান্ত, তীব্র বেপরোয়া সদস্য। এক সংখ্যা 'সুররিয়ালিজম বিপ্লবের' তিনিই সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বিচ্ছেদ হয়ে যায়, যখন ওঁরা সাম্যবাদ সমর্থন করেন। আর্তো মনে করতেন, এই নোংরা বাস্তব পৃথিবী নিয়ে মাথা ঘামানোই অশুচি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বুর্জোয়া কিংবা সর্বহারাদের হাতে থাকল— এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। এই বিচ্ছেদ এত উগ্র যে, পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, আঁদ্রে ব্রেতোঁর দল ইস্তাহার ছাপিয়ে একান্তে ওঁর নাম কেটে দেন, এবং আর্তো ওঁদের বললেন ভণ্ড ও জোচ্চোর, তাঁর ব্যক্তিগত সুররিয়ালিজমের ধারণাই সৎ এবং খাঁটি, 'নতুন ম্যাজিক'।

বহু নাটকে অভিনয় করেছেন, নিজের শরীরে বহু মাদক পরীক্ষা করেছেন, সব সময় তাঁর মনে হত নিজের ভাবনার উপযোগী শব্দ পাচ্ছেন না, কে যেন তাঁর শব্দগুলি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই থেকে মাথার যন্ত্রণা শুরু হত। কারুর সঙ্গে ঠিক মানিয়ে চলতে পারতেন না, নিজের মতামত এমন দৃঢ়। বিষম আকর্ষণ ছিল প্রাচ্য দর্শনে। শেষবার শুভানুধ্যায়ী এবং

বন্ধুবান্ধবরা প্রায় জোর করেই পাগলা গারদে ভরে দেন, খুব আপত্তি ছিল, আর্তো ভেবেছিলেন এসব ষড়যন্ত্র, সেখান থেকে পেনসিলে রক্ত-ঝরানো চিঠি লিখেছেন, যার প্রতিটি অনুবাদযোগ্য। সেখান থেকে ছাড়া পাবার দু'বছর পর ১৯৪৮-এ দুঃখিত মৃত্যু। Antonin Artaud-এ প্রথম নামের উচ্চারণ আমি শ্রুতিনির্ভর করে লিখেছি। এ নাম সম্ভবত ফরাসিদের হয় না, গ্রিক; কারণ আর্তোর বাবা ফরাসি হলেও মা গ্রিক বংশের রমণী।]

একটি কবিতা

আমার সঙ্গে আছেন ঈশ্বর-কুকুর, আর তাঁর
ত্রিশূলের মতো জিভ বিদ্ধ করে আছে
যা তাকে সব সময় চুলকুনি দিয়েছে
পৃথিবীর দুই ভাঁজ গম্বুজের আন্তর।

এবং এখানে এক জলের ত্রিভুজ
ছারপোকার গতি নিয়ে হাঁটে
কিন্তু নীচে, ছারপোকাও বদলে যায় জ্বলন্ত কয়লায়
আর জল ছুরির মতন বিদ্ধ করে।

কুৎসিত বিশ্বের দুই স্তনের গভীরে
ঈশ্বর-কুক্কুরী লুকিয়েছে
পৃথিবীর বুক আর বরফের জল
পচন ধরায় সেই শূন্যগর্ভ জিভে।

আর এক কুমারীর এক হতে হাতুড়ি
আসছেন পৃথিবীর গুহাগুলি ধ্বংস করে দিতে
সেখানে মাথার খুলি তারকা-কুকুরের
বোধ করে বীভৎস সমতার জেগে ওঠা।

[ইচ্ছে করেই ছন্দ-মিল দিয়ে সুখপাঠ্য করা হল না অনুবাদটি। কারণ আপাত-অর্থহীনতা ও রুক্ষ কর্কশতা কবিতাটির সৌন্দর্য। যদিও মূল কবিতায় মিল আছে। দ্বিতীয় লাইনে বর্শা জাতীয় অস্ত্র ছিল, কিন্তু আমি পৃথিবী বিদ্ধ করার ইমেজের জন্য ত্রিশূল ব্যবহার করেছি। 'ঈশ্বর-কুকুর' অর্থে হয়তো ইজিপসীয় দেবতা আনুবিশ, সমাধিভবনের রক্ষক, তাঁর জিভ—

চিন্তার গমনপথ, ত্রিভুজ— সংসার, শরীর ও আত্মা, ছারপোকার মতো রক্তশোষক— যে শুধু একরকম সৌন্দর্য দেখাতে পারে। ছুরি জিভ ইত্যাদি পুরুষত্ব-প্রতীক শব্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগাবার জন্য কয়েকটি নারীত্ব-প্রতীক শব্দ আছে। পুরো কবিতাটিই এক হিসেবে চিন্তা ও লিখিত শব্দের দ্বন্দ্বের কথা। কবি আর্তো অর্ধেক ঈশ্বর ও অর্ধেক জানোয়ার— এই পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে একা বসে দেখছেন স্থূল, অকিঞ্চিৎকর বাস্তবের জেগে ওঠা।]

পল ভালেরি

[যদিও আপোলিনেয়ার দিয়ে এই পর্যায়ের অনুবাদ শুরু কিন্তু ক্লোদেল ও ভালেরিকে অন্তর্ভুক্ত না করলে ফরাসি কবিতার কোনও আলোচনাই হয় না। ভালেরি এই শতাব্দীর গভীরতম কবি। তাঁর নিজের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ যদিও একটি ছোট সংকলনে এঁটে যায়, কিন্তু পৃথিবীর কবিতায় তাঁর স্থান চিরকালের। জন্ম ১৮৭১-এ, মুগ্ধ হয়েছিলেন এডগার এলান পো-র কবিতায় (তাঁর নিজের রচনা যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের)। মালার্মের বাড়ি সন্ধেবেলার সাহিত্য-আড্ডায় যেতেন যুবক ভালেরি, তারপর কী কারণে যেন বহুদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফিরে এলেন বহু বছর পর, এবং তখন থেকে প্রতিটি কবিতা অসাধারণ। কবিতার ইতিহাসে এমন ত্যাগ করে আবার বহু পরে সার্থকতর হয়ে ফিরে আসার উদাহরণ আর দ্বিতীয় নেই। অঙ্ক ও বিজ্ঞানচর্চায় ছিল তাঁর আত্মার আনন্দ। ছিলেন সমালোচক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক আকাডেমির সদস্য, প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। মৃত্যু ১৯৪৫।

ভালেরির নাম যতটা পরিচিত, তাঁর কবিতা তত পঠিত নয় ফরাসি না-জানা মানুষের। অনুবাদের সম্পূর্ণ বাইরে তাঁর কবিতা। ইংরেজিতেও সার্থক অনুবাদ নেই। বাংলাতেও অনুবাদ খুব কম। 'সমুদ্রের পাশে কবর' নামে তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও কঠিন কবিতা, যেটির অর্থান্তর নিয়ে সময় কাটানো বহু গবেষক ও বিশেষ পাঠকদের ব্যসন, একটি অতি-ব্যক্তিগত কবিতা, সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভালেরি বিশ্বাস করতেন, কবিতা লেখা কোনও সৃষ্টি বা প্রেরণার ব্যাপার নয়, অঙ্কের মতো নির্মাণ ও নির্বাচন। বলা বাহুল্য, তাঁর কবিতা বহু জায়গায় তাঁর এই মতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এসে গেছে কবিত্বের আবেগ ও মর্মস্পর্শিতা। আমরা এখানে একটি কবিতার অনুবাদ করছি শুধু এইটুকুই দেখাবার জন্য যে, ভালেরির কবিতার কীভাবে তন্নতন্ন অর্থ করতে চান সমালোচকেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভালেরির শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'লা যন্ পার্ক' অর্থাৎ 'তরুণী ভাগ্য', ৫১২ লাইনের একটি বিস্ময়কর রচনা, যেটি নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং সফলতম কবিতা, এ পর্যন্ত বাংলায় পূর্ণ অনূদিত হয়নি। অবশ্যই কারুর এ চেষ্টা করা উচিত। মূলত সংগীত প্রধান বাংলা কবিতায় ক্রমশই অতি সারল্যের যে প্রবণতা এখন দেখা যায়, যার ফলে অধিকাংশ কবিতাই যে অর্থহীন আবেগ-ফলাফল হিসেবে প্রতীয়মান হয়, এর পরিপূরক হিসেবে কিছু দৃঢ়বদ্ধ, কঠিন, চেতনাপ্রধান কবিতার

আদর্শও উপস্থিত থাকা উচিত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যার শেষ চেষ্টা করেছেন। ভালেরির পাশে আদর্শ বা প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন বলেই আপোলিনেয়ারের সংগীতময় কবিতা অত সার্থক হতে পেরেছে। আমাদের বাংলা কবিতার আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, সংগীতময়তা, ফলে অতি সারল্য ক্রমশ আসা স্বাভাবিক।]

নিদ্রিতা

কী গোপনতার হৃদয়ে পোড়ায় আমার তরুণী সখা
ফুলের গন্ধ নেয় কি আত্মা মধুর মুখোশ পরে?
কোন নিষ্ফল পুষ্টিতে তার অশিল্প উষ্ণতা
ঘুমন্ত এই রমণীর দ্যুতি আপনি সৃষ্টি করে?

নিশ্বাস, চুপ, স্বপ্ন এবং অভেদ্য নীরবতা
হে শান্তি, তুমি অশ্রুর চেয়ে প্রবল প্রবল, তুমিই জয়ী
যখন বিশাল ঢেউ আর সেই ঘুমের গভীর পূর্ণ
অমন একটি শত্রুর বুকে আঁটে শলা-ষড়যন্ত্র।

হে নিদ্রাবতী, স্বর্ণশস্য ছায়া ও সমর্পণের
তোমার হিংস্র বিশ্রাম সাজে ওরকম উপহরে
হরিণী, অলস শরীর ছড়ানো আঙ্গুরথোকার পাশে

যদিও তোমার আত্মা এখন সুদূরে, ব্যস্ত নরকে
তোমার অঙ্গ, পবিত্রতম তলপেট, ঢাকা একটি তরল হাতে
জেগে আছে; জাগে তোমার অঙ্গ, আমার দু' চোখ খোলা।

[ঘুমন্ত নারী বহু কবিতা ও ছবির বিষয়। ভালেরির এই চতুর্দশপদী নিছক বর্ণনামূলক নয়, আবার কোনও রূপকও না। এটি প্রেমের কবিতা নয়, প্রেমের কবিতা ভালেরি প্রায় কখনও লেখেনইনি বলা যায়। আসলে একটি যুবতী সত্যিকারের নিদ্রিতা কিন্তু তার শরীর জেগে আছে। এই নারীর শরীর ও আত্মাকে পৃথক করে, শরীর যা দ্রষ্টার চোখে সুন্দর ও রমণীয়, আর আত্মা যখন বিশ্লিষ্ট তখন রক্তমাংসের মিলনে উন্মুখ, কিছুটা অসৎ সেই ইচ্ছা— এই বৈপরীত্যের খেলায় জীবন ও মৃত্যু এসে যায়। শেষ পর্যন্ত কবির চোখে এই বাস্তব নারীর দেহ নগ্ন, একটি নরম হাত উরুদেশ ঢেকে আছে, তার আত্মা অন্যত্র, সুতরাং কু-বাসনায়, কিন্তু তার ঘুমন্ত অঙ্গ দেখতে পাচ্ছে ভাবী উপভোক্তাকে অর্থাৎ কবিকে।

অবশ্য অন্যরকম অর্থও করা যায়। ভালেরির নিজস্ব নির্দেশ আমরা অগ্রাহ্য করতেও পারি। পূর্বের উল্লেখ করা, 'লা যন্ পার্ক' কবিতা সম্পর্কে ভালেরি বলেছিলেন, পাঠকরা ইচ্ছে করলে এটাকে শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা হিসেবেও গ্রহণ করতে পারেন। আর এই কবিতাটি, ভালেরির মতে, নিছক কবিতার আঙ্গিক ও শব্দ নির্বাচনের পরীক্ষা।

এখন এ কবিতার অনুবাদ অসম্ভব? বস্তুত, মূল কবিতার এই অনুবাদের দুরবস্থা দেখে আমারই কষ্ট হচ্ছে। সংস্কৃতের মতো লঘু, গুরু, প্লুতস্বরের ব্যবহারের বিশিষ্টতায় ভালেরি অসীম উদ্যমী। পণ্ডিতরা বলেন মূল কবিতায় ma, amie, ame ইত্যাদি শব্দের a অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ শায়িতা নারীর বিস্তৃত দেহের আভাস এনেছে। s-এর ঘন ঘন ব্যবহারে ঘুমন্তের নরম নিশ্বাস। আঙুরগুচ্ছের পাশে শুয়ে থাকা হরিণীর চিত্রে ভোগআশ্লেষ থেকে সৌন্দর্যের অনুভূতি এসেছে I-এর ব্যবহারে। সবচেয়ে মজার, শেষ লাইনে জেগে থাকার কথা দু'বার কেন লিখেছেন? কারণ, জেগে থাকা অর্থাৎ veille-এ শব্দের v অক্ষরের যে গঠন, এই অক্ষরটি যেরকম দেখতে, এর মধ্যের ত্রিকোণ শূন্যতা নগ্ন শরীরের ত্রিকোণের কথা মনে পড়ায়। ইংরিজি অনুবাদেও এ অনুভাব আসতে পারে না, কারণ awake আর বাংলায় জাগা! 'জ' দেখলে এরকম সুন্দর ছবি মনে পড়া অসম্ভব, 'জ'-কে দেখতেই কীরকম জ্যাঠামশাইয়ের মতো!]

পল ক্লোদেল

[ক্লোদেলের লেখা কবিতাধর্মী নাটকগুলি পৃথিবীর যেকোনও ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কবি হিসাবেও তিনি অত্যন্ত বড়, ক্ষমতাবান, বিশুদ্ধ কবিতার বাহক, কিন্তু সব সময় শ্রদ্ধেয় নন। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন উগ্র ধার্মিক, ধর্ম তাঁকে বিনয় শেখায়নি, শেখায়নি পরধর্মসহিষ্ণুতা। যদিও তিনি বলতেন, ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন র‍্যাঁবোর কবিতা পড়ে—সেই দুর্দান্ত, বিবেকহীন, ঈশ্বরহীন, বিদ্রোহী বালক কবি র‍্যাঁবো।

জন্ম ১৮৬৮, দীর্ঘজীবনের অধিকারী হয়েছিলেন, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হিসেবে বহুদিন কাটিয়েছেন চিন দেশ ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছুদিন ছিলেন চিনে ফরাসি দেশের রাজ-প্রতিনিধি, সেই সময়কার উপলব্ধিপ্রসূত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমার জানা প্রাচ্যদেশ'। মূলত ধর্মবিশ্বাসের জন্যই, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধার বদলে অশ্রদ্ধেয় উক্তিই তাঁর বেশি। ৮৭ বছর বেঁচে বিশাল চেহারায় তিনি ফরাসি সাহিত্যের বুক জুড়ে ছিলেন, মৃত্যু ১৯৫৫। এ শতাব্দীর ইওরোপের অধিকাংশ কবিই খ্রিস্টধর্মকে অবহেলা ও ঈশ্বরকে খুন করেছেন, আর পৃথিবীর সব দেশের কবিরা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকের আলাদা ব্যক্তিগত ঈশ্বর, সেখানে পল ক্লোদেলের প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামি এবং ঈশ্বরের প্রতি সরল ও দ্বিধাহীন বন্দনাই বৈশিষ্ট্য। সত্যিকারের মহৎ কবিত্বের অধিকারী হিসেবে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন প্রভূত, কিন্তু সকলের ভালোবাসা পাননি।]

সারমর্ম

কবির মনে আছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এবং কবি তাঁকে
কৃতজ্ঞতা জানাবার বন্দনায় কণ্ঠ তোলে। কারণ, তুমিই আমাকে
মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করেছ। বাস্তবের পবিত্রতা ও ঐশ্বর্য-কার্যকারিতার
চমকপ্রদ দৃশ্য দেখায়; সবই প্রয়োজনীয়। কবি চায়, তাকে
ভৃত্যদের মধ্যে স্থান দেওয়া হোক। কারণ, তুমি আমাকে
মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছ। নিষ্প্রাণ ও ঘাতক দর্শনের বীভৎসতা ও
অভিশাপময়তা (থেকে মুক্ত করেছ)। কবিত্বের দায়িত্ব সর্বভূতে
ঈশ্বর সন্ধান এবং তাদের প্রকাশ, যেন সবকিছুই ভালোবাসায়
মিশে যায়। বিরতি। সৃষ্টিজনিত ক্লান্তি। দৈব ইচ্ছা ও দৈব সমতার
কাছে অপাপ ও সরল আত্মসমর্পণ। পুণ্য আমার ঈশ্বর,
যিনি আমাকে আমার আমি থেকে মুক্ত করেছেন, এবং তুমি—
তুমিই স্বয়ংসম্পূর্ণ— আমার বাহুতে এই সদ্যোজাত শিশুর বেশে এসেছ।
ঈশ্বরকে বুকে করে, কবি প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করে।

মিশ্রণ

এবং আবার আমি ফিরে এলাম উদাসীন তরল সমুদ্রে।
আমার মৃত্যুর পর আমাকে আর যন্ত্রণা সইতে হবে না।
পিতা ও মাতার মধ্যে কবরে যখন শুয়ে থাকব, আমাকে
আর যন্ত্রণা সইতে হবে না।
এই অতিরিক্ত ভালোবাসাময় হৃদয় আর বিদ্ধ হবে না বিদ্রূপে।
শরীরের দীক্ষা আমার মিশে যাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, কিন্তু আত্মা
তীব্রতম কান্নার মতো বিশ্রাম নেবে আব্রাহামের বুকে।
এখন সবকিছুই মেশা, বৃথাই আমি ভারী এক চক্ষে খুঁজি আমার
চারপাশের সেই চেনা দেশ, আমার পদক্ষেপের নীচে নিশ্চিত পথ
এবং সেই নিষ্ঠুর মুখ।
আকাশ কুয়াশা ছাড়া কিছুই না, শূন্যতা শুধু জল
দেখো, সবই এখন মিশ্রিত, তবু আমি চারপাশে খুঁজি রেখা ও আঙ্গিক।
দিগন্তের জন্যও কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার রঙের অবশেষ

সব দ্রব্য মিলিত হয়েছে এক জলে, যে জল আমি অনুভব করি
আমার চিবুকে গড়ানো অশ্রুর ধারায়
এর স্বর ঘুমের মতন, যখন নিশ্বাস নেয় আমাদের ভিতরের বধিরতম আশায়
এখন সন্ধান বৃথা, নিজের বাহিরে আমি কিছুই দেখি না।
না আমার সেই দেশ, না আমার অতিপ্রিয় সেই মুখচ্ছবি।

[ক্লোদেলের অধিকাংশ কবিতাই গদ্যছন্দে, এবং এই গদ্যে আশ্চর্য ধ্বনিমাধুর্যের ব্যবহার। প্রথম রচনাটি সম্পূর্ণ কবিতা নয়। 'ম্যাগনিফিকাত' নামক দীর্ঘ কবিতার মুখবন্ধ। 'ম্যাগনিফিকাত' শব্দটি ধর্মীয়, বাইবেলে লুক লিখিত অংশে কুমারী মেরির গান, যেখানে তিনি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁর সৌভাগ্যের জন্য। ক্লোদেলের কবিতাটিও অনুরূপ বিষয়ে। এখানে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন— ১৯০৭ সালে চিন দেশে তাঁর নিজের মেয়ে মেরির জন্ম উপলক্ষে। এই খণ্ড কবিতাটির শেষে 'সদ্যোজাত শিশুর' প্রসঙ্গ এসেছে ওই কারণেই। এই সঙ্গে কবি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ঈশ্বরকে, তাঁর নিজের ধর্মান্তরের জন্য, যে খ্রিস্ট সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য জন্মেছিলেন, তিনি কবিকেও উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয় কবিতাটি, 'আমার জানা প্রাচ্যদেশ' গ্রন্থের শেষ রচনা ১৯০০-১৯০৫, এই সময়ে ক্লোদেলের ধর্মবিশ্বাস খানিকটা টলে উঠেছিল, একটা অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন—যার ফলে তাঁর ধর্ম, সম্মান, এমনকী চাকরি নিয়েও খানিকটা টানাটানি পড়ে। তিনি নিজেই পরে এই সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পারতেজ দ্য মিডি' নাটকে। মূল কবিতার প্রতিটি শব্দই প্রায় কান্না-ভরা। সাময়িকভাবে চিন দেশ ছেড়ে যাওয়া ও ব্যর্থ প্রেম, এ দুটি বিষয় মনে রাখলে কবিতাটি বুঝতে অসুবিধে হয় না।]

সাঁ-ঝঁ প্যার্স

[ব্রেতোঁ তাঁর সুররিয়ালিস্টদের নামের তালিকায় যদিও বলেছেন, 'সাঁ-ঝঁ প্যার্স দূর থেকে সুররিয়ালিস্ট' কিন্তু প্যার্স-কে সুররিয়ালিস্ট বলা বড়ই কষ্টকল্পনা। তাঁর জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম তাঁর ফরাসি দেশ থেকে এক দূরতর দ্বীপে, অভিজাত পরিবারে, ১৮৮৭। আসল নাম আলেক্সি লেজে। ফরাসি ভাষার এরকম একজন সার্থকতম কবি, দীর্ঘ সময়ই কেটেছে ফরাসি দেশের বাইরে। ১৯৪০-এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র দুটি চটি বই, বন্ধুবান্ধব ও কিছু ঘনিষ্ঠ পাঠকের বাইরে, তাঁর নাম ছিল অপরিচিত। ১৯১৪-তে কূটনৈতিক দপ্তরে চাকরি নিয়ে ক্লোদেলের মতো বহুদিন কাটান চিন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে। তারপর ফরাসি সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে স্থায়ী সেক্রেটারি হয়েছিলেন। নাৎসীবাদের প্রবল বিদ্বেষী প্যার্স, ১৯৪০-এ জার্মানির ফরাসি দেশ অধিকার ও ক্রীড়নক ভিসি-সরকার গঠনে অত্যাচারের ভয়ে ও কিছু সংখ্যক দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানিতে ভগ্নহৃদয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে এলেন আমেরিকার ওয়াশিংটনে। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। ওভিদের সময় থেকে

শুরু হয়েছে যে নির্বাসিত লেখকের দল, প্যার্সও তাদের একজন। এরপর নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পর পর কবিতার বইগুলি দ্বি-ভাষা সংস্করণে প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁকে পৌঁছে দেয় খ্যাতির উচ্চ শিখরে। ১৯৬০-এ নোবেল প্রাইজ। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের চাপা, গুমোট বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে রইলেন তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে। প্যার্সের দৃঢ়শৈলী গদ্য র‍্যাঁবো, মালার্মে, ক্লোদেলের ধারার সার্থকতার পরিণতি। ঈশ্বর, দৈবশক্তি, প্রকৃতি, পবিত্র কুমারীর প্রতি স্তোত্র, বন্দনা, সামগানের যে রীতি উজ্জীবিত করেছিলেন ক্লোদেল, প্যার্সও সেই রীতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্যার্সের প্রকৃতির মধ্যে কোথাও ঈশ্বর বা দৈবশক্তির উল্লেখ নেই, তাঁর চোখে দেখা জগতের তিনিই স্রষ্টা, প্রকৃতির উদ্ভাসন তাঁর বর্ণনায় পৃথক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। তাঁর গ্রন্থগুলির নামও এইরকম সহজ, 'বৃষ্টি' (১৯৪৩), 'তুষার' (১৯৪৪), 'বায়ু' (১৯৪৬) ইত্যাদি।

সুররিয়ালিস্টদের বিপরীত, চলিত শব্দ বা মুখের ভাষা তাঁর কবিতায় প্রায় নেই। তাঁর কবিতা ক্বচিৎ ব্যক্তিগত।]

প্রশস্তি—২

আমার মায়ের দাসীরা, দীর্ঘ, মসৃণ রমণী...এবং আমাদের
উপকথাময় চক্ষুপল্লব...হে
উজ্জ্বলতা! হে করুণা!
প্রত্যেক বস্তুকে আহ্বান করে আমি উচ্চারণ করি সে মহৎ,
প্রত্যেক জন্তুকে বলি সুন্দর এবং দয়াময়।
হে আমার দীর্ঘতম
সর্বভুক ফুলগুলি, রক্তিম পাপড়িদলে আমার সুন্দরতম
সবুজ পতঙ্গদের গ্রাস করতে উৎসুক! বাগানে ফুলের গুচ্ছে
পারিবারিক সমাধির গন্ধ! কনিষ্ঠা বোনটির মৃত্যু হয়েছে:
তিন ঘরের আয়নাগুলির মধ্যে
গন্ধ সমেত তার মেহগনি শবাধার আমার সঙ্গে ছিল।
পাথর ছুড়ে টুনটুনি পাখিদের মারা উচিত নয়...
তবু পৃথিবীর গুঁড়ি মেরে বসে আমাদের খেলার মধ্যে, দাসীর
মতন, যদিও দাসীর অধিকার আছে, পরিবারের সকলে অন্তঃ-
পুরে রইলে, চেয়ারে বসার।

বৃষ্টি—৮

.....বর্ষণের বটবৃক্ষ নগরে ছড়ায় তার বিচারের সভা। স্বর্গের
হাওয়ার প্রতি এই সেই ভ্রাম্যমাণ এরকম
আমাদের মধ্যে বসবাসে আগমন! ...তুমি অস্বীকার করো না;
যারা অকস্মাৎ শূন্য হয়ে আসে আমাদের জন্য.....
যাঁরা জানতে উৎসুক বৃষ্টি পৃথিবীতে এসে শোভাযাত্রা করে
গেলে কি ঘটনা হয়, তাঁরা এসে বাস করুন আমার বাড়ির
ছাদে, চিহ্ন, সংকেতের মধ্যে। অরক্ষিত শপথ! অনলস
বপন মানুষের সৃষ্ট পথের উপরে
ধোঁয়া!
আসুক বিদ্যুৎ, হাঃ! কে আমাদের ত্যাগ করে!.....নগরের
দ্বারে দ্বারে আমরা ফের নীত হব
এপ্রিলের নীচে দীর্ঘকায় বৃষ্টি হেঁটে যায়, চাবুকের নীচে
দীর্ঘকায় বৃষ্টি ছোটে, যেন নিজ পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত অনুষ্ঠান।

[প্রথম কবিতার দাসী, সম্ভবত হিন্দু রমণী। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস চালান গত শতাব্দীতে বন্ধ হয়ে গেলেও এশিয়া থেকে গোপনে দাস-দাসী রপ্তানি অব্যাহত ছিল। প্যার্সের পৈতৃক দ্বীপভবনে এইরকম কয়েকজন দাস-দাসী ছিল; কোনও কোনও ভাষ্যকার এ কবিতায় যে দাসীর উল্লেখ, তাকে হিন্দুই বলেছেন। ভারতীয়দের লৌহবর্ণ শরীর ফরাসিদের চোখে বড় প্রিয়, কক্‌তো-র কবিতায় এর চমৎকার উল্লেখ আছে। এ কবিতার দাসী পৃথিবীর উপমেয়। প্যার্সের কবিতা সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর তুলনা আছে। নিজের কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিষমভাবে অনুপস্থিত। এ যেন কোনও মন্দিরের পুরোহিত দেবতাকে পূজা করছেন, পাশেই নানা সুন্দর, মহার্ঘ দ্রব্য পূজার অর্ঘ্য হিসেবে সাজানো। পুরোহিত সবই উৎসর্গ করছেন দেবতাকে, নিজেকে কিছুই না। প্যার্সও তাঁর কবিতার ও প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর উপাদান উৎসর্গ করছেন মানুষকে বা অদেখা পাঠককে। নিজের জন্য কিছু রাখলেন না। 'বৃষ্টি' কবিতার 'তুমি' সেই পাঠক।

'বৃষ্টি—৮' একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। প্যার্স একবার কৌতুক করে নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার সমস্ত কবিতা আসলে একটি মাত্র দীর্ঘ বাক্য, বিরতিহীন এবং চিরকালের জন্য দুর্বোধ্য।' সেই হিসাবে তাঁর যেকোনও কবিতাই অংশ-কবিতা। এই কবিতা বৃষ্টির বর্ণনা, ঠিক আবার বৃষ্টিও না বোধহয়। যুদ্ধের সময়ে নির্বাসিত কবির হতাশা ও তিক্ততা, পরিপার্শ্বের মানুষ তাঁকে ভুল বুঝছে, কবি দূর থেকে দেখছেন ইওরোপের ধ্বংস ও পরিবর্তন, এখানে বৃষ্টির অন্য ভূমিকা আছে। কয়েকটি শব্দের আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

'বটবৃক্ষ' আমার রূপান্তর নয়, মূল কবিতায় ব্যবহৃত। যে বটগাছ নানান শিকড় ছড়ায়। 'বিচারের সভা' কথাটি বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। মূল শব্দের ব্যবহার পরিমিত অর্থে। assise,

ইংরেজি assizes— ইংল্যান্ডের ছোট ছোট শহরে নানান অপরাধের মধ্যযুগীয় বিচার অনুষ্ঠান। কদাচার ও পাপে পূর্ণ পৃথিবীর উপর শেষ বিচারের ঘোষণার ইঙ্গিত আছে এখানে।

শেষ লাইনের বেত্রাঘাত অনুষ্ঠানের মূল শব্দ Flagellants-এর তুলনীয় শব্দ বাংলায় নেই। অর্ডার অব ফ্লাজেলান্টস— মধ্যযুগের একরকম ধর্মীয় আচার। আত্মশুদ্ধির জন্য সাধক নিজের পিঠে নিজেই বেত মারতেন, অথবা লোক ভাড়া করতেন নিজের পিঠে চাবুক খাবার জন্য।]

ব্লেইজ স্যাঁদরার

[আপোলিনেয়ার থেকে যে আধুনিকতার শুরু ফরাসি সাহিত্যে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু সমসাময়িক আর তিনজন প্রবল শক্তিমান কবি ছিলেন। ভালেরি, ক্লোদেল এবং পেগি। শেষোক্তজন, অর্থাৎ শার্ল পেগির কবিতা আর আমরা এখানে অনুবাদ করলুম না। কারণ, পেগির কাব্যমূল্য এখনকার চোখে কিছুটা নিষ্প্রভ, তিনিও ছিলেন ক্লোদেলের মতো ক্যাথলিক, এবং মূলত ফরাসি দেশাত্মবোধের জনপ্রিয় কবি, সুতরাং এখন আমাদের কাছে উপভোগের আকর্ষণ কম।

আপোলিনেয়ারের বন্ধুবান্ধব, সমসাময়িক কবি এবং যাঁদের মধ্যে সুররিয়ালিজমের অঙ্কুর প্রথম উঁকি মারে, তাঁদের মধ্য থেকে আমি ব্লেইজ স্যাঁদরারকে বেছে নিলাম। এই দলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি আলফ্রেড জারি, মাক্স জাকব এবং লেয়ঁ-পল ফার্গ। জারির কবিতার চেয়ে নাটক বেশি সার্থক, বিশেষত তাঁর 'উবু রাজা' এই শতাব্দীর সত্যিকারের প্রথম উদ্ভট, আজগুবি, বিদ্রূপ-ঝকঝকে নাটক যা পরবর্তীকালের আধুনিক নাট্যকারদের প্রভূত প্রভাবিত করেছে। যদিও নাটকটি এই শতাব্দী শুরু হবার কিছু আগে লেখা। রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছটের হবুচন্দ্র রাজার সঙ্গে 'উবু রাজা'র খুব মিল আছে। মাক্স জাকব এবং লেয়ঁ-পল ফার্গের কবিতায় যে দানা ছিল তারই সবিস্তার রূপবান প্রকাশ আছে আপোলিনেয়ারের কবিতায়, ফলে পরবর্তী যুগে ওঁরা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছেন। এখন ওঁরা টিকে আছেন সংকলন-গ্রন্থে। বাংলায় মাক্স জাকবের কবিতার অনুবাদ করেছেন কবিতা সিংহ ও উৎপলকুমার বসু। ব্লেইজ স্যাঁদরার বাংলায় কিছুটা অপরিচিত কিন্তু ফরাসি কবিতার ইতিহাসে ওঁর অবদান মূল্যবান।

জন্ম ১৮৮৭, প্যারিসে, খাঁটি ফরাসি নন। বহু দেশ ঘুরেছেন, বহুরকম কাজ করেছেন, এমনকী মণি-মুক্তোর সেলসম্যানগিরি পর্যন্ত। ভ্রমণ-কবিতাগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ। প্রথম মহাযুদ্ধে ডান হাতটা কাটা যায়, বাঁ হাত দিয়ে টাইপ করে করে লিখতেন। বহু অনুবাদের কাজ করেছেন। নিগ্রোদের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব ঝোঁক ছিল। মৃত্যু ১৯৬১-তে।]

সূর্যাস্ত

সকলেরই মুখে সূর্যাস্তের কথা
পৃথিবীর এ অঞ্চলে সব পর্যটকরাই সূর্যাস্ত বিষয়ে
কথা বলতে একমত
এমন অসংখ্য বই আছে, যাতে শুধু সূর্যাস্তেরই বর্ণনা
গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যাস্ত
হ্যাঁ, সত্যিই, ভারী চমৎকার
কিন্তু আমি বেশি ভালোবাসি সূর্যোদয়
ভোর
আমি একটি প্রত্যুষও হারাই না
আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকি
নগ্ন
আমি একা সূর্যোদয়ের বন্দনা করি
কিন্তু আমি সূর্যোদয়ের বর্ণনা করিতে চাই না
আমি আমার ভোরগুলি নিজের জন্যই রেখে দেব।

জ্যোৎস্না

নাচি আমরা ট্যাঙ্গো নাচি জাহাজে
চাঁদ এঁকেছে চাঁদের বৃত্ত জলে
আর আকাশে বৃত্ত আঁকে মাস্তুল
আঙুল তুলে দেখায় দূরে তারার দঙ্গল

রেলিং ধরে ঝুঁকে রয়েছে নবীনা এক আর্জেন্টিন-বালা
ফরাসি উপকূলের আলো মালার দিকে তাকিয়ে এখন
স্বপ্ন দেখে প্যারিসের
অল্প চেনা প্যারিস তার অনুতাপের প্যারিস
জাহাজ থেকে ঘুরছে আলো দু'রঙা আলো, আলো এবং গ্রহণ
মনে পড়ায় বড় রাস্তায় হোটেল ঘরের জানলা থেকে দেখা
ওরা সবাই ফিরে আসবে শপথ করেছিল

ঐ যুবতী স্বপ্ন দেখছে আবার দ্রুত ফিরে আসবে প্যারিসে
থেকে যাবে
আমার টাইপ রাইটারের শব্দ ওঠে শব্দ ওকে স্বপ্ন শেষ করতে
দেয় না
আমার এই চমৎকার টাইপ রাইটার প্রতি লাইনের শেষে কেমন
টুং শব্দে বেজে ওঠে
আর কেমন দ্রুত ছোটে যেমন ঠিক জ্যাজ সংগীত
আমার এই চমৎকার টাইপ রাইটার আমায় কোনও স্বপ্ন
দেখতে সুযোগ দেয় না
না ওদিকের বন্দরের না বিপরীত জাহাজ মুখের
অনুসরণে বাধ্য করে শেষ অবধি এক চিন্তার
আমার চিন্তা

[অধিকাংশ পথিকৃৎকেই শেষ পর্যন্ত যে দুর্ভাগ্য সইতে হয়, স্যাঁদরারকেও তা সইতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় যা কিছু নতুন এবং মৌলিক, যেমন কবিতায় গদ্যধর্ম, যতিচিহ্নহীন চেতনাপ্রবাহ, ফটোগ্রাফের মতো বর্ণনা (সেটা ছিল চলচ্চিত্রের আদি যুগ, সুতরাং কবিতা চলচ্চিত্রকে বা চলচ্চিত্র কবিতাকে খুব অভিভূত করেছিল)— এই সমস্ত রীতি পরবর্তী বহু কবি এবং অনেক বেশি শক্তিমান কবিরা আরও এমন সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন যে, প্রথম ব্যবহারকের কথা আর আমাদের মনে থাকে না বা পড়তে ক্লান্তিকর লাগে। কিন্তু এঁদের থেকেই শুরু হয়েছিল এই নতুন ধারা, কবিতাকে অতিশয় ব্যক্তিগত করে তোলা, বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে কবি নিজে সব সময় উপস্থিত, বা কোনও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাৎক্ষণিক মানসিক প্রতিফলন, পারম্পর্যহীন হলেও সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখা। এসব আমাদের বাংলা কবিতাতেও এত ব্যবহৃত হয়েছে যে, এখন আর এরকমের কবিতা নতুন মনে হবার সুযোগ নেই, তা ছাড়া স্যাঁদরারের কবিত্ব খুব বেশি কালোত্তীর্ণ হবার মতো গর্ভবতী নয়। সুতরাং, এ কবিতা পড়ার সময় ৪০/৪৫ বছর আগের ইতিহাস মনে রাখা দরকার।

অনুবাদের আরেকটি অসুবিধে এবার বোধ করলুম। আমরা মুখের কথায়, লেখায় অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু কবিতা অনুবাদের সময় প্রতিটি শব্দই বাংলা করার দিকে আমাদের ঝোঁক। কিন্তু অনেক শব্দের যে বাংলাই নেই। (যেমন অনেক বাংলা শব্দের ইংরেজি হয় না।) দ্বিতীয় কবিতার মূল শেষ লাইন, 'মনিদে'-এর বাংলা 'আমার চিন্তা' একেবারে ভালো শোনায় না। 'আইডিয়া' শব্দের বাংলা কি? ভাবনা বা চিন্তা ঠিক নয়, এ দুটোর মধ্যে যেন একটু দুঃ মেশানো আছে। আবার 'ভাব'ও চলে না— ওটা যেন বেশি গদগদ। 'আমার একটা আইডিয়া মনে এসেছে'— এর বদলে 'আমার মনে একটা ভাব এসেছে' একেবারে অসম্ভব। আইডিয়ার এক কথায় বাংলা, অভিধানে দেখলুম, চিচ্ছবি। কিন্তু এ শব্দটা চলবে কি? নাঃ!]

পিয়ের রেভার্দি

[১৯৫০-এর পর ফরাসি দেশের তরুণ লেখকরা যখন নিউ নভেল আন্দোলন শুরু করে, তখন কবিতাতেও তারা প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবিদেরও উপস্থিত করে নিজস্ব বিচারালয়ে। কাকে কাকে রাখা হবে দলনেতা হিসেবে, কে কে গণ্য হবেন সার্থক পূর্বসূরী হিসেবে, কোন কোন কবির ওপর পড়বে বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্যের খড়্গাঘাত, কার রচনায় তরুণদের সত্যিকারের আনন্দ। অধিকাংশ প্রবীণ সুররিয়ালিস্ট কবি তখন প্রাক্তন গুরু হিসেবে গণ্য, আবার ঈষৎ বিস্মৃত কয়েকজন কবির নামও প্রবলভাবে ফিরে এল নবীন লেখকদের কাছে। এই সময় আবার উচ্চকিত হয়ে উঠল পিয়ের রেভার্দির নাম, তরুণরা তাঁর কবিতার সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা বোধ করল, অথচ রেভার্দি তখন নির্জন মঠে স্বেচ্ছানির্বাসনে।

পিয়ের রেভার্দির জন্ম ১৮৮৯-এ দক্ষিণ ফ্রান্সের এক সাধারণ পরিবারে। একুশ বছর বয়সে প্যারিসে এলেন খবরের কাগজে প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়ে। এই সময় প্যারিসে আলফ্রেড জারি, মাক্স জাকব, আপোলিনেয়ার এবং কিউবিস্ট শিল্পীরা সাহিত্য, শিল্প, থিয়েটার নিয়ে প্রবল উন্মাদনায় মেতে আছেন। রেভার্দি সহজেই আবিষ্কার করলেন ওঁদের স্বজাতি হিসেবে। তিনি ওঁদের দলে মিশে গেলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরই আরম্ভ হল প্রথম মহাযুদ্ধ। আপোলিনেয়ারের সঙ্গে তিনিও যুদ্ধে যোগ দিলেন। দু'জনেই ফিরে এলেন ১৯১৭ সালে, আপোলিনেয়ার মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে, রেভার্দি স্বাস্থ্যের কারণে। ওই বছরেই বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নর-সুদ' অর্থাৎ 'উত্তর দক্ষিণ'। এই পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে ডাডাইস্ট ও সুররিয়ালিস্টদের। আপোলিনেয়ারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় রেভার্দি, জাকব, স্যাঁদরার এঁরাই হলেন সুররিয়ালিস্টদের প্রধান অবলম্বন, প্রতিষ্ঠিত সমর্থক।

কিন্তু হঠাৎ চরিত্র বদলে গেল রেভার্দির। বিপ্লবীর ভূমিকা ছেড়ে অকস্মাৎ ১৯২৬-এ তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন, অন্তরীণ হলেন এক খ্রিস্টান মঠে, সেখানেই নির্জন হয়ে রইলেন বাকি জীবন। দীর্ঘ জীবন, ১৯৬০-এ মৃত্যুর আগে আর একবারও বিচলিত হননি।]

ভগ্নহৃদয়

আ-আজ সব চলেছে শেষের দিকে।
দেয়ালে ছড়ায় ঢিমে-লয় সংগীত
মুখে এক হাত
অপর হাতের ছোঁয়ার উলটো পিঠটুকু নেই
জানলা গলিয়ে পালায় নগ্ন প্রেম
মনোরম ছবি
একটি রমণী পরেছে ছিন্ন সেমিজ

বেশ তো ভঙ্গি এ মহৎ কামনার
কেঁদে কেঁদে সেই রমণীটি যায় আকাশের দিকে
যে আকাশ তাকে ডাকে
জল ও কঠিন বৃক্ষের দল
বেহালার সুর ছাড়া প্রণয়ের নিরাশা
যাই হোক তবু ফাঁদ পাতা আছে গোপন
চৌরাস্তায় ভারী অর্গ্যান একটি গ্রীষ্ম সন্ধ্যা
তোমার বিষাদ করেছে অর্থময়
হালকা দুঃখ
কিছুই থাকে না
বন্ধুরা সব মৃত
স্ত্রীলোকেরা তবু নিজের গরজে তাদের দেখতে যায়
তুমি এসেছ এ খেলায় একটি অশুভ চিহ্ন নিয়ে
কি তোমার সাধ ভদ্র মানুষ অথবা দস্যু হওয়া
কোনও কিছু নয়
আমরা চামড়া লুকিয়ে রেখেছি পোশাকের নীচে ভাঁজে
স্রোত বয়ে যায় যে স্রোত বয়েই যাবে
আমার হাসিও মিশিয়েছি তার সঙ্গে
ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তোমার যুক্তির দিকে দেখি
পৃথিবী কি খুশি হাসছে পৃথিবী তোমারও হাস্য
এক রাত্তিরে আমি হারালাম আমার বয়েস শৈশব নাম

[যদিও সুররিয়ালিস্ট দলের সমর্থক ছিলেন, মেতে উঠেছিলেন নতুন রীতির আন্দোলনে, কিন্তু রেভার্দির কবিতার চরিত্র অন্যরকম, তাঁর সমসাময়িকদের সুরের সঙ্গে মেলে না। সুররিয়ালিস্টদের মতে, এই বাস্তব জীবনটাই আসলে বাজে, কোনও মানে হয় না, অবান্তর, বরং স্বপ্নের জীবন ও মগ্ন চৈতন্যই সত্য, অতি বাস্তব। সুতরাং শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ জীবন-যাপন বদলে দেওয়া। রেভার্দি নিজের কবিতায় এ মত মানেননি, বরং বিপরীত। তাঁর মতে, কবিতার কাজ হল, যে জীবন তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতেই চূড়ান্তভাবে বেঁচে থাকা, স্বপ্ন ও বাস্তব যে সূক্ষ্ম সীমায় এসে মিশেছে সেখানে দাঁড়ানো, অপসৃয়মাণ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখা, যেখানে বাস্তব কখনও কখনও হয়ে ওঠে পরম সত্য। এই নির্দিষ্ট বাস্তব জীবনকে চূড়ান্তভাবে বাঁচার ধারণাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কবিদের নতুন করে প্রেরণা দিয়েছে। রেভার্দি তাঁর কবিতায় কখনও কখনও কমা ফুলস্টপ দিতেন, কখনও দিতেন না। 'ভগ্নহৃদয়' কবিতাটিতে নেই। অনুবাদ করার সময় আমি যোগ করে দেব কিনা ভাবনায় পড়েছিলাম। তাঁর ইমেজগুলো টুকরো টুকরো, লাইনগুলি যোগাযোগহীন। কবিতায় আমরা যেরকম মানে খুঁজতে চাই, সেরকম অর্থ প্রতি লাইনে নেই। কিন্তু সমগ্র কবিতা উজ্জ্বল অর্থময়। যেন, একটি নামহীন মানুষ, একটি উদ্বিগ্ন আত্মা এই টুকরো ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে দেখছে

পৃথিবীকে। মাঝে মাঝে এক একটা লাইন হঠাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, যেন কবি কোনও বিরাট রহস্য উন্মোচন করতে চলেছেন। কিন্তু সে রহস্য আর ধরা পড়ে না, কবির চোখ আটকে দেয় এক অদৃশ্য পরদা, আবার কবিকে ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে খুঁজতে হয়। রেভার্দির সমগ্র কবিতায় বিধৃত হয়েছে মানুষের ভাগ্যের দুঃখ। এইরকম তাৎক্ষণিক অনুভূতির ছোট ছোট ছবিতে গেঁথে তোলা কবিতার নাম রেভার্দি দিয়েছিলেন, 'পোয়েজি ব্রুত'— অর্থাৎ কর্কশ কবিতা।

এই কবিতায় 'আমি' আর 'তুমি' হয়তো একই ব্যক্তি। শার্ল পেগির কবিতায় যেমন ঈশ্বর এসে পেগির ভাষায় কথা বলতেন, তেমনি রেভার্দিও অনেক সময় নিজেকেই নিজের ভাষায় শাসন করেছেন।]

জাঁ কক্‌তো

[প্যারিসের যতগুলি সৌধ, স্তম্ভ, মিনার, শিল্পকীর্তি আছে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কক্‌তো-ও ছিলেন যেন তার অন্যতম। প্যারিস শহরের বিশেষ দ্রষ্টব্য। ফরাসি নাগরিক বিদগ্ধ পুরুষদের প্রতিমূর্তি। প্যারিসের অদূরে ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম, ১৮৮৯। চরম শৌখিন এবং পরম বেপরোয়া জীবনযাপন করেছেন প্যারিসেই। বদলেয়ার এবং আপোলিনেয়ার যেমন অসংখ্য রচনায় প্রিয়তম প্যারিসকে বারবার সৃষ্টি করেছেন, সেইরকম কক্‌তোও প্যারিসেরই লেখক। যদিও, কক্‌তো-র রচনা বড় বিক্ষিপ্ত, অপরিপূর্ণ।

বহু মুখে ছড়িয়েছিলেন কক্‌তো নিজের প্রতিভা। উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিত্রনাট্য। ফরাসি দেশের অধিকাংশ বড় কবিই বড় সজাগ অহংকারী, কবিতা ব্যতীত শিল্পের অন্যান্য শাখায় সহসা কার্যকারীভাবে প্রবেশ করতে চান না। কক্‌তো করেছিলেন, বহু জটিল শাখায়, ফলে ওঁর কবিতার ক্ষতি হয়েছে নিশ্চিত। ফিল্‌ম তোলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন নিজে, এমনকী অভিনয় পর্যন্ত। নাটকই শেষ পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল, বহু পরীক্ষা করেছেন, পুরাণ মহাকাব্যের পুনরুত্থান, মধ্যযুগীয় প্রেম-কাহিনীর আধুনিক রূপ, মাত্র একটি চরিত্রের নাটক— ইত্যাদি।

অর্ধশতাব্দীর প্রত্যেকটি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে ভয়ংকরভাবে যুক্ত ছিলেন। কিউবিজম, ডাডাইজম, সুররিয়ালিজম— সব ক'টি পরপর পেরিয়ে এসেছেন— প্রখ্যাত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ছিলেন পিকাসো। ক্ষীণ, স্পর্শকাতর স্বাস্থ্য, তবু শরীরে গাঁজা, আফিং ও অন্যান্য মাদক সেবনের পরীক্ষা করেছেন। যৌবনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল প্রতিভাবান, অকাল মৃত লেখক রাদিগে-র সঙ্গে। কক্‌তো পুরুষ-প্রেমের উপরেও বিশেষ জোর দিতেন।

১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে, তাঁর মৃত্যু প্যারিস শহরে যেন ইন্দ্রপাত ঘটিয়েছিল। রূপকথার মতো সেই মৃত্যু। কক্‌তো-র আন্তরিক বান্ধবী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এদিথ্ পিয়াফ্— সেই এদিথ্ পিয়াফ্— যাঁর জন্ম পথের ভিখারিণী হিসেবে, ক্রমে ভবঘুরে, চোর,

খুনে ও বারবনিতাদের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত যিনি উঠেছিলেন সমাজের শীর্ষে। কক্‌তো আর পিয়াফ্‌ পরস্পরের গুণমুগ্ধ। দু'জনেই অসুস্থ— বারবার কক্‌তো ভৃত্যকে পাঠাচ্ছেন এদিথ্‌ কেমন আছে জেনে আসতে। একই দিনে, প্রায় এক সঙ্গেই দু'জনের মৃত্যু।]

দুপুর

নাবিক, এখন দারু দেবদূত, ডানার আঘাতে
আফ্রোদিতির অস্ট্রিচ পাখি, হীরকের হার,
শান্ত সাগর থেকে নিয়ে আসে তোমার জন্য তটের প্রান্তে
বিশ্বাসী ঢেউ, মুক্তাখচিত টমটমে জোড়া ক্লান্ত অশ্ব।

ভগ্ন জাহাজ, টিনের কৌটো, নোঙর, বরগা, মাস্তুল, আর
জেলিমাছ, নীচে জলের ভিতরে রাজধানী, তার বড় রাস্তার
জানালার থেকে তাকানো দৃষ্টি; পরে সমুদ্র
ফিরে যায় ফের, নিজের মুখের লালা শুষে নিয়ে—।
আমি খুলে ফেলি পোশাক ও টুপি নেই মুহূর্তে
বালির উপরে উলঙ্গ দেহে চিত হয়ে শুই
বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নীচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়।

আনাড়ি পরীরা

আনাড়ি পরীরা তোমাদেরই অনুকরণ করেছে, হে পারাবত।
তোমরা মেরির বন্দনা গাও। ওরা সাস্ত্রীর মঞ্চে
পাহারা দিচ্ছে ফরাসি রাজ্য। হায়! তবুও তো আমরা নিরাশ করেছি ওদের।

সারা রাত জেগে আকাশ তুলেছে রাশি রাশি জুঁই:
শেষ ফুলটিও তোলা হলে, ওরা খোলে জানালার ঝিল্লি।

এসেছে শরৎ, পরী ঝরানোর দিন এল আজ
দুধের ভাণ্ড থেকে গড়ানোর মতো পরীদের এই ঝরে যাওয়া।

সোনালি বৃক্ষ অপেরায় বহু কমলালেবুর ফসল ফলেছে
শীর্ষদেশের কমলার প্রতি জনসাধারণ বড় উৎসুক
কারণ নীচের কমলার স্বাদ, ওদের সবারই মুখে বিস্বাদ।

দশ লাইনের এই কবিতাটি খুব সুন্দর নাকি কুৎসিত?
কুৎসিতও নয় সুন্দরও নয়, অন্যরকম গুণ আছে ওর।

[কক্‌তো-র কবিতায় প্রাচীন কাব্যের গন্ধ ও বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে আধুনিকতা। কবিতার বহিরঙ্গ সজ্জায় অস্বাভাবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি, কখনও কখনও নিখুঁত গঠনের কবিতায় যুক্ত হয়েছে তাঁর ডাডাইস্টদের ধরনে বিদ্রূপময় দৃষ্টিভঙ্গি। এসব সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁর লেখা সম্পর্কে মনে হয় সার্থকভাবে রচিত অপ্রধান কবিতা। কবিতা সম্পর্কে কক্‌তো-র বিখ্যাত উক্তি: শ্রেষ্ঠতম রচনাও বর্ণমালার বিশৃঙ্খলতা ছাড়া, আর বেশি কিছু না। প্রথম কবিতাটি ইমপ্রেশানিস্টদের ধরনের রচনা। মাঝির কথা বলেই পরমুহূর্তে সে হয়ে গেল কাঠের তৈরি দেবদূত— দেবদূত ও পরী কক্‌তো-র অতি প্রিয় বিষয়— সেই দেবদূত ডানার আলোড়নে নিয়ে এল আফ্রেদিতিকে। রোমানদের যেমন ভিনাস, গ্রিকদের সেই প্রেমের দেবী আফ্রেদিতি— সমুদ্রের ফেনা থেকে যাঁর জন্ম— যদিও কক্‌তো-র সমুদ্রে, ঢেউ একটু পরেই হয়ে গেল মুখে ফেনা মাখা টমটম বা জুড়িগাড়ির ঘোড়া। সমুদ্র থেকে যেমন উঠে এলেন আফ্রেদিতি— সেইরকমই প্রখর সূর্যের আলোর নীচে কবির চামড়া থেকে বেরিয়ে আসে এক গাঢ় রঙের ভারতীয়।]

পল এলুয়ার

[বলা যায়, ১৯২০ সাল থেকেই একরকম, পশ্চিমের সাহিত্য থেকে নারীর নির্বাসন হয়ে গেছে। নারীর বন্দনা, স্তুতি, সজ্জা—এতকাল ছিল যেকোনও সাহিত্য সৃষ্টির প্রাণ, যেদিন থেকে লেখকরা মুখ ফিরিয়ে নিলেন, নারী ক্রমশ অবহেলিতা, অনাদৃতা হতে হতে অস্তিত্বহীনা হবার উপক্রম। মালার্মে বা ভালেরি কোনও মেয়েকে ভালোবাসা নিয়ে প্রেমের কবিতা লেখা প্রায় হাস্যকর মনে করতেন। ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা, টমাস মান— সাত্র, কামু— হেনরি মিলার, নরমান মেইলার— এঁদের রচনায় কোনও নায়িকা নেই বললেই চলে। নারী চরিত্র আছে নানা প্রয়োজনে, কিন্তু নারী নেই। হায় শ্বেতাঙ্গিনী!

পল এলুয়ার তাঁর অপর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—ব্রেতোঁ ও আরাগঁ-র সঙ্গে মিলে প্রায় যুদ্ধে নেমেছিলেন নারীর লুপ্ত মহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য। সুররিয়ালিস্টদের আদি ও প্রবল সমর্থক এলুয়ার বললেন, নারীই রহস্যের সিন্ধু। পৃথিবীর সব রহস্যেরই উন্মোচনের চেষ্টা করা যায় নারীর শরীরে ও ভালোবাসায়। এলুয়ার রমণীর বন্দনা করেছেন নির্লজ্জ, দ্বিধাহীন, সরল, আত্মার স্পষ্ট ভাষায়। পেত্রার্কের সময় থেকে শুরু হয়েছে যে প্রেয়সী বন্দনা, এলুয়ার যেন সেই ধারারই আধুনিক পূজারি। এবং তাঁর সার্থক সঙ্গী লুই আরাগঁ।

পল এলুয়ারের জন্ম ১৮৯৫, (কোনও কোনও বইতে দেখছি ১৮৯৭, আমার পক্ষে ঠিক করা সম্ভব নয়। তাঁর নামটিও যে ছদ্মনাম, এ তথ্যও সুপরিচিত নয়। ইউজিন গ্রাঁদেল নামের লোকটি যে কেন স্বনাম ত্যাগ করে সারা জীবন পল এলুয়ার নামেই লিখেছেন জানতে পারিনি।) ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানান ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে চাইতেন। নির্জন ঘরে নিজের মুখোমুখি হওয়া নয়, এলুয়ার চেয়েছেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে। কৈশোরে ফুসফুসের অসুখ হয়, তারপর প্রথম মহাযুদ্ধে আক্রান্ত হন বিষাক্ত গ্যাসে। তবু বেঁচে উঠে, নিজের মধ্যে বোধ করলেন একটা পরম ছটফটানি, নির্দিষ্ট নিয়মহীনতা। সেই টানে যোগ দিলেন ডাডাইস্টদের আন্দোলনে, কিছুদিন পর সুররিয়ালিস্টদের দলে, প্রবলভাবে মেতে উঠলেন, তারপর আবার একদিন বিকেলবেলা প্রিয় বন্ধু পিকাসোর কাঁধে হাত দিয়ে গিয়ে দু'জনেই নাম লিখিয়ে এলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। আবার, নাৎসিরা যখন ফরাসি দেশ অধিকার করে, তখন গোপন মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছেন সৈনিক হয়ে। মৃত্যু ১৯৫২।]

প্রেয়সী

সে আছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের পাতায়
তার চুল এসে মিশেছে আমার চুলে
আমার হাতের মতো অঙ্গের গড়ন হয়েছে তার
আমার চোখের মতো তার রং দেখেছি চক্ষু খুলে
তাকে আমি গ্রাস করেছি নিজের ছায়ায়
বিশাল আকাশে যেমন হেলানো পাহাড়।
তার দুই চোখ খোলা সারা দিন রাত
আমায় কিছুতে দেয় না কখনও ঘুমোতে
খাঁটি দিবালোকে স্বপ্ন দেখে সে, স্বপ্নের সংঘাত
এমনকী ওই সূর্যকে দেয় উবিয়ে, যেমন কর্পূর

স্বপ্ন দিয়ে সে হাসায়, কাঁদায়, হাসায়, কথার স্রোতে
টেনে নিয়ে যায়, কিছুই বলার নাই থাক
আমি কথার নেশায় ভরপূর।

ঈষৎ বিকৃত

বিদায় বিষাদ
স্বাগত বিষাদ
তুমি আঁকা আছ দেয়ালের কড়িকাঠে
তুমি আঁকা আছ আমার ভালোবাসার চোখে
তুমি নও সম্পূর্ণ দুঃখ
কেননা দরিদ্রতম ওষ্ঠও তোমাকে
ফিরিয়ে দেয়
একটুকরো হাসিতে

স্বাগত বিষাদ
রমণীয় শরীরের ভালোবাসা
ভালোবাসার তেজ
তার মনোহরণ জেগে ওঠে
অশরীরী দানবের মতো
ব্যর্থকাম মস্তিষ্ক
বিষাদ সুন্দর মুখ

[১৯৪২-এ ফরাসি দেশের মুক্তিযুদ্ধে হাতে বন্দুক নিয়ে অসম সাহসীর মতো যখন লড়াই করেছেন এলুয়ার, দেখেছেন নিজের দেশের অসংখ্য মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তখনও তিনি প্রেমের কবিতায় বিশ্বাস হারাননি। তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি মেয়েকে ভালোবাসাই সব ভালোবাসার প্রথম সোপান, সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম হয় স্বাধীনতা ও পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসার। ভালোবাসা হচ্ছে সেই প্রবল আকর্ষণ যা দুটি নারী-পুরুষকে কাছে আনে, সর্বাঙ্গের রক্ত-মাংসের স্পর্শে জন্ম হয় সত্যিকারের পরিচয়, 'আমি' তখন বদলে 'তুমি' হয়ে যায়। 'তোমাকে ভালোবেসেই আমি পৃথিবীর মানুষের কাছে ফিরে এলাম।'

এলুয়ার যখন মেয়েদের বর্ণনা করেছেন, তাদের চুল, ওষ্ঠ, গ্রীবা, স্তন, জঙ্ঘা— সব কিছুর মধ্যেই একটা আশ্চর্য নম্র কমনীয়তা আছে। কোনও অঙ্গই তাঁর বর্ণনায় পৃথক নয়, নারীর একটি হাতও সম্পূর্ণ নারী। 'রুহিতনের বিবি' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতার এক জায়গায় আছে, 'ভালোবাসাকে ভালোবেসে'— অর্থাৎ সেন্ট অগাস্টিন যেমন বলেছিলেন, 'প্রেমের প্রেমে পড়া'— একটি মেয়েকে ভালোবাসার পর— ভালোবাসাতেই চক্ষু আচ্ছন্ন হয়, বদলে যায় এই জগৎ— আমার আর বিশ্বচরাচরের মধ্যের সব ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে যায়, সহপাঠিনী বালিকা হয় পৃথিবীর যেকোনও বা সমস্ত নারী।]

লুই আরাগঁ

[প্রেমিকাকে নিয়ে কবিরা ঢের কবিতা লিখেছেন ও লিখবেন। কিন্তু প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে তারপর আর তাকে নিয়ে কবিতা লেখার রেওয়াজ নেই বিশেষ। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে প্রেমের কবিতা লেখার ফ্যাশন কোনও দেশেই নেই। দু'-একজন কেউ লিখলেও, নাম না দিয়ে কিছুটা অস্পষ্ট বর্ণনায় এমন ভাব করা হয়, যেন কোনও অচিন-প্রিয়া, ইত্যাদি। রাধাকৃষ্ণ বা ত্রিস্তান-ইসোল্টের কাল থেকেই প্রেমের কবিতার নায়িকা পরস্ত্রী বা অনূঢ়া।

কিন্তু আরাগঁ লিখেছেন, প্রবল ও নির্লজ্জভাবে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'এল্‌সার চোখ'। এল্‌সা ত্রিয়োলেট নামের রাশিয়ান নারীকে বিয়ে করার পর বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

জন্ম ১৮৯৭। আরাগঁ-র জীবনের ঘটনাগুলি অনেকটা তাঁর বন্ধু এলুয়ারের মতোই। দু'জনেই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আরাগঁ বীরত্বের জন্য পদক পান। তারপর ডাডাইজম আন্দোলনের স্বেচ্ছাচারে যোগদান। পরে সুররিয়ালিজম। আরও পরে কমিউনিজম। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ। এই সময়ে প্রকাশিত পরপর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়' ও 'এল্‌সার চোখ'— এতে যুদ্ধ ও দেশাত্মবোধের সরল কবিতাগুলি তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়।

গদ্য-লেখক হিসেবেও আরাগঁ-র সুনাম আছে। তাঁর তিনখানি উপন্যাস ফরাসি ভাষায় কবিত্বময়তায় বিশিষ্ট। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর স্থান কোথায়— এ নিয়ে এখন বিপুল মতভেদ দেখা গিয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের মতে, তিনি এ যুগের একজন মহাকবি; অন্যদের মতে তিনি একটি বিপুল ব্যর্থতা। রাজনীতি-নিরপেক্ষ সমালোচকদের মধ্যেও এরকম মতভেদ। কারণ, আরাগঁ চান জনতার কাছে তাঁর রচনার সম্পূর্ণ আবেদন পৌঁছে দিতে, এবং তিনি বেছে নিয়েছেন কবিতার প্রথাসিদ্ধ রীতি ও সরল, মর্মস্পর্শী বিষয়। তাঁর ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষভাবে অনাধুনিক কবিতার মতো, অর্থাৎ চলিত ভাষায় আমরা যাকে পদ্য বলে থাকি। নিম্নোদ্ধৃত কবিতার অনুবাদেও আমরা আমাদের সচরাচর অব্যবহার্য কয়েকটি পুরনো শব্দ ব্যবহার করে সেই পুরনো ভাবটি আনার চেষ্টা করেছি।

যুদ্ধের সময় লেখা আরাগঁ-র 'দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ' কবিতাটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। এই কবিতাটি একসময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। এবং এখনও যুদ্ধের উপরে লেখা সার্থক কবিতা হিসেবে এর কৃতিত্ব সমসাময়িকতা ছাড়িয়ে আছে।]

লিলি ও গোলাপ

কুসুমের মাস রূপান্তরের মাস
মে মেঘহীন জুনের পৃষ্ঠে ছুরি
ভুলব না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস
বসন্তে আরও লুকানো যে মঞ্জরী

ভুলব না আমি কখনও করুণ মায়ায় দৃশ্যমান
জনতার স্রোত চিৎকার রোদ্দুরে
ভালোবাসা-মোড়া সাঁজোয়া বাহিনী বেলজিয়ামের দান
বাতাস ও পথ কাঁপে মাছিদের ভনভনানির সুরে

বিবাদের আগে দ্রুত হঠকারী জয় অধিকার পায়
সুন্দরীদের লাল চুম্বন রক্তপাতের অগ্রিম
মৃত্যুর কাছে যারা যাবে তারা দাঁড়িয়ে বারান্দায়
ফুলের মালায় ভরে গেছে বুক জনতার হিমসিম

ভুলব না আমি ফ্রান্সেব সেই প্রিয় উদ্যানগুলি
ওরা যেন বহু প্রাচীন কালের ভোরে প্রার্থনা গান
নৈঃশব্দের ধাঁধা সন্ধ্যার যাতনা কেমনে ভুলি
ছিল আমাদের যাত্রার পথে গোলাপ যে অফুরান.....

.....থেমে গেছে সব শত্রু এখন ছায়ায় নিয়েছে বাস
প্রিয় প্যারিসের পতন শব্দ শত্রুর মুখে শোনা
ভুলব না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস
এবং আমার দুই ভালোবাসা হারিয়েছি ভুলব না

প্রথম দিনের লিলির স্তবক ফ্লান্ডার্সের ফুল
মৃত্যু যে রঙ গণ্ডে মেশায় ফুলে সেই জাগরণী

আর তুমি হায় কোমল গোলাপ অপসরণের ভুল
আঁজুর গোলাপ তোমার বর্ণ দূর কামানের ধ্বনি

[এই কবিতার কয়েকটি উল্লেখ স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুটি মাসের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়। ১৯৪০-এর মে-জুন। আরাগঁ তখন সৈন্যবাহিনীতে। মে মাসে ফরাসি বাহিনীর মধ্যে জয়ের ছদ্ম আশা জন্মেছিল। মে মাসের স্নিগ্ধ সূর্যালোকে সাদা লিলি ফুল সেই ভুল আশার প্রতীক। ফরাসি বাহিনী চলেছে আলরিয়ার খালের দিকে প্রতি-আক্রমণে, বেলজিয়ামের অকৃপণ সাহায্য, সেই উপলক্ষে নাগরিকদের উৎসব। যুদ্ধের ট্যাঙ্কগুলো ভালোবাসায় মোড়া— অর্থাৎ, পশ্চিম দেশের যেমন রীতি— যুদ্ধে যাবার সময় সুন্দরী তরুণীরা দলে দলে ছুটে এসে গাড়ির ওপর উঠে সৈনিকদের আলিঙ্গন-চুম্বন দেয়। সৈনিকদের গালে সেই লালচে লিপস্টিকের দাগ— যেন তাদের আসন্ন মৃত্যু-পরোয়ানা। গোলাপ ভয়ংকর জুন মাসের ফুল— যে জুন মাসে আশাভঙ্গ এবং পশ্চাদপসরণ। ১৪ জুন প্যারিসের পতন। পরাজিত সৈন্যদের ফিরে আসার পথে আর কোনও অভ্যর্থনা নেই, উৎকট স্তব্ধতা, শুধু পথের পাশে পাশে লাল গোলাপের ঝাড়। দুই ভালোবাসাকে হারানো— অর্থাৎ প্রিয় প্যারিস ও প্রিয়তমা এল্‌সা।

প্যারিসের বাগানগুলির সঙ্গে প্রার্থনা গানের তুলনা—একটু দূরান্বয়ী মনে হতে পারে, মূল কবিতায় আছে missel, অর্থাৎ ইংরেজি missal— আগেকার রোমান ক্যাথলিক গির্জায় রক্ষিত প্রার্থনা সংগ্রহ-পুস্তক। প্রার্থনা-পুস্তকের সঙ্গে বাগানের তুলনা এই হিসেবে হতে পারে, যে রঙিন ফুলের চৌখুপ্পি করা বাগানের সঙ্গে নানা বর্ণে চিত্রিত প্রার্থনা-পুস্তকের দৃশ্যত সাদৃশ্য। তেমনি আঁজুর গোলাপ, মূল কবিতায় আঁজু শব্দটি ছিল লাইনের শেষে। আঁজু অঞ্চলের গোলাপ এমন কিছু বিখ্যাত নয়— তবু কেন আঁজুর উল্লেখ— আগে ফ্লান্ডার্সের ফুল বলার তবু মানে হয়, কারণ সৈন্যবাহিনী এগিয়েছিল ফ্লান্ডার্স দিয়ে— কিন্তু আঁজু? ওটা মনে হয় এসেছে মিলের খাতিরে— কবিদের এরকম স্বভাব আছেই।

মূল কবিতা থেকে আট লাইন আমি বাদ দিয়েছি। মূল কবিতায় আছে লাইলাক ফুল, কিন্তু বাংলায় লিলি নামটা পরিচিত। মে মাসে লিলি ফুল ফোটার কথা তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই পড়েছি।]

আঁরি মিশো

[সাম্প্রতিক ফরাসি কবিতায় দুই সৃষ্টিশীল প্রধান কবি মিশো এবং বনফোয়া। আঁরি মিশো এখন বয়সে প্রবীন— কিন্তু এই অভিমানী, আত্মভুক, পাগলাটে পুরুষটি ফরাসি কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিনিধি।

মানুষের মনের ভিতরের হিংস্র, ভয়ংকর জগৎ থেকে দানবগুলিকে বারবার টেনে এনেছেন, কিন্তু মুক্তি বা রূপান্তরে বিশ্বাস করেননি মিশো। এই কবি নৈরাশ্যবাদী। অর্থাৎ অন্তর্জীবনের অজ্ঞানকে আবিষ্কার ও মনুষ্যত্বের রূপান্তর নয়, তাঁর কবিতা কবিতার

মধ্যেই শেষ। কবিতা লিখে মানুষের উন্নতি করতে তিনি আসেননি, বরং নিজের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ, যে যুদ্ধে জয়-পরাজয় কিছুই নেই, জীবন এইরকমই— তীব্র, নির্বাচিত ভাষায় আঁরি মিশো লিখে চলেছেন। বোদলেয়ারের পর থেকে ফরাসি কবিতায় মেটাফিজিকাল দিক যে ক্রমশ কমে আসছে, মিশোই তার চরম উদাহরণ। তাঁর লেখায় প্রতীকের ব্যবহার খোঁজা নিরর্থক। কবিতা জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তের মতো, প্রত্যেকটি কবিতারই আলাদা অস্তিত্ব আছে, মানুষ বা মুহূর্তের মতোই তার জন্ম-মৃত্যু।

মিশো-কে প্রথম অভ্যর্থনা জানান আঁদ্রে জিদ। মিশো সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মিশোর জন্ম ১৮৯৯, আসলে জাতে বেলজিয়ান। ব্রাসেলসে ডাক্তারি পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিয়ে নাবিকের চাকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। সেই সময়ে ঘুরেছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বন্দরে। ফিরে এসে প্রথম লেখা শুরু করলেন। পঁচিশ বছর বয়সে প্যারিসে এসে আস্তানা নিলেন। সেইসময় সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন প্রবল, মিশো ওই পালকেরই পাখি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি ঈর্ষাবশত, ব্রেতোঁ-র একনায়কত্বের জন্য। আবার ভ্রমণ এশিয়া মহাদেশ। ফিরে এসে প্রবল কবিতা ও ছবি আঁকা নিয়মিত। রুগ্ন শরীর, কিন্তু গত এক দশক গাঁজা, মেস্কালিন, হাসিস, আফিম ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা, নেশা নয়।

এশিয়া মহাদেশ ভ্রমণের পর একটি বই লিখেছিলেন, 'এশিয়ার এক বর্বর'। সে বইয়ের কোনও কোনও মন্তব্যে এ দেশের অনেক গোঁড়া লোক খুশি হন না, কিন্তু বইটি ভারী মজার।]

একজন শান্ত মানুষ

বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়াল ছুঁতে না পেরে প্লুম অবাক হয়ে গেল। সে ভাবল, 'হুঁ, পিঁপড়েতে খেয়ে গেছে.....' এবং সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরেই ওর স্ত্রী ওকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, 'কুঁড়ের যম, একটু চোখ মেলে দ্যাখো, তুমি যখন ঘুমিয়ে কাদা, তখন ওরা আমাদের বাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছে।' এবং সত্যিই ওদের চারপাশে সীমাহীন আকাশ ছড়ানো। 'বাঃ, হয়ে যখন গেছেই...' সে ভাবল। তারও একটু পরে সে একটা শব্দ শুনতে পেল। একটা ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে ওদের দিকে ছুটে আসছে। 'যে-রকম জোরে ওটা আসছে, তা দেখে মনে হয়' সে ভাবল, 'আমরা পালাবার আগেই...' এবং সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর শীত তার ঘুম ভাঙাল। ওর সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা। ওর স্ত্রীর টুকরো টুকরো দেহ পাশে পড়ে আছে। সে ভাবল, 'রক্ত-টক্ত থাকলে অনেক বিশ্রী ব্যাপার পর্যন্ত গড়ায়; ট্রেনটা যদি সত্যিই না আসত, আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু যখন কাণ্ডটা ঘটেই গেছে...' সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

—তা হলে, বিচারক বললেন, তুমি এর কী কারণ দেখাতে পারো যে, তোমার স্ত্রী

যখন অমন ভয়ংকরভাবে নিজেকে টুকরো টুকরো করল— লোকেরা ওর লাশ আটটা টুকরোয় ভাগ করা দেখেছে— এবং তুমি পাশে শুয়ে থেকে ওকে এ কাজে বাধা দেবার কোনও চেষ্টাই করোনি, এমনকী তুমি কিছু লক্ষই করোনি। এটাই আসল রহস্য। পুরো কেসটা এর ওপরই নির্ভর করছে।

'এই মামলায় আমি ওকে কোনও সাহায্যই করতে পারব না', প্লুম ভাবল, এবং সে আবার ঘুমের মধ্যে ফিরে গেল।

—ফাঁসি হবে কাল সকালে। আসামি তোমার কিছু বলার আছে?

—মাপ করবেন, আমি কেসটা গোড়া থেকে কিছুই শুনিনি। সে বলল। এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আগামীকাল এখনও নয়...

ঘোরো, ঘোরো, দ্বিমুণ্ড ভাগ্য,
আমাদের ব্যান্ডেজমোড়া শরীরের গ্রহগুলি থেকে ছিটকে ওঠা
গভীর গতি, ঘোরো।

দেরির জন্য সূর্য,
আবলুশ ঘুম,
আমার স্বর্ণফলের বুক।

দু' হাত ছড়িয়ে
আমরা আলিঙ্গন করি ঝড়,
আমরা আলিঙ্গন করি আয়তন,

আমরা আলিঙ্গন করি বন্যা, আকাশ, ব্রহ্মাণ্ড,
আমাদের সঙ্গে যা-কিছু আজ আমরা আলিঙ্গন করেছি,
ফাঁসি কাঠের উপরে রতি-ক্রীড়ায়।

[অনুবাদের সীমাবদ্ধতা, অনুবাদকের অক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্নে এখানে আঁরি মিশোর দুটি প্রায় অপ্রধান কবিতাই অনূদিত হল। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে 'আমার রাজা'— যে কবিতায় কবি নিজস্ব মধ্যরাত্রে জেগে উঠে নিজের রাজার সঙ্গে লড়াই করছেন কিংবা 'দুর্ঘটনার পর' প্রভৃতি কবিতা অনুবাদেই মিশোর সত্যিকারের পরিচয় বোঝা যেত।

ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা এই শতাব্দীতে যে ধরনের গদ্যলেখক, কবিতায় আঁরি মিশোও

অনেকটা তাই। কাফ্‌কার চরিত্র জোসেফ কে-র মতো, বা আলবিয়ার কামু-র মেরশো-র মতো, প্লুম নামের চরিত্রটিও মিশোর বহু কবিতায় ঘুরে ঘুরে এসেছে।

প্লুম হচ্ছে আধুনিক মানুষের প্রতিভূ— যে এই নিষ্ঠুর এবং দুর্বোধ্য জগতের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মিশো কখনও কখনও এই লোকটিকে প্রচণ্ড বিদ্রূপও করেছেন, ওকে ক্লাউন বানিয়েছেন।]

ফ্রাঁসিস পঁঝ

[ফ্রাঁসিস পঁঝকে মনে হয় ফরাসি কবিতার...ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, একক। বোদলেয়ার থেকে শুরু হয়েছে যে হৃদয়-খোঁড়া, অজ্ঞাত প্রদেশের উদ্ভাসন, পঁঝ সে পথে যাননি। তাঁর কবিতার মূল বিষয় মানুষ নয়, বস্তু। কাঠ, লোহা, জল, সিগারেট দেশলাই, শামুক, বরফ, ঝিনুক— এইগুলিই তাঁর চোখের কেন্দ্র, বস্তুর চরিত্র অনুযায়ীই তিনি মানুষের সম্পর্কের কথা ভেবেছেন। পাসকালের স্বধর্মী পঁঝ বহির্জগতে ধ্যানমগ্ন, প্রতিদিনের দেখা জড়পদার্থের মধ্যেই তাঁর কবিত্বের আবিষ্কার। এইসব বস্তুকে তিনি জীবনের চরিত্র দিয়েছেন, কিন্তু নিজের জীবনের সঙ্গে মেলাননি, সেই হিসেবে পঁঝ প্রতীকধর্মী নন।

পঁঝের এই নির্লিপ্তভাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে কবিতা, তাঁর পরবর্তীদের মধ্যেও অনুকারী বা অনুসারী সৃষ্টি করেনি, কবিতার চরিত্রে ফরাসি কবিতায় তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনন্য, কিন্তু ১৯৫০-এর পর কিছু আধুনিক ঔপন্যাসিক, এল্যাঁ রব গ্রিয়ে বা মিশেল বুতর—এঁদের রচনায় পঁঝের প্রভাব স্পষ্ট।

জন্ম ১৮৯৯। বাবা ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, তাঁর কাছে এবং প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে সাংবাদিকতা এবং পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন। সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ। ঘটনাহীন জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে সাংবাদিকদের সংগঠন করেছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে প্যারিসের আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে অধ্যাপনা করছেন।]

তিনটি দোকান

বড় রাস্তার কাছে, যেখানে রোজ খুব ভোরে আমি বসে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি, তিনটি পাশাপাশি দোকান। একটি সোনারুপোর, একটি কয়লা আর কাঠের, আরেকটি মাংসের। দোকান তিনটির দিকে পরপর তাকিয়ে আমি লক্ষ করি স্বভাবের বিভিন্নতা, আমার চোখে ধাতু, মূল্যবান পাথর, কয়লা ও জ্বালানি কাঠ এবং মাংসের টুকরো।

ধাতুগুলি সম্পর্কে বেশিক্ষণ ভাবার দরকার নেই— ওরা কাদা-মাটির ওপর

মানুষের ভয়ংকর বা নিরূপিত প্রচেষ্টার ফল— অথবা প্রাকৃতিক আলোড়ন— যার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। মূল্যবান পাথরগুলি সম্পর্কেও তাই, ওদের দুর্লভতাই আমাদের কিছু নির্বাচিত শব্দের বর্ণনা দিতে বাধ্য করে— প্রকৃতির সম্পর্কেও যেরকম শুদ্ধ বর্ণনা।

মাংসের ব্যাপারে, দেখা মাত্রেই আমি কেঁপে উঠি, এক ধরনের আতঙ্ক অথবা সহানুভূতি আমাকে আলাদা হতে বাধ্য করে। তা ছাড়া, সদ্য ছাড়ানো মাংস— একটা সূক্ষ্ম কুয়াশা বা ধোঁয়ার আস্তরণ আড়াল করে রাখে— আক্ষরিক অর্থে খাঁটি সংস্কারাদি যাঁরা প্রকাশ করতে চান— তাঁদের চোখ থেকেও। ওর কেঁপে ওঠা স্বভাবের দিকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনোযোগ গেলে— আমার যা বলার বলতে পারব।

কিন্তু কাঠ ও কয়লা সম্পর্কে চিন্তা— সত্যিকারের আনন্দের উৎস— সরল, নিশ্চিন্ত এবং শান্ত আনন্দ— যা আমি খুশি মনে ভাগ করে নিতে চাই। এর বর্ণনা দিতে আমার পাতার পর পাতা লাগা উচিত, এখানে আমার মাত্র আধ পাতা সীমা, সুতরাং আপনাদের চিন্তার জন্য আমি সূত্রাকারে এই বিষয়ের আভাস দিচ্ছি:

১) ভেকটরে অধিকৃত সময় সর্বদাই নিজের প্রতিশোধ নেয় মৃত্যুতে।

২) ধূসর— কারণ ধূসরই হচ্ছে অঙ্গার হবার পথে সবুজ ও কালোর মধ্যবর্তী পথ, কাঠের ভাগ্যে আরও— যদিও সামান্যতম— আছে একটি রোমাঞ্চকর গল্প, অর্থাৎ একটি ভুল, হঠকারিতা, এবং সমস্ত সম্ভব ভুল বোঝাবুঝি।

দেশলাই

আগুন দেশলাই কাঠিকে শরীর দেয়
একটি জীবন্ত শরীর, তার ভঙ্গি
তার পদোন্নতি, একটি সংক্ষিপ্ত গল্প
উৎস থেকে জ্বলে ওঠে গ্যাস
তাকে দেয় ডানা ও পোশাক, এমনকী শরীর;
একটি গতিময় আকার
এবং সঞ্চরমাণ। খুব দ্রুত।

একমাত্র তার মাথাটাই শুধু কঠিন বাস্তবের সংঘর্ষে
শিখায় জ্বলতে পারে,
খেলার মাঠে স্টার্টারের পিস্তলের মতো তখন এর শব্দ।

কিন্তু যে মুহূর্তে ধরা হল
শিখা
সরল রেখায়, দ্রুত— জাহাজের পাল
ঝুলে পড়ার মতো—
কাঠের রূপালী বর্ণে উঠে আসে,
এবং তাকে ছোঁয়া মাত্রই
পুরোহিতের মতো কালো করে
রেখে যায়।

[বস্তুকে মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন বলেই পঁঝের কবিতা আবেগময় নয়, বরং যুক্তিগ্রাহ্য এবং কঠিন। তাঁর শব্দ ব্যবহারও খুব নির্বাচিত এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাময়। এ ধরনের দুরূহ কবিতা, বাংলায় বোঝাবার জন্য আমরা অবশ্য সরল ভাষাই ব্যবহার করেছি। প্রথম কবিতায়, ভেকটর শব্দটির আমি বাংলা পরিভাষা পাইনি। জ্বালানি কাঠের আশু রূপান্তর বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভেকটর অঙ্কের শব্দ, বাংলা অঙ্কের পত্রিকা "অঙ্ক-ভাবনা"র প্রথম সংখ্যায় ভেকটরের এই সংজ্ঞা পেলাম: 'ভেকটর গণিত শাস্ত্রমতে নিছক পরিমাণ, এই ভেকটরের মানগুণ্য (magnitude) এবং দিক অভিমুখ নির্ণীত থাকে। সাধারণত, ভেকটরের ব্যাপার হিসাবে বেগ এবং জোর ধরা হয়।']

জাক প্রেভের

[বিংশ শতাব্দীর ফরাসি কবিদের মধ্যে জাক প্রেভের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার জন্য যা যা দরকার, সহজবোধ্যতা, শব্দের চমক ও খেলা, লঘু সুর, চেনাশুনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি, জাক প্রেভের এর সব-ক'টাতেই খুব সিদ্ধহস্ত। কবি হিসেবে যথেষ্ট নিম্নমানের, কিন্তু তাঁর কবিতার বই হু-হু করে বিক্রি হয়, প্যারিসের নাইট ক্লাবে প্রেভেরের গান, রেকর্ড, রেডিয়ো ফিল্‌মেও ঘন ঘন তাঁর রচনার ব্যবহার। কিন্তু কবি হিসেবেও প্রেভেরকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না। তাঁর ছন্দ ও শব্দের ব্যবহার— বহু প্রতিষ্ঠিত কবির কাছেও ঈর্ষণীয়। প্রেভের যদিও নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেন, তিনি মজা করার জন্য নিজেকে খুশি করার জন্যই কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম বিদ্রূপবোধ এবং খেলো ও কথ্য শব্দের মধ্যে কবিত্বের বিকাশ সমালোচকরাও স্বীকার করেছেন। যেকোনও সংকলনে তাঁর স্থান নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশেও প্রেভের কিছুটা পরিচিত। বিষ্ণু দে ও অরুণ মিত্র প্রেভেরের অনুবাদ করেছেন। একটি দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

প্রেভেরের জন্ম ১৯০০ সালে। যথারীতি, সমবয়েসিদের মতো উনিও সুররিয়ালিজম, কমিউনিজমের স্তর পেরিয়ে এসেছেন পর পর। সিনেমার গল্প লিখেছেন কয়েকটি, তা

ছাড়াও সাময়িকপত্রে ছোটগল্প ও রেকর্ডের জন্য গান লেখেন। প্রেভেরের রচনা অনেকটা স্বভাবকবিদের মতো স্বতঃস্ফূর্ত— এবং প্রতিদিনের দেখা চরিত্র— অর্থাৎ পুরুত, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ— যাদের হাতে সাধারণ নিরীহ মানুষ নিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছে— প্রেভেরের বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে। এবং তাঁর বিদ্রূপের ধরন নানা অসংগতির মধ্যে চরিত্রগুলোকে জট পাকিয়ে উলটোপালটা এলোমেলো করে দেওয়া।]

তোমার জন্য হে আমার প্রেম

পাখির বাজারে গিয়েছি আমি
পাখি কিনেছি
তোমার জন্য
হে আমার প্রেম
ফুলের বাজারে গিয়েছি আমি
ফুল কিনেছি
তোমার জন্য
হে আমার প্রেম
লোহার বাজারে গিয়েছি আমি
শিকল কিনেছি
কঠিন শিকল
তোমারই জন্য
হে আমার প্রেম
তারপর ক্রীতদাস-দাসীদের বাজারে গিয়েছি
এবং খুঁজেছি
তোমাকে পাইনি
হে আমার প্রেম

শোভাযাত্রা

সোনায় মোড়া একটি বৃদ্ধের সঙ্গে একটি দুঃখিত ঘড়ি
রানি পরিশ্রম করছেন এক ইংরেজের সঙ্গে
আর মাছ-ধরা শান্তির জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের অভিভাবক
ব্যঙ্গনাট্যের বীরপুরুষ, তার সঙ্গে মৃত্যুর বোকা হাঁস

কফির সাপের সঙ্গে এক চশমা পরা কারখানা
দড়ির খেলার শিকারির সঙ্গে এক বহুমুন্ডের নর্তকী
ফেনার সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এক অবসরপ্রাপ্ত তামাকের পাইপ
কালো পোশাকে সজ্জিত এক পিছন নোংরা শিশুর সঙ্গে একটি
নিকারবোকার পরা ভদ্রলোক
ফাঁসিকাঠের গান লেখকের সঙ্গে একটি গায়ক পাখি
বিবেক সংগ্রাহকের সঙ্গে এক সিগারেট-টুকরোর পরিচালক—
বাংলাদেশের একটি কচি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একটা ধর্মীয় মঠের বাঘ
পোর্সিলিনের এক অধ্যাপকের সঙ্গে একজন দর্শন-মেরামতকারী
রাউন্ড টেবিলের একজন ইন্সপেকটরের সঙ্গে প্যারিস গ্যাস
কোম্পানির বীরবৃন্দ
সেন্ট হেলেনের একজন হাঁসের সঙ্গে টোমাটোর রস দিয়ে রান্না
করা একটি নেপোলিয়ান
নিম্নাঙ্গের এক সদস্যের সঙ্গে ফরাসি আকাদেমির পিল
একটি বিশাল ঘোড়ার সঙ্গে সার্কাসের একটি বড় বিশপ
কাঠের ক্রুশধারী একজন টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে বাসের একজন ধর্মগান গায়ক
এক ভয়ংকর শল্যচিকিৎসকের সঙ্গে একটি দাঁতের শিশুডাক্তার
আর ঝিনুকদের সেনাপতির সঙ্গে জেসুইট সাঁড়াশি।

[দ্বিতীয় কবিতাটিতে শোভাযাত্রার নানান ধরনের মানুষের চরিত্রের অসংগতি প্রেভের বর্ণনা করেছেন বিপরীতার্থক শব্দ সমাবেশে। বর্ণিত চরিত্রগুলি দেখেই কাদের ওপর প্রেভেরের রাগ—স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। বিশেষণগুলি দ্রুত উলটে দিয়ে যে কৌতুকের সমাবেশ করেছেন— তার স্বাদ কোনও ভাষাতেই অনুবাদে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, চতুর্থ লাইনে আমি যে 'বোকা হাঁস' বসিয়েছি— ওটার মূল শব্দ, Dindon, যার অর্থ টার্কি অর্থাৎ মুরগি জাতীয় সুখাদ্য পাখি। কিন্তু, ওর আর একটাও মানে হয়, বোকাসোকা লোক। ইংরেজিতেও যেমন 'গুজ' শব্দের অন্য মানে আছে— হি ইজ এ থরো গুজ! কিন্তু বাংলায় মুরগি-হাঁসের বোকামি প্রসিদ্ধ নয়। আবার পঞ্চম লাইনের 'চশমা পরা কারখানা' কিছুই প্রায় বোঝায় না কারখানার মূল শব্দ Moulin, যার অর্থ মিল বা কারখানা— যেমন আটা-ময়দার কারখানা, কফি গুঁড়োর কারখানা। প্যারিসের বিখ্যাত নাইটক্লাব মূল্যাঁ রুঝ— তার ওই নামের কারণ, ওই লাল বাড়িটাকে দেখতেই একটা উইন্ড মিলের মতন। কিন্তু, মূল্যাঁ কথাটার আর একটা মানে আছে ফরাসিতে, মূল্যাঁ আপারোল মানে হচ্ছে বকবকানি মেয়ে। তা হলে চশমাটা কী সুন্দর মানিয়ে যাচ্ছে!

বাহুল্যভয়ে আর দৃষ্টান্ত বাড়াচ্ছি না। কিন্তু এ ধরনের কবিতা বাংলায় লেখা হয় না বলেই, কিছুটা হয়তো স্বাদ পাওয়া যাবে ভেবে এ কবিতা অনুবাদে উদ্ধার করেছি।]

রেনে শার

[সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন, রেনে শার তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। জন্ম ১৯০৭; যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন থেকেই প্রবলভাবেই মেতে উঠেছিলেন ওই সাহিত্য-আন্দোলনে, যুক্ত ছিলেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত, তারপর এসে গেল যুদ্ধ। সুররিয়ালিস্ট দলের যে অংশ সাম্যবাদ গ্রহণ করে, তিনি তাঁদের সমর্থন করেননি, কিন্তু যুদ্ধের সময় সাহিত্য-আন্দোলনের চেয়েও বড় কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, দেশরক্ষায়। শার-এর খ্যাতির অনেকখানি অংশই— যুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর অসমসাহসিকতার জন্য, জীবনপণ করে তিনি দেশরক্ষায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃত। এবং অনেকটা এই কারণেই, খাঁটি কবি হিসেবে শার-এর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। এই উক্তির মধ্যে বৈপরীত্যের সুর থাকলেও— শার নিজের শরীর এবং জীবন পর্যন্ত দান করতে প্রস্তুত ছিলেন দেশরক্ষায়, কিন্তু কবিতার পবিত্রতা ও শুদ্ধতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অবিচল। কবিতাকে কখনও উদ্দেশ্যমূলক করেননি। অর্থাৎ আরাগঁ প্রভৃতির মতো যুদ্ধের সময়েও চিৎকারময় কবিতা লেখেননি। শার-এর সংক্ষিপ্ত, ঘন কবিতাগুলি চিরায়তের নির্যাস, সেই জন্যই দুরূহ, যেকোনও ঘটনা বা চরিত্রই তাঁর কবিতার উপজীব্য নয়। সুররিয়ালিস্টদের অপর দুর্দান্ত প্রবক্তা আন্টোনিন আর্তো-র যেমন মত ছিল, কবির সঙ্গে এই বাস্তব জীবনের কোনও সম্পর্কই নেই, তাঁর দেশ-কাল-সমাজ কোনও কিছুর সঙ্গেই যোগ নেই— শার একথা মানতেন না, তাঁর মতে জীবনে ও বেঁচে থাকায় কবি তাঁর দেশ ও সমাজের সঙ্গে জড়িত, দায়িত্বশীল, কিন্তু কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনা, নিজস্ব মন্ত্রোচ্চারণ। কামু-র মতে শার এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসি কবি।

শার এখন বছরের কিছুদিন প্যারিসে, কিছুদিন জন্মস্থান লিল-সুর-সরগ্ নামের দ্বীপে থাকেন। মিরো, ব্রাক্ প্রভৃতি শিল্পীদের সম্বন্ধেও লিখেছেন।]

ওরিওল পাখি

ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার রাজধানী
তার সংগীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
সব কিছু আজ চিরজীবনের শেষ। (৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯)

বিরুদ্ধতা

তোমার শূকরদের মান্য করো, যাদের অস্তিত্ব আছে। আমি আত্মসমর্পণ করি
আমার দেবতাদের কাছে, যার অস্তিত্ব নেই।
আমরা নির্দয় মানুষ থেকে যাই।

তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো

তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো। বন্ধু ও শত্রুদের প্রতি সমানভাবে তোমার আঠারো বছরের অবহেলা, প্যারিসের কবিদের ন্যাকামির প্রতি, আর সেই বন্ধ্যা ঝিঁঝির একঘেয়ে সুর— তোমার গ্রাম্য ও পাগলাটে পরিবার— তুমি ভালো করেছ তাদের উদার বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে, তাদের অহংকারী গিলোটিনের খাঁড়ার নীচে পেতে। তুমি বেশ করেছ, ছেড়ে চলে গেছ অলসদের রাস্তা, লিরিক-প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা— পশুর নরকস্থানের জন্য, প্রতারকদের ব্যবসা এবং সরল মানুষের অভ্যর্থনা।

শরীর ও আত্মার সেই দুর্বোধ্য উত্থান, লক্ষ্যস্থানে আঘাত করার সময় ফেটে যায় যে কামানের গোলা, হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত, তাই তো মানুষের জীবন! শৈশব থেকে উঠে এসে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের অনির্দিষ্টকাল হত্যা করতে পারি না। কী হয়, যদি ক্বচিৎ জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে ছড়িয়ে যায় বিশ্বের বিশাল শূন্যতায়, আনে সেই গুণাবলী যারা নিজের ক্ষতস্থানের গান করবে।

তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালো করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো। আমাদের কাছে তোমার প্রমাণ করার দরকার নেই, আমরা অল্প কয়েকজন বিশ্বাসী, যে তোমার পক্ষেও সুখ সম্ভব ছিল।

[মালার্মের পর, শার-এর কবিতাই ফরাসিতে সবচেয়ে কঠিনবোধ্য, অধিকাংশ কবিতারই স্পষ্ট, সরল, নির্গলিতার্থ করা সম্ভব নয়, নানারকম ব্যাখ্যা নিয়েও অনেক সমালোচকের মধ্যে মতভেদ আছে। কবিতায় দুর্বোধ্যতার যাঁরা বিরুদ্ধে, তাঁদের কাছে আগেই স্বীকার করা হয়তো যায় যে, শার-এর কোনও কবিতারই সম্পূর্ণ অর্থ নেই। অর্থাৎ, তিনি তাঁর আবেগ বা বিশেষ অনুভূতি কবিতায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন না, মাত্র যাত্রারম্ভটুকু। যাতে পাঠকের আত্মা ক্রমশ সেই আরম্ভটুকু অবলম্বন করে, নিজস্ব বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মগ্ন হতে পারে। তাঁর কোনও বর্ণনাই ছবি নয়, সুরের মতো। বলা বাহুল্য, এই সুরের স্পর্শ একমাত্র পাওয়া যেতে পারে কবির নিজ নির্বাচিত মূল ভাষায় অনুবাদে শুধু প্রকরণের আভাস— তাও কম নয়, আমাদের পক্ষ অন্যরকম, নতুন।

'ওরিওল' কবিতার মর্মের সূত্র পাওয়া যাবে, রচনার তারিখে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিক। ইউরেপের কালো আকাশ পেরিয়ে এল একটি পাখি। 'ওরিওল' কথাটার মানে সোনালি পাখি, হলদে আর কালোয় মেশানো যে পাখি প্রায় সর্বত্র দেখা যায়— তার নাম, আমাদের দেশে যে হলুদে পাখিগুলো 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলে ডাকে— অনেকটা সেইরকম।

র‍্যাঁবো-র উদ্দেশে কবিতাটি নিশ্চিত অপেক্ষাকৃত সরল। বিশ্ববিজয়ী কবি র‍্যাঁবো মাত্র ১৯ বছর বয়সে (মতান্তর আছে) কবিতা লেখা শেষ করে, জীবনের যে বাকি আঠারো বছর সাহিত্য ও সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে আফ্রিকার ভয়ংকর

জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে চোরাই বন্দুকের ব্যবসা করে কাটিয়েছেন, শার র‍্যাঁবো-র জীবনের সেই দ্বিতীয় অংশকেই সমর্থন করছেন। এই সমর্থনের কারণ বোঝা যায়। প্রত্যেক কবিই চায়, এক হিসেবে কবিতা লেখার হাত থেকে মুক্তি পেতে।]

রেনে গি কাদু

[রেনে কাদুকে আজকাল অনেকেই ভুলতে শুরু করেছেন। জীবনে অসফল এই কবি, ব্যর্থ, ভগ্নহৃদয়— রাজধানী থেকে দূরেই কাটিয়েছেন সারা জীবন। 'সারা জীবন' শব্দটা শুনলেই খুব দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু রেনে কাদু-র জীবন মাত্র একত্রিশ বছরের, জন্ম ১৯২০, মৃত্যু ১৯৫১। জন্মেছিলেন ব্রিটানিতে, বাবা স্কুল মাস্টার, সাধারণ পরিবার। আমরা আগে দেখেছি, অন্যান্য ফরাসি কবিরা প্রায় সকলেই নানা দেশ ঘুরেছেন, বহু অভিজ্ঞতা, বহু নাটকীয় ঘটনা জীবনে। রেনে কাদু-র জীবন একরঙা। ভ্রমণের সুযোগ হয়নি, বাকালরিয়া— অর্থাৎ বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বলে, বড় চাকরি পাননি কখনও, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক, আজকাল দেখা যায়, সারা পৃথিবীতেই কবিরা নগরবাসী, অথবা রাজধানী-নিবাসী। হপকিন্সের উদাহরণ নিতান্তই ব্যতিক্রম। বাংলা কবিতার কেন্দ্র যেমন কলকাতা শহর। খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কিংবা বার্ধক্যে ধর্ম-আশ্রয় কিংবা পল্লীনিবাসে নির্জন বিশ্রামসুখ কখনও কবিদের প্রিয় হলেও যৌবনে রাজধানী বা বড় শহরের পরিবেশ, যেখান থেকে নানান পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, নতুন বই, নানান কবিদের আড্ডাস্থল— সব কবিদেরই আকর্ষণ। কবিতার ভাষা বা রীতি প্রায় দু'মাসে-ছ'মাসে বদলে যায় বলে, একমাত্র রাজনীতিতেই তার সংস্পর্শে থেকে কবিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের পথ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট হয়েও, রেনে কাদু প্যারিসে এসেছেন মাত্র একবার। জীবন কাটিয়েছেন কর্মস্থল গ্রামাঞ্চলেই। সেই ছায়াময়, শান্ত পরিবেশ তাঁর কবিতায় নতুন সুর ও সরলতা এনে দিয়েছে। তাঁর জন্মস্থান ব্রিটানি বড় স্নিগ্ধ, মনোরম ভূমি। ব্রিটানির সৌন্দর্য ভুবনবিদিত। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, ফ্রান্স থেকে বহু দূরে তাহিতি দ্বীপে থেকে পল গগ্যাঁ যে শেষ ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন, তার নাম 'ব্রিটানির তুষার'।]

কবির ঘর

যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির নিজস্ব ঘরে, সে জানে না
এ ঘরের প্রতিটি আসবাব তাকে জাদু করতে পারে
চেয়ার আলমারির কাঠে সব ক'টি গ্রন্থি ধরে রাখে

যত বিহঙ্গের গান অরণ্যের বুকে আছে, তারও বেশি।
হঠাৎ টেবিল ল্যাম্প— মেয়েদের মতো তার গ্রীবার ভঙ্গিমা
মসৃণ দেয়াল থেকে উঁকি দিতে পারে কোনও পড়ন্ত সন্ধ্যায়
চকিতে সে দেবে ডাক নানা বর্ণ নানা জাতি মৌমাছির ঝাঁক।
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছে তাজা পাঁউরুটির গন্ধ সে পারে জাগাতে।
কেননা, এই যে এত নির্জনতা এই ঘরে, তার এত শক্তি
একটি বিস্তৃত হাত অন্যমনে সামান্য আদর করে যদি
এই মূক, অন্ধকার, শান্ত, হিম প্রত্যেকটি বিশাল আসবাবে
জেগে ওঠে— ভোরের আলোয় অমলিন সরল বৃক্ষের চঞ্চলতা।

হেলেনের প্রতি প্রেমের কবিতা

যেমন নদীর শুরু হয়
আপন গতিকে ভালোবেসে
নিজেকে একদম তুমি দ্যাখো
আমার দু' হাতে নগ্ন দেহে

আমি আর কিছুই ভাবিনি
চেয়েছি পাতায় ঢেকে দিতে
তোমার ও শরীরের শীত
আমার দু' হাত বৃক্ষ পাতা

শরীরের প্রাণোচ্ছল জল
তার চেয়ে কত বেশি আর
আছে ভালোবাসার আমার,
নারীর শরীর এক পলক
আমার আঙুলে দোল খায়

এমন কী সাধ্য ছিল বলো
শুধু একবার চেয়ে দেখা
তোমার ও মর্মর শরীর—

সেই চেয়ে দেখা এক পলক
নিতান্তই পাবার বাসনা?

কুমারী, উত্তর দাও তুমি
যে বাক্য অশ্রুত অন্ধকার
আমার হৃদয় মৃদু ঝোঁকে
চাপ দেয় তোমার হৃদয়ে

যদি দেখি কখনও তোমার
রূপান্তরে কোনও অস্থিরতা
তবে সেই অস্থিরতা এই:
তোমাকে প্রেমের আগে আমি
তোমার প্রেমকে ভালোবাসি।

[হেলেন-কে ফরাসিরা উচ্চারণ করে এলেন। বা, ফরাসিদের না চটিয়ে বলা যায়, এলেনকে ইংরেজরা উচ্চারণ করে হেলেন। যাই হোক, এলেনের বদলে হেলেন-ই সেই ট্রয়ের আমল থেকে পরিচিত। হেলেন একটি সত্যিকার মেয়ের নাম, রেনে কাদুর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয় ১৯৪৩-এ, মৃত্যুর আগে বাকি কয়েক বছরে লেখা হেলেনের প্রতি প্রেমের কবিতাবলীই কাদুর শ্রেষ্ঠ রচনা, এবং এগুলি ফরাসি কবিতায় একটি অন্যরকম সরল ধারার সূচনা হিসেবে স্বীকৃত।]

ইভ বন্‌ফোয়া

[আমাদের দেশে কবিতার যেমন কোনও ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি, কবিতা বা কবিদের নিয়ে কোনও নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা আজও শুরু হল না। একটি দেশের কবিতা একটি খরস্রোতা নদীর মতো, এক-একজন বড় কবি এক-একটি গঞ্জ বা বন্দর। মূল কবিতার স্রোত থেকে কোনও কবিকেই সম্পূর্ণ আলাদা করে ছিনিয়ে এনে আলোচনা করা যায় না। আমাদের কোনও জীবিত বাঙালি কবি সম্পর্কে যদি বলা হয়, তিনি মুকুন্দরাম বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর ধারার কবি, তবে সেই কবি নিজে তো বটেই, সমালোচকরাও আঁতকে উঠবেন। অথচ এরকমভাবে যোগাযোগ টেনে নবীন কবির কোথায় বিশেষত্ব না দেখালে কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বরং, সাম্প্রতিক সমালোচকদের মতে, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা দেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন, বিদেশ-নির্ভর, কৃত্রিম। কিন্তু, সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এ ব্যাপার অসম্ভব। কবিতার এক হিসেবে স্বদেশ-বিদেশ নেই। আবার, অন্যদিকে কবি যে ভাষায় লিখছেন, সেই ভাষার পূর্বাপর স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেকোনও কবির পক্ষে

অবাস্তবভাবেই অসম্ভব, শারীরিক অসামর্থ্যের মতোই। শুধু চিন্তাধারা নয়, ভাষা ব্যবহারও কবিতা।

এ প্রসঙ্গে মনে এল, কারণ, বন্‌ফোয়া, যাঁকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ফরাসি দেশের সবচেয়ে শক্তিমান কবি বলা হয়, সমালোচকরা তাঁর কবি-চরিত্রের সূত্র পেয়েছেন ভালেরির কবিতায়, এমনকী বহু যুগ পিছিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মরিস সেভ-এর রচনায়। পূর্বে আলোচিত কবিদের মধ্যে কক্‌তো-র সঙ্গে যেমন সমালোচকরা দেখেছেন মালহার্ব বা বঁসারের মিল, দেনো-র সঙ্গে নের্ভালের, এমনকী আপোলিনেয়ার— যিনি নবীন কবিদের রাজা, তাঁরও সঙ্গে পনেরো শতকের ডাকাতকবি ফ্রাঁসোয়া ভিঁয়ো-র (অথবা ভিঁলো, দু'রকমই উচ্চারণ হয় শুনেছি) কবিতার মিল! মিল ঠিক নয়, দূর-সম্পর্কের উত্তরাধিকার।

বন্‌ফোয়া-র জন্ম ১৯২৩-এ। গণিত এবং দর্শন অধ্যয়ন করেছেন। মধ্যযুগীয় শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে উৎসাহী। ফরাসিতে শেক্সপিয়র অনুবাদ করেছেন। এখন অধ্যাপনা করেন এবং শিল্প ও কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।]

সত্য নাম

দুর্গ, একদা যা ছিলে তুমি, তোমাকে ডেকেছি মরুভূমি
এই কণ্ঠস্বর আমি নাম রাখি রাত্রি: এই মুখ অনাগত;
এবং যখন তুমি ঝরে যাও বন্ধ্যা মৃত্তিকায়
যে বিদ্যুন্মালাখানি তোমাকে এনেছে এই দেশে, সে নাম শূন্যতা।

মৃত্যু, এক তোমার অতীতপ্রিয় দেশ, আমি আসি
শুধুই অনন্তকাল তোমার আঁধারময় পথে।
আমি ধ্বংস করি স্মৃতি, তোমার বাসনা, দেহরূপ
আমি তো তোমার শত্রু, ক্রমশই অতীব নির্দয়।

তোমার নতুন নাম যুদ্ধ রাখি, নিজ হাতে তুলে
তোমার শরীরে দেব যুদ্ধের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, অধিকার
করে নেব এই হাতে, তোমার মুখের রেখা, ছিন্নভিন্ন, ম্লান
আমার হৃদয়ে এই দেশ— ঝড়ের আভায় আলোকিত।

সারা রাত

সারাটা রাত ধরে পশুটা ঘোরে ঘরে,
এ পথ কী রকম, ফুরোতে রাজি নয়?
সারা রাত ধরে হরিণ খোঁজে তির,
কারা সে অনাগত, ফিরতে চায় আজ?
সারাটা রাত ধরে ছুরিটা ক্ষত খোঁড়ে,
এ কোন জ্বালা যার পাবার কিছু নেই?
সারাটা রাত ধরে রক্তমাখা দেহে পশুটা গুমরোয়
ঘরের আলোটুকু অস্বীকার করে,
এ কোন মৃত্যু যে কিছুই সারাবে না?

কবিতার শিল্প

রাত্রি থেকে বাইরে আসে রেণুমাখা চোখ
হাত দুটি শুষ্ক, অচঞ্চল
জ্বর নির্বাপিত, হৃদয়কে বলা হল
শুধুই হৃদয় হতে। শিরা-ধমনীতে ছিল একটি দানব
গর্জনের সঙ্গে পালিয়েছে।
মুখের ভিতরে ছিল একটি হতাশাময়, রক্তমাখা স্বর
অবগাহনের পর হয়েছে উদ্ধার।

[প্রথমেই স্বীকার করি, বন্‌ফোয়া-র 'সৌন্দর্য' নামে যে কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয়, সেটি অনুবাদের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। আশা করি, অন্য কেউ করবেন। বন্‌ফোয়া শুদ্ধ রসের কবি, ধ্যানময়। তাঁর রচনাশৈলী কঠিন, শব্দ অতিশয় নির্বাচিত। মৃত্যু এবং রাত্রি— এই দু'টি বিষয় তাঁর অধিকাংশ কবিতায় ছায়া ফেলে আছে। যদিও তাঁর কবিতা নৈরাশ্যের নয়। মৃত্যুর উপস্থিতিতে যে জীবন আলোকিত, বন্‌ফোয়া সেই জীবনের স্তোত্রপাঠক। এখানে মৃত্যু বলতে সামগ্রিক মৃত্যু হয়তো, ক্ষীণভাবে পরমাণু বোমার কথাও উল্লেখ করা যায়। একথা তো আমরা সবাই জানি যে আমেরিকানরা জাপানের হিরোশিমায় বোমা ফেলেছে, কিন্তু তার প্রভাব ও দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছেন ফরাসি লেখকরা— পিয়ের ইমানুয়েল নামে অপর একজন আধুনিক ফরাসি কবি বলেছেন, 'আমরা সবাই হিরোশিমার শিশু।'

'সারা রাত' কবিতাটিকে যেমন অধিকার করে আছে রাত্রি— সেই রকম, পশু, হরিণের ব্যাকুল ডাক, ছুরি— সবই মৃত্যুর প্রতীক, কিন্তু এই রাত্রি ও মৃত্যু কিছুই রূপান্তরিত করতে পারে না, কবি মোটেই বিচলিত না হয়ে তার নিজস্ব নির্লিপ্ত সৌন্দর্য ভোগ করছেন। বন্‌ফোয়ার কোনও কবিতাই বিচ্ছিন্ন নয়, বোদলেয়ারের 'অশিব পুষ্প' বা প্যার্সের কবিতাবলীর মতোই, তাঁর প্রায় সব কবিতাই ধারাবাহিক অনুভূতি।]

পিলিপ জাকোতে

[এবার আমরা এসে পড়েছি ফরাসি কবিতার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে। পাঠক লক্ষ করুন, সমসাময়িক বাঙালি কবিদের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিল বা প্রভেদ। পিলিপ জাকোতের জন্ম ১৯২৫-এ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রমুখদের কাছাকাছি বয়সের ফরাসি কবি বন্‌ফোয়া, জাকোতে, আঁদ্রে দু বুশে, রেনে কাদু, জাক দুপ্যাঁ প্রভৃতি। ওঁদের কিছু কিছু কবিতা আলোচনা করলে, বাংলা কবিতা বিষয়ে আমাদের কিছুটা হীনমন্যতা কেটে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুদের কল্লোলের বিপ্লবের সময়েই এই দুর্নাম ওঠে যে, আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় বিদেশিদের কাছ থেকে ধার করা। রবীন্দ্রনাথকেও এই দুর্নাম সইতে হয়েছিল কিছুটা। সমালোচকদের এ মনোভাবকে নিশ্চিত হীনমন্যতা বলব। বাংলা কবিতা পৃথিবীর যেকোনও ভাষার কবিতার তুলনায় পশ্চাৎপদ নয়, বরং মনে হয় অগ্রবর্তী, বিদেশের কাছ থেকে গ্রহণ করার কিছু থাকলেও অনুকরণ করার কোনওই প্রয়োজন নেই। বরং, বাংলা কবিতার সুপ্রচার হলে, বিদেশি কবিরাও আমাদের থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করত। কিছু কিছু যে এখন করছে, তা-ও ঠিক।

এখন দেখতে পাচ্ছি, কবিরা অনেক সাধারণ মানুষ হয়ে এসেছেন। এতদিন পর্যন্ত কবিদের একটা মঞ্চ দরকার হত, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাঁকে কথা বলতে হত।— এমন রটনা ছিল যে, কবি একজন দুর্লভ-জন্মা, সে প্রবক্তা, মুক্তিদাতা। বিচারক যেমন আদালতের বাইরে একজন সাধারণ মানুষ, অন্য সকলেরই মতো চেহারা, এমনকী আসামির মতোই— কিন্তু বিচারের সময় কেন যেন তাঁকে সাধারণ থাকলে চলে না, তাঁকে বসতে হয় উচ্চাসনে, মাথায় পরে নিতে হয় সাদা পরচুলা— তেমনি কবির উপরেও অসাধারণত্বের পোশাক চাপানো ছিল— এই শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। এখন লম্বা চুল, কাঁধে-চাদরের রূপ খুলে ফেলে কবি মিশে গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, বা লুকিয়েছে। তার ব্যবহৃত শব্দ আর পাঁচজনের মুখে ভাষা, তার বিষয় তার নিজের জীবন। জাকোতেও এই আধুনিক জগতের কবি। তাঁর ব্যবহৃত ছবি কোনও বৃহতের বা অলৌকিকের আভাস আনে না, নিজের জীবনকেই উদ্ভাসিত করে।

জাকোতের জন্ম সুইটসারল্যান্ডে। লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো করার পর, এখন সমালোচকের কাজ করেন। হোমার এবং জার্মানির ঔপন্যাসিক মুজিলের অনুবাদ করেছেন।]

আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি

আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি এক আগন্তুক
শুধুই তোমার সঙ্গে কথা বলি অজানা ভাষায়,
কেননা তুমিই বুঝি হতে পারো একমাত্র আমার স্বদেশ,
আমার বসন্ত, টুকরো খড়কুটোর বাসা, বৃষ্টিপাত বৃক্ষশাখে

সকালের আলো ভেঙে কেঁপেছে আমার এই জলের মৌচাক
জায়মান রাত্রির-মাধুর্য... (যদিও জেনেছি আমি এই তো সময়
সুখময় দেহগুলি আলিঙ্গন করে তাকে প্রেমের আশ্লেষে,
তৃপ্তির শীৎকার ওঠে— কোনও একটি কৃশাঙ্গ তরুণী

বিরলে রোদন করে শীতের উঠোনে। আর তুমি? তুমি নেই?
এ শহরে, তুমি তো যাও না হেঁটে রাত্রির সম্মুখে দেখা দিতে;
এই তো সময়, যখন নির্জন আমি, অদুষ্কর শব্দের বন্ধনে

একটি বাস্তব মুখ মনে আনি...) হে সুপক্ক ফল,
সোনালি পথের উৎস, আইভি উদ্যান— আমি শুধু তোমাকেই
ডাকি, তোমাকেই বলি, হে আমার অনাগত, নিজস্ব পৃথিবী...

অভ্যন্তর

এই সেই জায়গা, আমি চেষ্টা করছি জীবন কাটাতে
এই আমার ঘর, আমি ভালোবাসার ভান করি
এই টেবিল, যাবতীয় জড়বস্তু;— একটি জানালা
প্রতিটি আঁধার থেকে ঠেলে আনে সবুজ সীমানা।
হৃৎস্পন্দনের মতো কোকিলের ডাক ওঠে ঘন আইভি-ঝোপে
ভোরের প্রথম আলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে
পলাতক ছায়ার উপরে।
এই তো আমার ঘর, আমি এখানেই থাকব, খুব চমৎকার
ভাবে মেনে নিতে রাজি আছি, দিনভরা বহু প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু এই মাকড়শাটা বিছানার পায়ের ওপাশে
(এসেছে বাগান থেকে, মনে হয়) অবিরাম বুনে যাচ্ছে জাল—
বহু চেষ্টা করে আমি ঠিকমতো পিষে ফেলতে পারিনি ওটাকে,
এই জাল ঘিরে ফেলে, ঢাকে, স্বচ্ছ আমার অস্তিত্ব।

[জাকোতে যেহেতু সমসাময়িক কবি, সুতরাং তাঁর কিছু নিন্দে শুরু করা যাক! এই কবির এখনও সনেট লেখার দুর্বলতা আছে। অথচ, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আধুনিক কবিই এখন সনেট লেখা অত্যন্ত কাঁচা-কাজ বলে মনে করেন, কারণ, কবিতাটি লেখার আগেই বা লিখতে লিখতে কবিকে যদি আঙ্গিক সম্বন্ধে সব সময় সজাগ থাকতে হয়, বা কবিতাটি ঠিক ক'লাইনে গিয়ে শেষ হবে মনে রাখতে হয়— তবে সেটা কবির নিশ্চিত পরাজয়। এই কৃত্রিমতা কবিরা আজকাল পরিহার করেছেন। জাকোতে-র এই দ্বিতীয় কবিতার শেষেও মাকড়শার জালের উল্লেখ খুব দুর্বল। জীবনের জটিলতা-ফটিলতা বোঝাতে মাকড়শার জালের ছবি আঁকা খুবই পুরনো হয়ে গেছে। সিনেমায় বা স্টেজে মাকড়শার জাল দেখানো এখনও খুব আধুনিকতা— কিন্তু বাংলা দেশের যেকোনও সদ্য শুরু করা আধুনিক কবিও জানেন, ও জিনিস বহু-ব্যবহৃত, এখন পরিত্যাজ্য।

জাকোতে-র বিশেষত্ব, তাঁর কবিতায় সব সময় একটা অনুসন্ধান আছে— শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি বারবার কবিতার একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, এবং সে মূর্তি কখনওই সম্পূর্ণ হয় না। প্রথম কবিতায়, কবি একজন 'পরবাসী', তিনি নিজের প্রেয়সীকে খুঁজছেন, সেই সঙ্গে স্বদেশ, কারণ, বাসভূমি না পেলে প্রেয়সীকেও পাওয়া যাবে না। বারবার প্রেয়সী এবং স্বদেশের ছবি মিলে যাচ্ছে, কবির সন্দেহ, তাঁর ভাষা হয়তো তাঁর অনুসন্ধান ব্যক্ত করতে পারছে না।]

দু'জন নিগ্রো কবি

[ফরাসি দেশের বাইরে আগেকার ফরাসি উপনিবেশগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে কয়েকজন ফরাসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন— তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু'জন, এমে সেজার এবং লেওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর। এঁদের মধ্যে, এমে সেজারের কবিত্ব বহুজনস্বীকৃত, তিনি সুররিয়ালিস্ট কবিদের অন্যতম, এবং উল্লেখযোগ্য ফরাসি কবিদের সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর নাম প্রায়ই দেখা যায়; যদিও আশ্চর্যের বিষয়, বহু কবিতা সংকলনে তিনি অবহেলিত। সেঙ্ঘরের কবিত্ববোধ খুব সুক্ষ্ম না হলেও, তিনিও যথেষ্ট বিখ্যাত এবং আফ্রিকার একটি নবীন রাষ্ট্রের তিনি রাষ্ট্রপতি এখন।

এককালের ভারতীয়দের কাছে বিলেতের মতো, ফরাসি উপনিবেশের প্রতিভাশালী তরুণরাও প্যারিসে লেখাপড়া শিখতে যেতেন। বর্ণ-বৈষম্যের বিষ এঁরাও সহ্য করেছেন।

একটি ফলের ব্যবসায়ী ভাল ভাল মর্তমান কলার বিজ্ঞাপন দিয়ে প্যারিসের দেয়ালে দেয়ালে প্রায়ই পোস্টার লাগান। সেই পোস্টারের ছবিতে আছে, একটি নিগ্রো আহ্লাদের সঙ্গে কলা খাচ্ছে। কালো কুচকুচে চেহারার নিগ্রো হলদে রঙের পুরুষ্ট কলা মুখে দিয়ে আছে— ছবিটা হাস্য উদ্রেক করে। দুঃখিত সেঙ্ঘর যুবক বয়সে প্যারিসের পথে পথে ঘোরার সময় লিখেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে করে প্যারিসের দেয়াল থেকে ওই হাসিমাখা মুখগুলো উপড়ে নিতে!'

আমরা দু'জনের কবিতা অনুবাদ না করে, এমে সেজারকে লেখা সেঙ্ঘরের একটি কবিতা তুলে দিলাম। খাঁটি কবিতার আস্বাদ এতে হয়তো পাওয়া যাবে না— কিন্তু একজন সমসাময়িক কবির প্রতি অপর কবির এমন আন্তরিক আহ্বান ও শ্রদ্ধার চিহ্ন দুর্লভ। কবিতাটি খানিকটা অভিমানেরও। কবিতার সুউচ্চ স্বর্গ থেকে তিনি সেজারকে দেশের মাটিতে নেমে আসতে বলছেন।]

লেওপোল্ড সেঙ্ঘর

এমে সেজারকে চিঠি

প্রিয় ভ্রাতা এবং বন্ধুর প্রতি আমার সংক্ষিপ্ত এবং সহোদরপম শুভেচ্ছা
বোকা কালো মানুষের দল এবং দূর দুরান্ত পরিভ্রমণকারীরা তোমার প্রতি
মশলা সুগন্ধ এবং দক্ষিণের নদী ও দ্বীপের শব্দে ভরা
সমৃদ্ধ ভাষায় প্রশস্তি জানিয়েছে।
তোমার প্রশস্ত কপাল এবং তোমার সূক্ষ্ম ওষ্ঠের ফুলের প্রতি ওদের স্তুতি
তোমার শিষ্যদের জন্য শ্রদ্ধা এক মৌচাক স্তব্ধতা,
ময়ূরের বর্ণময় পাখা
চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত যে তুমি ওদের উৎসাহকে তৃষ্ণাময়
এবং অতৃপ্ত রেখে দাও
সে কি তোমার রূপকথার ফলের মিষ্টি গন্ধ না দুপুরে
মাঠে হলকর্ষণের আলো?
সাপাডিলার ছালপরা নারীরা তোমার আত্মার সেরালিও-তে
বসতি করে।

তোমার জীবন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি সময় ছাড়িয়ে মুগ্ধ
ছাইমাখা চোখের পাতা ছাড়িয়ে— তোমার সংগীতের প্রতি
আমাদের অতীত বছরের হাত ও শ্রদ্ধা বাড়িয়েছি

তুমি কি ভুলে গেছ তোমার মহত্ত্ব, তোমার কথা ছিল
পিতৃপুরুষ, রাজকুমারের দল ও ঈশ্বরের গান করা—
ফুল নয়, কুয়াশা নয়।
আমাদের আত্মায় তুমি এনে দেবে তোমার বাগানের সাদা ফুল
ফুল শুধু খাদ্য, ফসলের বৎসরেই ফুটেছে
তোমার নিশ্বাস সুগন্ধ করে নিতে তুমি তার একটি
পাপড়িও চুরি করবে না
অতীত ঘটনার কুণ্ড থেকে আমি তোমার মুখ স্পর্শ করি
তরুণ প্রণয়কে সতেজ করার জন্য আমি বসন্তকে ডাকি
তুমি রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছ, একটি ছোট পাহাড়ে বাহুর ভর
তোমার শয্যার চাপে ভূমি ঈষৎ দুঃখিত।
জলে ডোবা জমিতে দুঃখিত ঢাকের বাজনা তোমার গান গায়
তোমার কবিতা রাত্রি এবং দূর সমুদ্রের নিশ্বাস।
তুমি সংগীত ও ছন্দের নিখাদে আকাশ থেকে একটি তারা ছিঁড়ে আনবে
হতভাগ্য দরিদ্রেরা সারা বছরের উপার্জন দেবে তোমার পায়ে
তোমার নগ্ন পায়ের কাছে মেয়েরা ডালি দেবে তাদের রজন হৃৎপিণ্ড
দেখাবে পরাজিত আত্মার নাচ।

হে বন্ধু, তোমাকে ফিরতে হবে
আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব— কেইসড্রাটি গাছের নীচে
জলপোতের অধিপতির কাছে আমি এই গোপন কথা বলেছি।
অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। সূর্য ডুবে গেলে
ম্লান রাত্রি যখন ভর করে বাড়ির ছাদে
খেলোয়াড়েরা যখন বরের বেশে যৌবন দেখায়
সেই কি তোমার ফিরে আসার চিহ্ন?

[সাপাডিলা এক ধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ, হলদে-ছাই-রঙা ফল হয়। সেরালিও (Seraglio), তুর্কি 'সেরাই' শব্দের সঙ্গে মিল আছে কিছুটা, বন্ধ ঘর— যেখানে কোনও মুসলমান তাঁর স্ত্রী বা রক্ষিতাকে আব্রুতে রাখেন। ছোট হারেম বলা যায়। কেইসড্রাট কী ধরনের গাছ আমি জানি না। আফ্রিকার কয়েকটি প্রবাদ বা উপকথারও উল্লেখ আছে— সেগুলো আমার জানা নেই।]

ইতালির কবিতা: গোধূলি ও ভবিষ্যৎ

এই শতাব্দীর শুরুতে, ফরাসি কবিতায় যেমন যৌথ সম্রাট ছিলেন দুই দিকপাল, ভালেরি এবং ক্লোদেল— এবং পরে আপোলিনেয়ার এসে এবং সুররিয়ালিস্টদের বিদ্রোহ ফরাসি কবিতায় নতুন ধারা এনে দেয়— সেইরকমই, ইতালির কবিতায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত স্তম্ভ ছিলেন তিনজন মহৎ কবি, কার্দুচ্চি, পাসকোলি এবং দান্নুৎসিয়ো— এঁদের প্রতিহত করে নবীন বিদ্রোহ শুরু হয় ইতালিতে। এই তিনজনকে বলা যায় রোমান্টিক যুগের শেষ অশ্বারোহী, দীপ্ত, বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদে ভূষিত মানুষকে এঁরা মহামানব করতে চেয়েছিলেন— এঁদের প্রভাব ধ্বংস করার জন্য নবীনরা কবিতায় নিয়ে এলেন একরঙা সাধারণ মানুষের কথা— যে মানুষ লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত, আত্মগোপনকারী— এই যন্ত্র ও যুদ্ধের যুগে যে মানুষ অতি সাধারণ এবং অসহায়। এই নবীন আন্দোলনের নাম 'ভবিষ্যৎবাদ'— রোমান্টিকদের অতীতে-মুখ-ফেরানো স্বরূপের বিরুদ্ধে নবীনদের এই উত্তর। ইতালির কবিতার এই আন্দোলনের সঙ্গে সেই সময়ের ফরাসি কবিতার তেমন মিল নেই, কিন্তু ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আছে। তুলনীয় সমসাময়িককালে টি এস এলিয়ট রচিত 'ফাঁপা মানুষ' কিংবা প্রুফকের উক্তি, 'আমি যুবরাজ হ্যামলেট নই, আমি তা হতেও চাইনি!' এই ভবিষ্যৎবাদের পরবর্তী আন্দোলনের নাম 'হারমেটিক' বা বলা যায় 'নিরুদ্ধ কবিতার' আন্দোলন— যে মতবাদ, একটি কবিতার মধ্যেই শেষ। যাই হোক, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইতালির 'ভবিষ্যৎবাদ' আন্দোলনের আগে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্থক আন্দোলন হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গোধূলি কবিতা'। স্বল্পস্থায়ী হলেও সে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

রোমান্টিকদের প্রতিনিধি যদি দান্নুৎসিয়োকে ধরা যায়, তবে, সেই বিশাল পুরুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল দুটি রোগাপটকা বাচ্চা ছেলে। নিৎসের শিষ্য দান্নুৎসিয়ো তাঁর গল্পে, নাটকে এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রবলভাবে আশার জয়গান, বীরত্ব এবং রমণীসম্ভোগের কথা বলেছেন উজ্জ্বল ভাষায়, শব্দের ঝংকারে, ছন্দের চমৎকারিত্বে। তাঁর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াল, তারা যেন নিষ্প্রাণতার প্রতীক— ম্লান, অলংকারহীন ভাষা, সাধারণ শব্দাবলী— ভাঙা দুর্গ, পরিত্যক্ত বাগান, ঘরের জানলা, দীর্ঘশ্বাস, হতাশা তাদের কবিতার বিষয়— প্রতি পদে জীবনের সমস্ত গৌরবকে অস্বীকার। 'গোধূলির কবি'দের মধ্যে যে দু'জন প্রধান— সেই গুইদো গৎসানো আর সার্জও কোরাৎসিনি— দু'জনেই মারা গেছেন টি বি রোগে, অল্প বয়সে।

কোরাৎসিনি মারা গেছেন মাত্র একুশ বছরে— তবু সেই বালকই দান্নুৎসিয়ো প্রমুখ মহারথীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইতালির কবিতাকে নতুন পথে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়ে গেল। গৎসানোরও মৃত্যু হয়েছে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে।

'ক্রেপুসকোলারি' বা 'গোধূলির কবি'দের নব্যরীতির নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন, নিরাশাময় ভাষা ও ভাবের ব্যাখ্যা খুব সহজেই করা যায়। পূর্ববর্তী প্রবল প্রভাবশালী লেখকদের বিরুদ্ধে নবীনরা যখন বিদ্রোহ করেন, তখন পূর্ববর্তীদের রচনায় যেসব উপাদান নেই, নবীনদের রচনায় অজ্ঞাতসারেই সেগুলি এসে যায়। ফলে, ভাষার অন্য একটি দিক খুলে যায়, উভয় দলের কাছ থেকে ভাষা ধনী হয়। রবীন্দ্রনাথের উচ্চ মহত্ত্ব এবং বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে যেমন জীবনানন্দের নির্জন আত্মকেন্দ্রিক মগ্নতা।

গুইদো গৎসানো

[গুইদো গৎসানোর জন্মসাল ১৮৮৩। ছেলেবেলা থেকেই যক্ষ্মারোগ। এই কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে পঁচিশ বছর বয়সেই যেন তাঁর যৌবন শেষ হয়ে গেছে। বার্ধক্যের ভয়ে কবি ভীত। যদিও, সে বার্ধক্য আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু গুইদো বাঁচতে চেয়েছিলেন। যক্ষ্মা সারাবার জন্য কিটস এসেছিলেন ইতালিতে। আর ইতালির কবিরা যাবে কোথায়? গুইদো পৃথিবীর বহু দেশে আকুল হয়ে ঘুরেছেন রোগ সারাবার জন্য। তবু বাঁচতে পারেননি।]

সংলাপ

পঁচিশ বছর! বুড়ো হয়ে গেছি আমি
বুড়ো হয়ে গেছি! যৌবন গেছে শ্রেষ্ঠ ফসল লুকায়ে
পড়ে আছে শুধু শূন্যতা আর সংসার।

সময়ের পুঁথি দিয়েছে হারায়ে— সেখানে আমার শেষ
কান্নার স্বর চাপা পড়ে আছে, ধূসর পাণ্ডুলিপি
হয়তো আমারে চেনাতে পারিত অতীতের সেই ছন্দ।

পঁচিশ বছর! মনে মনে আমি করেছি আলিঙ্গন
পৌরাণিকের যত বিস্ময়— আমার আকাশ ম্লান,
একা বসে আমি দেখি সূর্যের ধীরভাবে ডুবে যাওয়া।

পঁচিশ বছর। তা হলে তিরিশও কেটে যাবে এই ভাবে
চুপিসারে, শুধু কটু অনুভূতি মরণের সাথে জোড়া
ভয়ের শিহর, তাও চলে যাবে, আবার আসিবে চল্লিশ।

কী ভয়ংকর— চল্লিশ, সে যে ভীরু পরাজয়, আর
ম্লান মানুষের বিরস বয়েস, তার পরে বুঝি বার্ধক্যের হানা
নকল দন্ত, কলপ মাখানো কেশরাজিভরা বৃদ্ধ বয়েস।
কভু পুরোপুরি-ভোগ না-করার হে আমার যৌবন
আজ দেখি আমি তোমার স্বরূপ, সত্যমূর্তি
দেখি তব হাসি, প্রেমিকের শোভা, যে শোভা মোদের

শুধু বিদায়ের বিষাদের কাল নির্দেশ করে।
পঁচিশ বছর! যত দূরে আমি চলেছি অন্যপ্রান্তে
তত বলে যাই স্পষ্ট কণ্ঠে, হে আমার যৌবন

তোমার ও রূপ মধুর প্রেমের উপযোগী ছিল!

[এই কবিতাটির শুধু প্রথম অংশ আমি অনুবাদ করেছি, দ্বিতীয় অংশে আছে, এই যে যৌবন মধুর প্রেমের উপযোগী— এই যৌবন কবি নিজে কখনও ভোগ করতে পারেননি। যেন, তাঁর হয়ে অন্য একজন কেউ ভোগ করেছে আজীবন। সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়তে যদি কারুর ইচ্ছে হয়, তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'কনটেমপোরারি ইটালিয়ান পোয়েট্রি' নামের দ্বি-ভাষা সংকলনটি দেখতে পারেন।

প্রথমত ইতালির কবিতা অনুবাদে আমি শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি। ইতালির কবিতায় ওই রকম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য, আমাদের বাংলার মতো ইতালিতেও এই শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার রীতি ছিল আলাদা। নবীন কবির দল এই হাস্যকর পার্থক্য ভেঙে দেন— কিন্তু গোড়ার দিকে সেই পরিবর্তনটুকু বোঝাবার জন্যই একটি কবিতায় সাধুভাষা প্রয়োগ করে রাখলুম।]

দিনো কামপানা

[প্যান্টের পিছন-পকেটে একটা কবিতার বই, হুইটম্যানের 'লিভস অব গ্রাস'— শুধু এই নিয়ে ইহুদি মায়ের ছেলে দিনো কামপানা কৈশোর বয়সেই বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীতে, এই বিংশ শতাব্দী তখন সবে শুরু হয়েছে। কী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন কে জানে, কিন্তু পেয়েছেন শুধু দারিদ্র্য, হতাশা আর মাথার অসুখ। কামপানা যেন ইতালীয় কবিতার

র‍্যাঁবো— দেশ ছেড়ে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরেছেন ইউরোপের সর্বত্র, দক্ষিণ আমেরিকায়। ছুরি-কাঁচি শান দেওয়ার চাকরি থেকে শুরু করে, ইঞ্জিনের কয়লা ঠেলা, লিফ্‌ট-ম্যানের কাজ, জাহাজের ডেক পরিষ্কার করা ইত্যাদি বহু জীবিকাই গ্রহণ করেছেন। তাও সুস্থ শরীরে নয়, যৌবনেই পাগলামির লক্ষণ দেখা যায়, সব মিলিয়ে সাত-আটবার পাগলাগারদে বন্দি হয়েছেন ও বেরিয়েছেন, ইতালি ও সুইটসারল্যান্ডে দু'বার জেলও খাটতে হয়েছে। লেখাপড়া শিখতে পারেননি, কিন্তু কামপানার কবিতায় বৈদগ্ধ্য অনুপস্থিত নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার বছরে, এলোমেলো বিশ্রীভাবে ছাপা কামপানার একটি চটি কবিতার বই 'অরফিউসের গান' ইতালির সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন এনে দিল।

ওদিকে, ইতালির সাহিত্যে তখন চলছে প্রবীণদের বিরুদ্ধে নবীনদের বিদ্রোহ, 'ফিউচারইজম' আন্দোলন, একদল তরুণ লেখক বিশ্ব-সাহিত্যের তীর্থ প্যারিসে চলে গিয়ে সেখান থেকে বার করছে ইস্তাহার। ইতালির সাহিত্যকে তারা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে তুলছে। বিদ্রোহের প্রথম উচ্ছ্বাসে বহু উদ্ভট ও চোখ ঠিকরোনো রীতিও দেখা দিচ্ছে। এদের মধ্যে প্রধান মেরিনেত্তি, নানারকম মুখের আওয়াজ দিয়ে শব্দ বানাবার চেষ্টা করছেন ও ছন্দ ভেঙে কবিতা সাজাবার কায়দায় কবিতায় নানারকম চাক্ষুষ পরিবর্তন আনছেন। যদিও এজরা পাউন্ড বলেছেন, 'ইতালিতে মেরিনেত্তি না থাকলে— ইংরেজিতে জয়েস, এলিয়ট ও আমি যে ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিলুম তা সম্ভব হত না'— কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেরিনেত্তির কবিখ্যাতি সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ইতালির প্রথম দুই দশকের যে কাব্য-আন্দোলন, তার মধ্যে দিনো কামপানাই সকলকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কামপানার জন্ম ১৮৮৫-তে। ১৯৩২-এ মাত্র ৪৭ বছরে বয়েসে একটি উন্মাদ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতা রোমান্টিক রসেরই কবিতা।

জেনোয়ার নারী

তুমি এনে দিলে সমুদ্র থেকে একমুঠো পানা
তোমার অলকে, রৌদ্র তাম্র শরীরে তোমার
প্রবাসী বাতাস নানা দেশ ঘুরে এনেছে বাসনা
আমার জন্য।
আহা, কী দেবীর
মতো সরলতা তোমার তন্বী শরীরের রূপে
ভালোবাসা নয়, নয় যন্ত্রণা, মায়াবি অতীন্দ্রিয়
ছায়া যেন এক অমোঘতা, ফেরে

তোমার শান্ত, ধ্রুব আত্মায়
ভেঙে মিশে যায় আনন্দে, যায় শান্ত অলৌকিক,
যেন তাকে ফের মরুর উষ্ণ ঝড়ে নিয়ে যাবে
দূরে অনন্ত শূন্য আকাশে।
তোমার মুঠোয় এই যে বিশ্ব কত ছোট, কত পলকা

উমবার্তো সাবা

[উমবার্তো সাবা এ শতাব্দীর ইতালীয় কবিতায় একক ব্যতিক্রম। জন্মেছেন মূল ইতালি থেকে অনেক দূরে, অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের ত্রিয়েস্ত দ্বীপে। ত্রিয়েস্ত ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুদিন, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে এই দ্বীপ ইতালির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হয়। তখন সাবা-র বয়েস ৩৫। অর্থাৎ পূর্ণযৌবন পর্যন্ত তিনি ইতালির ভাষায় কবি হয়েও সে দেশের নাগরিক ছিলেন না।

কিন্তু উমবার্তো সাবা এ শতাব্দীর প্রধান তিনজন আধুনিক ইতালীয় কবির অন্যতম। উনগারেত্তি এবং মনতালের সঙ্গে তাঁর নামও সমান শ্রদ্ধেয় এবং ইতালির কবিতায় তাঁর প্রভাব অপরিমিত।

মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে ছিলেন বলে, তিনি সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনের খোঁজ পাননি। প্রত্যেক যুগেই কবিদের শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। শব্দ নির্বাচনে এক প্রকার রুচি এক যুগের কবিদের সময় চিহ্নিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলায় আমরা জন্মদাতাকে বাবা বলে ডাকি, কিন্তু শুদ্ধ 'পিতা' শব্দটি এখনও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়নি, অথবা মুখে বলি, বাড়িটা ভেঙে গেছে, লেখাতে 'ভগ্নস্তূপ' এখনও অচল নয়। কিন্তু, বাঁশির বদলে, কোনও অর্বাচীন কবিও 'হংসী'র সঙ্গে মেলাবার দারুণ লোভ সত্ত্বেও 'বংশী' ব্যবহার করবেন না! কী সেই অলিখিত আইন— যাতে ভাঙার বদলে ভগ্নও চলে, কিন্তু বাঁশির বদলে বংশী চলে না— তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সময় অনুযায়ী এইরকম রুচি গড়ে ওঠে— সব কবিরাই তা টের পেয়ে যান।

মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে সাবা এই ধরনের আধুনিক শব্দ ব্যবহারের রুচি টের পাননি। সুতরাং তিনি নিজস্ব শব্দ ব্যবহারের একটি রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রধানত অনুসরণ করেছেন ক্লাসিক ধারা। সরলতা এবং প্রভূত কবিত্ববোধ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র করেছে।

১৮৮৩ সালে জন্ম, প্রায় সারা জীবনই দূরে কাটিয়ে, উমবার্তো সাবা-র মৃত্যু ১৯৫৩-তে।]

নারী

যখন ছিলে ছোট্ট খুকুমণি
পারতে হুল ফোটাতে
কাঁটার ধার বুনো ফুলের মতো।

তোমার ওই ছোট্ট পা দুখানি
ছিল কেমন বন্য, তুমি অস্ত্র হয়ে লাথি ছুড়তে—
তোমায় ধরা শক্ত ছিল, বিষম শক্ত।
আজও তেমন ছোট্ট আছো

অথচ সুন্দরী।
সময় আর দুঃখ দুই সুতোয় জট বাঁধা
তোমার আমার দুই হৃদয়— আজ হয়েছে এক
এখন তোমার ভ্রমর-কালো চুলের মধ্যে আমার হাত
এখন আর ভয় করি না তোমার ওই ছোট্ট সাদা
খরগোসের মতন দুই ধারালো কান!

"সবুজ ফসল, ফল"

সবুজ ফসল, ফল, রূপসী রানির মতো ঋতুর
বর্ণনা।
বেতের ঝুড়ির মধ্যে ঝলসে ওঠে মিষ্টি স্বাদ
দাঁত লোভী করে।
এক জোড়া তামাটে পা, নগ্ন হাঁটু— আসে, অহংকারী
বালকের— ফের দৌড়ে চলে যায়।
অন্ধকার
নেমে আসে সামান্য দোকানটিতে, গাঢ় হয়—
দ্রুত বুড়ো হয়ে যাওয়া মায়ের মুখের মতো।
সেই ছেলেটা
বাইরে রোদ্দুরে ছুটে যায়, লঘু পায়ে হাল্‌কা ছায়া
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

[মূল কাব্যধারা কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকে সাবা যে প্রাচীনপন্থী হয়ে থাকেননি, কারণ, তাঁর অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক। নিছক আকাশ, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের স্তুতি বা মানুষের মহানুভবতার জয়গান না করে তিনি নিজের জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কথা লিখেছেন। 'গোধূলির কবিদের' মতো ভাষা ব্যবহারে লাঞ্ছিত এবং পরাজিত ভঙ্গি না থাকলেও, তিনি দূরে থেকে এবং না জেনে, মানসিকতায় সমসাময়িক 'গোধূলি কবিতা' আন্দোলনের কাছাকাছি ছিলেন এবং কবিত্বশক্তিতে ওঁদের চেয়ে অনেক বড়।]

জুসেপ্পে উনগারেত্তি

[যদিও বাবা-মা ইতালিয়ান, কিন্তু উনগারেত্তি জন্মেছিলেন মিশরে, এবং লেখাপড়া শিখেছেন প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভালেরি, জিদ, আপোলিনেয়ার প্রভৃতি সাহিত্যের বিখ্যাত মহীপালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, ফরাসি সাহিত্যের আবহাওয়ায় তাঁর মানস গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতালিয়ান সাহিত্যে এক সময় তাঁর নিন্দে ও প্রশংসার প্রবল ঝড় ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইতালিতে তিনিই ছিলেন একক খ্যাতি-অখ্যাতির কেন্দ্র।

জন্ম ১৮৮৮, প্যারিসে লেখাপড়া শেষ করে ইতালিতে এলেন ১৯১৪ সালে। তখন যুদ্ধ। যুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি লড়াই করলেন ইত্যালি ও ফ্রান্সে। ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে বসে কবিতা লিখতেন, তাঁর বন্ধু আপোলিনেয়ারও অন্য দিকের ট্রেঞ্চে বসে তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলি লিখছেন, সেই সময়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে কবিতার বই ছাপলেন। সাংবাদিক বৃত্তি নিয়ে ঘুরলেন সমগ্র ইয়োরোপ, তারপর ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক হিসেবে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধার সময় তাঁকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ব্রাজিল থেকে। এখন রোমে অধ্যাপনা করছেন।

ইতালির কবিতায় হারমেটিক কবিতার যে আন্দোলন শুরু হয়, কিছু ফরাসি কবিও এই অভিধায় ভূষিত হচ্ছেন— উনগারেত্তিকে তার পুরোধা বলা যায়। হারমেটিক আন্দোলন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। হারমেটিক কবিতার আধুনিক অর্থের নিকটতম অনুবাদ হতে পারে— 'বন্ধ কবিতা'। এই কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য, যেকোনও পথ চলতি পাঠক যে হুট করে একবার চোখ বুলিয়ে এই কবিতার রস পাবেন, তার উপায় নেই। অরসিকের কাছে এ কবিতার পথ বন্ধ। এর রস আস্বাদ করতে হলে পাঠককে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে, প্রতিটি শব্দ, ধ্বনি, লাইন সাজানো ছোট বড় লাইন, লাইনের মাঝখানে ফাঁক— এই সবই অর্থময় হতে পারে। এ ছাড়া উপমার নিরাভরণত্ব। যেমন উদারহণ দেওয়া হয়েছে, 'আমার হৃদয়ের মতো একটি পাখি'— এই উপমার আরও সরল রূপ, 'হৃদয়-পাখি'— হারমেটিক কবিরা আরও সরল করে বলবেন, শুধু 'পাখি'। 'পাখি' মানেই কোনও কবিতায় হৃদয়— সেটা বুঝে নিতে হবে। প্রতীকের সঙ্গে উপমার ঠিক কোথায় তফাত, তা অবশ্য বোঝা যায় না।

শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে উনাগারেত্তির ভিন্ন মত আছে। তাঁর মতে, শব্দের কোনও আলাদা

মেজাজ থাকতে পারে না। কোনও শব্দই ইচ্ছে মতো করুণ বা মধুর বা ক্রুদ্ধ হতে পারে না। সব শব্দই ব্যবহার করতে হবে আদি, ঐতিহাসিক (আমাদের ক্ষেত্রে ধাতুগত) অর্থে। বাংলায় উদাহরণ দেওয়া যায়: 'একটি বিধবা যুবতীর কায়ক্লেশে দিন কাটছে' এই কথার প্রচলিত অর্থ, কষ্টেসৃষ্টে কোনওরকমে দিন কাটছে আর কি। কিন্তু 'কায়ক্লেশে'র আদি অর্থ মেনে বুঝতে হবে, বিধবাটির শারীরিক কষ্টও এখানে উল্লেখিত। কিংবা, প্রতিমা শব্দটির সাধারণ অর্থ খড়-মাটি-রঙের মূর্তি— কিন্তু যদি মনে রাখা যায় প্রতিমা আসলে সাদৃশ্য অর্থে 'প্রতিম' শব্দের স্ত্রীরূপ, তবে 'বৃষ্টির প্রতিমা' বা 'ঝড়ের প্রতিমা' ও বিসদৃশ হয় না।]

রহস্য-বিরক্তি

স্তব্ধতা যখন অভঙ্গ জাগে
সতেজ শরীরের প্রতি আমার যাত্রা
আমার দিকে তার বাড়ানো হাত রক্তাভ
আমার সামান্য অগ্রসরে সেই হাত পিছিয়ে যায়।

সুতরাং এখানে এই ব্যর্থ অনুসন্ধানে আমি পরাভূত।
সকাল যখন তরঙ্গময় সে এগিয়ে আসে।
সে হেসে ওঠে, আমার চোখের সামনে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

স্বকৃত উন্মত্ততা, বিরক্তি
প্রভূত নও, কখনও প্রভূত মত্ত এবং মিষ্টি নও তুমি

স্মৃতি কেন তোমার সঙ্গে সমান হাঁটে না?

তোমার দান কি একখণ্ড মেঘ?
এ শুধু ফিসফিস এই স্মৃতির বসতি
ভরায় বৃক্ষের শাখা দুরান্ত সংগীতে

স্মৃতি সঞ্চরমাণ ছবি,
বিষণ্ণ বিদ্রূপময়
রক্তের আঁধার...

ছায়াচ্ছন্ন লাজুক ঝরনার মতো

অলিভ কুঞ্জের প্রাচীন ছায়া
তুমি ফিরে আসো আমায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে
তবুও গোপনে প্রত্যুষে
গোপনে আমি কি তোমার ওষ্ঠাধর প্রত্যাশা করতে পারি...
আর কোনওদিন আমি জানব না!

একটি গ্রামের ভগ্নস্তূপ

এই গৃহগুলির
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না
শুধু কয়েকটি
দেয়ালের ভগ্নাংশ

কত মানুষ
যারা ছিল আমার আপন
কেউ নেই
এমন কী দেয়ালও না

কিন্তু আমার হৃদয়ে
একটি ক্রুশচিহ্নও হারায়নি

আমার হৃদয়
এক রকম অত্যাচারিত গ্রাম

[হারমেটিক কবিতার যে-আলোচনা উপরে করা হয়েছে, অনুবাদ কবিতায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা ইতালির ভাষা জানি না, মূলের প্রতিটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া দুরূহ, তা ছাড়া সেভাবে অনুবাদ করাও যায় না। তবে, আমি লাইনের গতি ঠিক করেছি, এবং ইচ্ছে করেই কোনও বাংলা ছন্দের পোশাক পরাইনি। ফলে, পড়তে হয়তো কিছুটা কর্কশ লাগবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি অস্ট্রিয়ার সান মারটিনো শহরের ভগ্নস্তূপ দেখে লেখা।]

উজিনো মনতালে

[ইতালির কবিতায় জীবিত প্রধান ত্রয়ীর মধ্যে মনতালে অন্যতম। আগে উনগারেত্তি প্রসঙ্গে আমরা যে হারমেটিক কবিতার উল্লেখ করেছি, মনতালে সেই ধারার অপর স্তম্ভ। উনগারেত্তির সঙ্গে মনতালের মূল প্রভেদ, সমালোচকদের মতে এই যে, উনগারেত্তির কবিতায় দুঃখের সুর আছে, কিন্তু সেই দুঃখবোধ খ্রিস্টান-সুলভ— অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত উত্তরণ আছে। কিন্তু মনতালে-র দুঃখবোধ আরও বিধুর, কিছুটা তিক্ত, শেষ পর্যন্ত মুক্তিহীন। মনতালে জানেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত বড় নির্জন, এই পৃথিবীটা অর্থহীন, গাছপালা প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত বস্তুজগৎ ছাড়া আর কিছুই না। (ছেলেবেলায় তিনি প্রকৃতির সামনে বসে দৈববাণীর প্রতীক্ষায় থেকে নিরাশ হয়েছিলেন।) আধুনিক কবির দ্বিধা এবং হতাশার ছাপ তাঁর কবিতায়, পরবর্তীকালে প্রচারিত এক্‌জিস্‌টেনশিয়ালিজমের আভাস পাওয়া যায়। যদিও উনগারেত্তি বড় হয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যের আবহাওয়ায়, এবং মনতালে-র শিক্ষা ইংরেজি আধুনিক সাহিত্য থেকে। ইতালিতে তাঁকে টি এস এলিয়েটের ধারার কবি বলা যায়।

মনতালে-র জন্ম ১৮৯৬-তে, জেনোয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধে গোলন্দাজ হয়ে লড়াই করেছেন। এখন মিলান শহরে একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক।]

দুপুর কাটানো

দুপুর কাটানো, ম্লান, মগ্নতা
ঝলসানো, ভাঙা দেয়ালের পাশে বাগানে,
কান পেতে শোনা, ঝোপের কাঁটার ভিতরে
পাখির কিচির, সাপের চলার খসখস।

মাটির ফাটলে অথবা মাধবীলতায়
লাল পিঁপড়ের আনাগোনা চেয়ে দেখা
কখনও ছড়ায়, কখনও বা সারি বাঁধে
ছোট্ট ঢিবির উপরে ব্যস্ত পিঁপড়ে।

পাতার আড়াল থেকে দূরে চেয়ে দেখা
রেখায় রেখায় সমুদ্র উত্তাল
বাতাসে তখন কর্কশ ভাবে কাঁপে
তৃণহীন টিলা থেকে ঝিঁঝিদের ধ্বনি।

প্রখর রৌদ্রে কিছু দূর হেঁটে যাওয়া
অনুভবে শুধু বিষণ্ণ বিস্ময়
এ জীবন আর জীবনের যত শ্রম
পাশে হেঁটে যাওয়া— এই দেয়ালের মতো
যে-দেয়ালে ভাঙা বোতলের কাচ বসানো।

বান মাছ

বান মাছ, লাস্যময়ী
হিম সমুদ্রের, বালটিক উপসাগর ছেড়ে
এসেছ আমাদের সাগরে,
আমাদের মোহানায়, নদীর ভিতরে
নদীর প্রবাহ থেকে ক্রমশ গভীরে, প্রবল বন্যায়
ভেসে, নদীর প্রতিটি শাখা-উপশাখায়
শিরা-উপশিরায়, সরু হয়ে—
আরও ভিতরে, পাথরের অভ্যন্তরে ঢুকে
কাদার ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে—
তারপর একদিন
চেস্টনাট গাছ থেকে আলোর রেখা এসে ঝলসায়
নিবদ্ধ পুকুরে
পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনায়—
বান মাছ, আলো, চাবুক,
মর্ত্যে ভালোবাসার তীর
যাকে শুধু আমাদের নদীর খাত অথবা
পিরেনিস পর্বতের শুকনো ঝরনায় পথ
ফিরিয়ে দেয় প্রজনন স্বর্গে;
সবুজ আত্মা আবার জীবন খোঁজে
যেখানে শুধু জ্বলন্ত বৃষ্টিহীনতা আর
নির্জনতার ক্ষয়,
স্ফুলিঙ্গ বলে ওঠে
সেই তো সব আরম্ভ, যেখানে সব

জমে যায় কাঠকয়লায়, নিহিত কাষ্ঠে;
তোমার চোখের পাতায় সাজানো
সংক্ষিপ্ত রামধনু
তুমি উজ্জ্বল হও, অচঞ্চল থাকো
মানুষের সন্তানদের মধ্যে, যারা
মগ্ন থাকে তোমার জীবনদায়িনী কর্দমে;
তুমি কি মানো না
সে তোমারই সহোদরা?

[মনতালে-র প্রথম যৌবন এবং পরিণত জীবনের দুটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হল। প্রথমটি তাঁর উনিশ বছর বয়সের রচনা। 'বান মাছ' ইতালীয় ভাষার একটি অত্যন্ত বিখ্যাত কবিতা। সামুদ্রিক বান মাছ হাজার হাজার মাইল পার হয়ে যায়। হয়তো তারা মাটি ফুঁড়েও যেতে পারে— যেমন ভাবে তারা পুকুরে-ডোবায় আসে— এই কল্পনায় মনতালে বলছেন, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো হাজার বান মাছ বালটিক থেকে আড্রিয়াটিক উপসাগরে চলে যাচ্ছে ইতালির পর্বতমালা পেরিয়ে, শেষ পর্যন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়ে মেয়েদের চোখের মণিতে রামধনু হয়ে থাকছে। কবিতাটির শেষ অংশের 'তুমি' অবশ্যই কোনও নারী। দান্তের স্বর্গনিষিক্ত ভালোবাসা মনতালে-র কবিতায় পাতালচারী বান মাছের রূপ নিয়েছে।]

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

[বিক্ষুব্ধ কোয়াসিমোদো চেয়েছিলেন মানুষের পুনর্নির্মাণ। মানুষকে বদলে দিতে। সমালোচকরা ঈষৎ বাঁকা সুরে বলেছেন, কোয়াসিমোদো অতখানি বড় কাজের যোগ্য নন।

অর্থাৎ প্রশ্ন ওঠে, কবি কি শুধুই নতুন সৃষ্টি করে যাবেন? না, এই সৃষ্টি-করা জগৎ ও সমাজ, পরিপার্শ্ব— এর নানান বৈষম্য দূর করার জন্যও ব্যগ্র হবেন, তার মানে, সমসাময়িককালের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়বেন? কোয়াসিমোদো-র জীবনে এই দু'রকম চিন্তাধারার দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখা যায়। প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন আত্মমগ্ন কবি হিসেবে, হারমেটিক ধারার অন্যতম, যখন ধারণা ছিল কবিতাতেই কবিতার শেষ, সে সময়-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনী যখন ইতালির উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়, তখন নিজের গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ কবি নেমে এলেন অনেকটা জনতার কাছাকাছি, কবিতা লিখে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব বোধ করেছিলেন। কোয়াসিমোদো-র এই সামান্য রূপান্তরে পুরনো অনুরাগীরা হতাশ হয়, আবার অন্য একদল নতুন কবির জন্ম হল বলে অভিনন্দন জানায়। ১৯৫৯-র নোবেল প্রাইজ তাঁকে ইতালির সবচেয়ে বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিচয় জানায় পৃথিবীর কাছে।

কোয়াসিমোদো-র জন্ম ১৯০১ সালে, সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউসে। শৈশব সুখে

কাটেনি, 'মায়ের প্রতি চিঠি'তে তার চিহ্ন আছে। ধারাবাহিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। যৌবনে 'সিভিল এনজিনিয়ার্স বিউরো'র কর্মী হিসেবে সারা ইতালি ঘুরেছেন। এখন মিলান শহরের স্থায়ী নাগরিক। সমসাময়িক অন্যান্য বিখ্যাতদের মতো কোয়াসিমোদো ইংরাজি বা ফরাসি সাহিত্য থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেননি। তাঁর যাবতীয় শিক্ষা স্বদেশের ঐতিহ্যে। প্রতিবেশী গ্রিসের কিছু প্রাচীন কবিতারও তিনি অনুবাদ করেছেন।]

প্রায় গান

সূর্যমুখী ঢলে পড়ে পশ্চিমে, দিন
নিজের ভগ্নস্তূপ চোখে অস্ত যায়,
গ্রীষ্মের বাতাস ভারী হয়ে আসে, নুইয়ে দেয়
গাছের পাতা, কারখানার ধোঁয়া ওঠে।
মেঘের শুকনো আনাগোনা, বিদ্যুতের সিরসিরানির সঙ্গে
অন্তরীক্ষের শেষ খেলা দূরে
সরে যায়। আবার বহু বছরের ভালোবাসা—
খালের দু'পাশে ভিড় করা গাছের মধ্যে এসে
আমরা একটু থমকে দাঁড়াই।
তবু আজ আমাদের দিন, তবু সেই
সূর্য তার ছুটি নিয়ে যায়
স্নেহময় রশ্মির গ্রন্থিগুলি গুটিয়ে।
আমার স্মৃতি নেই, আমি আর কিছু মনে করতে চাই না;
মৃত্যু থেকে জেগে ওঠে স্মৃতি,
যেমন জীবন অন্তহীন। প্রতিটি দিনই
আমাদের। একটি দিন এর মধ্যে থেমে থাকবে চিরকাল।
তখন তুমি আমার পাশে, হয়তো সেদিন বড় দেরি হয়ে যাবে।
এখানে খালের কিনারায় বসে, আমাদের পা
দুলছে শিশুদের মতো খেলাচ্ছলে,
এসো আমরা জল দেখি, গাছের শাখাপ্রশাখায়
সবুজের গাঢ় হয়ে আসা দেখি।
নিঃশব্দে যে-লোকটা পিছন থেকে গুঁড়ি মেরে আসছে
ওর হাতে কোনও ছুরি লুকোনো নেই
ও তো শুধু একটা মাধবীলতা।

মায়ের কাছে চিঠি

...আমি উত্তরাঞ্চলে আছি, দুঃখ নেই। নিজের সঙ্গে
শান্তিতে নেই আমি। কিন্তু আমি কারুর কাছে
ক্ষমা প্রত্যাশা করি না, অনেকের কাছেই আমি
চোখের জলে ঋণী, যেমন মানুষের প্রতি মানুষ।
আমি জানি, তুমি ভালো নেই, তুমি বেঁচে আছ
যেমন সব কবিদের মায়েরা থাকে, দরিদ্র,
প্রবাসী ছেলের জন্য খাঁটি ভালোবাসা বুকে নিয়ে। আজ
আমি তোমাকে চিঠি লিখছি।— তুমি বলবে, তবু এতদিনে
ছেলেটা দুটো কথা লিখে জানাল, সেই ছেলেটা যে
একদিন রাত্তিরে পালিয়ে গিয়েছিল একটা ছোট সাইজের কোট পরে,
পকেটে কয়েক লাইন কবিতা। পয়সা ছিল না, এমন চঞ্চল
যে একদিন কেউ হয়তো ওকে মেরেই ফেলবে!
...মা, আমার মনে পড়ে...

[কোয়াসিমোদো-র অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য কবিতা এখানে অনূদিত হল। নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁর কিছু কবিতা আমাদের দেশে অনুবাদ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুন্দর অনুবাদ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় 'তুমি' থাকে, সেই 'তুমি'র কোনও নির্দিষ্ট নাম নেই। কোনও নারী বা পুরুষ বা যুদ্ধে নিহত কোনও আত্মা বা কবিরই অন্য স্বরূপ, কখনও স্পষ্ট বোঝা যায় না। যখন কোনও নারী বলে মনেও হয়, তখনও কোনও নির্দিষ্ট নারী নয়, মনে হয় যেন সমগ্র মহিলা সমাজের প্রতিনিধি যেকোনও একজন।]

পিয়ের পাওলো পাসোলিনি

[ভিড়ের রেস্তোরাঁর মধ্যে হঠাৎ টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে পাসোলিনি চিৎকার করে বললেন, অনর্থক মানুষ, তোমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছ। শোনো আমার কবিতা, এই কবিতাই তোমাদের বেঁচে থাকতে শেখাবে!— পাসোলিনি এইরকম স্বভাবের কবি। ইতালির তরুণ কবিদের মধ্যে পাসোলিনি-ই সবচেয়ে প্রবল এবং দুর্দান্ত, এবং সবচেয়ে বিতর্কমূলক। এক দিকে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা, অপর দিকে একদল তাঁকে কবি বলেই মানতে চান না। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর ছ'টি কবিতা সংগ্রহ বেরিয়েছে। এখন অবশ্য আর তিনি বয়সে ঠিক তরুণ নন।

পাসোলিনির জন্ম ১৯২২-এ। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন, পরে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর ধারণা, লেখকদের শুধু লেখা ছাড়া অন্য কোনও জীবিকা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, পৃথিবীর যেকোনও দেশেই কোনও তরুণ লেখক, বিশেষত কবি, শুধুমাত্র সাহিত্য রচনা করেই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারেন না। ফলে পাসোলিনিকে ফিল্‌মের স্ক্রিপ্‌ট লিখতে হয়, কখনও কখনও নিজে অভিনয়ও করেছেন। ইদানীং পাসোলিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাতেই মুখ্যত আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতালির আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অন্যতম। তাঁর তোলা যিশুর জীবনী একটি বিতর্কমূলক ছায়াছবি। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে শিল্পে নিওরিয়েলিজম নামে যে ধারা এসেছে, ইতালিতে যা সবচেয়ে প্রবল, কবিতাতেও তার প্রভাব দেখা যায়। পাসোলিনির কবিতার বিষয় ইতালির সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। বর্ণনার ভঙ্গি কখনও অতিবাস্তব, অনেকে তাঁর কবিতাকে নিওরিয়েলিস্টিক আখ্যা দিয়েছেন।]

আপেন্নিন

ক্যাসিনো থেকে সেই ছেলেটাকে তার বাপ মা
বিক্রি করে দিয়েছে আনিয়েনের গর্জমান সৈকতে এক
খুনির কাছে, একটি বেশ্যা ওকে মানুষ করে—
ঔপনিবেশিক রাত্রির মধ্যে যখন কিয়ামপিনোর চোখ
ধুয়ে যাওয়া তারায় অন্ধ, বোজানো চোখের পাতার নীচে
উকুনে হাসিতে ছেলেটা গুনগুন করে সম্রাটদের এরোপ্লেনের
শব্দের সঙ্গে গান গায়, আর পথে পথে
কামের প্রহরীদের পদশব্দ,
ময়লা প্রস্রাবখানার আশেপাশে অপেক্ষা করে
সানপাওলো থেকে সান গিয়োভান্নি পর্যন্ত
রোমের চরম উত্তপ্ত পাড়ায়— শুনতে পাওয়া যায়
রাত্রির অবসন্ন প্রহর বেজে উঠছে
উনিশ শো একান্ন-তে গির্জা থেকে গোয়ালঘর
পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যেও ফাটল ধরে।
ইলারিয়ার বন্ধ চোখের পাতায় কাঁপে
ইতালির রাত্রির দূষিত আস্তরণ... অল্প
হাওয়ায় নরম, আলোয় শান্ত...
যুবকদের চিৎকার,

তপ্ত, কটু, ভয়ংকর, উষ্ণ কম্বলের
গন্ধ, এখন ভিজে... দক্ষিণ অঞ্চলের বুড়োদের
কণ্ঠে চালাকি... সমস্বর গান
সপ্তাহান্তের দুটি পুকুরে পুকুরে, গ্রামে।
পাপের প্রদেশ থেকে, শস্তা নোংরা শুঁড়িখানার
সাদা আলোর হৃদয় পর্যন্ত
শহরের উপকণ্ঠে
মাংস এবং দারিদ্র্য শান্ত সহাবস্থান পেয়েছে,

হাওয়ার শব্দ... তারপর। ইলেরিয়ার
ভারী চোখের পাতায় ঘুম ছাড়া
আর কিছুই নেই। এই মেয়েটির মৃত্যুর রূপ
দিয়েছে সকাল, পূর্বকল্পিত, মার্বেল পাথর
হয়ে যাবে। ইতালির আর কিছুই নেই অবশিষ্ট
শুধু তার মার্বেল মৃত্যু ছাড়া, তার ঊষর
বাধাপ্রাপ্ত যৌবন...

তার চোখের পাতার নীচে, ঘুমের মধ্যে
পৃথিবী সশরীরী, চাঁদের আলোর
রূপালী অন্ধকারে একটি কুমারী রথ
পাথরের ধস হয়ে নামছে আপেন্নিন থেকে
খাড়া পাহাড় বেয়ে সোজা নেমে যাচ্ছে উপকূলের
দিকে— যেখানে টিরোনিয়ান এবং আড্রিয়াটিকের
ফেনা মুক্তাখচিত।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে একখণ্ড নগ্ন ঘাস জমিতে
একটি সবুজ বৃত্তে, সোরাক্টের সবুজ উপত্যকার
চামড়া ও ধাতুর গোল আবরণে ঘুমিয়ে আছে
কালচে জ্যাবজেবে একপাল ভেড়া, আর রাখালের
সমস্ত প্রত্যঙ্গ জমাট বেঁধে আছে

চুন পাথরের ওপরে

['আপেন্নিন' নামের একটি বিশাল কবিতার একটি অংশের মুক্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হল। আপেন্নিন সমগ্র ইতালিব্যাপী দীর্ঘ পর্বতমালার নাম। উত্তর দিকে এই পর্বতমালা আল্পসের সঙ্গে মিশেছে। আড্রিয়াটিক সমুদ্রের কাছে এর শিখরের উচ্চতা সাড়ে ন' হাজার ফুট, সেইটাই সর্বোচ্চ। ভিসুভিয়াস সমেত আর কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে এরই মধ্যে। রোম নগরীর চারপাশ ঘিরে আছে আপেন্নিন— এই পার্বত্য অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামের উল্লেখ আছে এই কবিতায়।]

মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চি

[মেয়েদের চোখে দেখা এই পৃথিবী হয়তো সত্যিই অন্যরকম। কিন্তু সাহিত্যে মেয়েদের চোখে দেখা পৃথিবীর সেরকম কোনও উল্লেখযোগ্য ছবি পাওয়া যায়নি। বাংলায় আমরা যাকে বলি 'দৃষ্টিভঙ্গি'— সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেও মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের বহু ক্ষেত্রে ঢের তফাত দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁদেরই আমরা খুব উল্লেখযোগ্য বলি, যাঁদের রচনা অতিমাত্রায় পুরুষালি। পুরুষদের সমকক্ষ হবার বদলে মেয়েদের আলাদা কোনও সাহিত্যরীতি নেই। মেয়েদের কৈশোর থেকে যৌবনে রূপান্তরের সংকটকাল, সন্তানের প্রতি স্নেহ, স্বামীর জন্য ত্যাগ স্বীকার, মুখবুজে সংসারের সমস্ত যাতনা সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়গুলি পুরুষদের রচনাতেই মহৎভাবে ফুটেছে। কে জানে এগুলো সবই অতখানি সত্যি কিনা।

যদিও আমরা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। যেমন, সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ, হাত দু'খানাকে ডানার মতো করে ছেলে-মেয়েদের সব বিপদ থেকে মায়ের আগলে রাখার চেষ্টা, পৃথিবীতে প্রতিদিন চোখে দেখা যায়। কিন্তু চোখে দেখার বাইরেও আরও কিছু অন্ধকার পরিসরে যেতে ছাড়ে না সাহিত্য। জননীর কতখানি আত্মত্যাগ, কিছুই কি আত্মবিপর্যয় নেই? সন্তান যেমন নয়নের মণি, তেমনি সন্তানই জনক-জননীকে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠা থেকেই বাপ-মা বুঝতে পারেন তাঁরা কতখানি বার্ধক্য ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে পুরুষের লেখা কবিতা আছে, কিন্তু পুরুষরা তো স্বার্থপর নামেই বিদিত। মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চির এ কবিতায় একই সঙ্গে সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং নিজের স্বার্থপর ভয়ের কথা আছে।

এই কবিতাটি পুরো বুঝতে হলে জানা দরকার শ্রীমতী মার্ঘেরিটা সুগৃহিণী এবং তিন সন্তানের জননী। তাঁর তৃতীয় সন্তান, মেয়ের জন্মের পর এ কবিতা লেখা। তাঁর এখন বয়েস ৪৫, শিক্ষয়িত্রী। জন্ম ফ্লোরেন্সে ১৯২১-এ, ইংরেজি সাহিত্যে বি এ পাশ করার পর ঔপন্যাসিক লুসা প্রিমাকে বিয়ে করেছেন। সাম্প্রতিক ইতালির কবিদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট এবং এই হিসেবে তিনি নতুন ধরনের কবি যে তাঁর রচনা স্পষ্ট ও নির্ভীক এবং একটি নারী হিসেবে তাঁর চোখে দেখা জগৎই তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন।

অংশ কবিতা

বহুবার নভেম্বর ফিরে ফিরে আসে
আমার জীবনে, আজ যার শুরু হল
সে নয় জঘন্যতম; শান্ত একটি দিন
কিছুটা অস্বস্তিময়। আজ আমি ঝুঁকে আছি
একটি দোলনার কাছে, আমার কনিষ্ঠতম
মেয়েটি ঘুমোয়, তার গভীর রহস্যময় ঘুম, যেন আজও
অতিথি এখানে, এই পৃথিবীর নাগরিক নয়, এখনও অচেনা
আমার স্তনের মধ্যে দুধ ভরে ওঠার সুমিষ্ট ঘ্রাণ আমি
টের পাই, কী এক নরম অনুভব
স্নায়ুর প্রতিটি তন্ত্রে, শরীরের সীমানা ছাড়ায়।
আজ এই ক্লান্ত রক্ত গোপন ঝরনার দিকে ফিরে
পুনরায় পুণ্য হল, রক্তের অপাপ রূপান্তর
শিশুর অপাপ ওষ্ঠে তৃষ্ণা হরণের যোগ্য হয়।
আমার শরীর এক অলৌকিক যন্ত্র, এ-ই শুধু
জীবনের জন্ম দিতে পারে। স্তন দুটি
যেন রূপকথার পাহাড়, এই প্রাচুর্যের নদী
বহে যায় স্বর্ণ যুগে, আর এই অবোধ শিশুর
স্মৃতির গভীরতম নদীগর্ভ সৃষ্টি হয়ে যায়, এ স্মৃতির কাছে জানি
সে আবার ফিরে আসবে একদিন স্বপ্নে কিংবা গাঢ় বেদনায়...
ওর জন্য এই ছবি স্পষ্ট, আর আমি,
আমি উপলক্ষ আজ, সময় নিষ্ঠুর ক্রুর হাতে
আমাকে বিবর্ণ করা আরম্ভ করেছে। হয়তো এই
শেষবার, আমি মাতা, এক শিশুর ধরিত্রী, কেননা আমার
দারুণ বৎসরগুলি শুষ্ক করে টেনে নিচ্ছে রস
শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গ থেকে। জানি আজও আমি
একটি জীবন্ত বৃক্ষ, হাওয়ায় ঝিলমিল করে পাতা
শরীরে এখনও আছে জন্মবীজ, কিন্তু জানি ঊষর সময়
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রাস করে নেবেই আমাকে।
কী চমৎকার এই ক্ষণিক বিরতি, আমি আজ
নিজেই নিজের কাছে হেমন্তের দিন;
সামান্য আশঙ্কা আর ভয় তাকে ঢেকে আছে।
দীর্ঘ রাজপথ হয়ে আমার অতীত

পিছনে বিস্তীর্ণ, শুধু ভবিষ্যৎ চোখ তুলে এইটুকু জানি
আমার অতীত যত দীর্ঘ ছিল, ভবিষ্যৎ তার
কিছু ছোট হবে।

['সন্তদের দিন' নামের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ এখানে অনূদিত হল। যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতিকে তিনি 'শরৎকাল' বলেছেন, যেহেতু ওর পরেই শীত। কিন্তু আমি 'অটামের' অনুবাদ হেমন্ত করেছি, এইরকম অর্থে হেমন্তের উল্লেখ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।]

জার্মান কবিতা: দৃষ্টিবদল

জুরিখে ত্রিস্তান জারা যখন 'ক্যাবারে ভলতেয়ার'-এ নীবন সাহিত্যের হই-হল্লায় ডাডা আন্দোলন শুরু করেছিল, সেই কাছাকাছি সময়েই বার্লিনের নিউয়ের ক্লাবের সভ্যরা 'নিউপ্যাথেটিক ক্যাবারে'-তে চিৎকার করে অন্য ধরনের কবিতা পাঠ করে নতুন এক্সপ্রেশানিস্ট সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করতে চাইছিলেন। এঁদের বিদ্রোহ কৃত্রিম কবিত্ব এবং আদর্শের বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে। ওদিকে ইতালির কবি মেরিনেত্তি শুরু করেছেন ফিউচারইজম, প্যারিস থেকে বেরিয়েছে তাঁর ঘোষণাপত্র, ফরাসি ও ইংরেজ কবিরা তাতে আকৃষ্ট হচ্ছেন আস্তে আস্তে, সেই ঢেউ জার্মানিতেও এসে পৌঁছুল। প্রায় কাছাকাছি সময়ে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, কাছাকাছি ধরনের কিন্তু আলাদা নামের সাহিত্যরীতির উদ্ভব হয়। মূলভাবে বলতে গেলে, ফ্রান্সে সুররিয়ালিজম, ইংল্যান্ডে ইমেজিজম, ইতালিতে ফিউচারিজম ও জার্মানিতে এক্সপ্রেশানিজম।

জার্মানির এক্সপ্রেশানিজম আন্দোলন অবশ্য খুব সংঘবদ্ধভাবে হয়নি, অনেকটা অপর সাহিত্যগুলির নবীন রশ্মির প্রভাবে স্বতোৎসারিত হয়ে ওঠে। এক্সপ্রেশানিজম কথাটার প্রথম ব্যবহার হয় ফ্রান্সে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে, বস্তুত ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের থেকে আলাদা হবার জন্যই এই নতুন রীতির উদ্ভব। বিমূর্ত শিল্পেরও শুরু এই সময় থেকে। অর্থাৎ যা চোখে দেখা যায় শিল্প সাহিত্যে তার প্রতিচিত্র বা ছায়া উপস্থিত করার বিরুদ্ধ মনোভাব জেগে ওঠে, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বদলে আন্তরিক উপলব্ধির সত্য প্রকাশ করতে চাইলেন এক্সপ্রেশানিস্টরা। বেনডেট্রো ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে যেমন সৌন্দর্যের রূপের বদলে অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যেই এক্সপ্রেশানিস্টদের প্রাথমিক বিকাশ, দৃষ্টিবদলের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা কবিতায় নতুন ভাষা ও রূপ, বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা আনলেন, সবচেয়ে বিশেষত্ব এঁদের মধ্যে অনেকেরই উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহারের আমূল পরিবর্তনে। যেন, মতন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কবিত্বময় ছবির ব্যবহারের এঁরা সমূল উচ্ছেদ করলেন, ভাব ও চিত্র এক সঙ্গে মিলেমিশে গেল। ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, যদি মনে করা যায় যে ১৯১৪ সালেই ছাপা হয়েছিল, ফ্রানৎস কাফ্‌কার মেটামরফসিস নামের গল্পটি, যার নায়ক গ্রিগর সামসা জেগে উঠে দেখল সে সত্যিই একটা পোকা হয়ে গেছে, তার মনটা পোকার মতন হয়নি বা সে নিজেকে পোকা হিসেবে ভুল ভাবেনি। এখানে বিধেয় ও ভাবনা একরকম হয়ে গেল।

এক্সপ্রেশানিজমের প্রথম পর্ব খুব সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়, কারণ এর প্রধান উদ্যোক্তারা শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এবং প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয় অল্প বয়সে। প্রথম মহাযুদ্ধ যে কত কবিকে খুন করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আলফ্রেড লিসটেনস্টাইনের মৃত্যু হয় পঁচিশ বছরে, যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গেয়র্গ ট্রাকল ও আর্নস্ট স্টেডলার দু'জনেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান— ওই বছরেই। অগুস্ট স্ট্রাম— যাঁর নতুনত্বের কায়দা ছিল সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো— তিনি যুদ্ধে নিহত হন পরের বছর। যুদ্ধ আরম্ভ হবার দু' বছর আগেই, গেয়র্গ হেইম, যাঁকে বলা হত ধ্বংসের প্রবক্তা, তিনি এক জলে-ডোবা বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও মারা যান। জেবক ফন হোডিস, যাঁর কবিতাকে প্রথম এক্সপ্রেশানিস্ট কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তিনি ১৯১৪ সালেই পাগল হয়ে যান। এইভাবে এই তরুণ বিদ্রোহীরা হাউয়ের মতন অল্পকাল দপ করে জ্বলে উঠে অকস্মাৎ মিলিয়ে গেলেন। এঁদের নিজস্ব কবিতা কালোত্তীর্ণ হবার উপযোগী হতে সময় পেল না, কিন্তু মাতৃভাষার কবিতায় একটা বাঁক এনে দিয়ে গেল। এঁদের মধ্যে শুধু একজন, গেয়র্গ ট্রাকলকে আমি বেছে নিয়েছি।

এরপর আরম্ভ হয় এক্সপ্রেশানিজমের দ্বিতীয় পর্ব, অন্যান্য কবিদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

স্টেফান গেয়র্গ

[হোল্ডারলিনের কবিতা বাংলায় জনপ্রিয় করেছেন বুদ্ধদেব বসু। হাইনে অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে মুজতবা আলি পর্যন্ত। ১৯৫৬ সাল আন্দাজ হঠাৎ কলকাতায় খুব রিলকের কবিতা পড়ার হাওয়া ওঠে। প্রায় এঁদেরই সমান উল্লেখযোগ্য হয়েও স্টেফান গেয়র্গের কবিতা বাংলায় কখনও কী কারণে যেন খুব মনোযোগ পায়নি। পূর্বোল্লিখিত কবিদের মতো অমন বর্ণময় জীবন নয় তাঁর, হোল্ডারলিনের মতো প্রভুপত্নীকে ভালোবেসে বদ্ধোন্মাদ হননি, হাইনের মতো নির্বাসিত জীবনে রহস্যময়ীর সেবা পাননি, রিলকের মতো দুর্গপ্রাকারে বসে দৈববাণীতে কবিতার লাইন পাননি, বরং হিটলারের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

গেয়র্গের জন্ম ১৮৬৮-তে। কোনও সমালোচকের মতে, তিনি নাকি দশ বছর বয়েসের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে তিনি আলাদা জগৎ তৈরি করবেন। ধনী পরিবারে জন্ম, শৈশব থেকেই পিতার কাছ থেকে সাহিত্যচর্চায় প্রশ্রয় পেয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন শুধু নিজেরই জন্য, বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছেই শোনাতেন, বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার পর নিজেকে তিনি একজন মহাপুরুষ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর উগ্র মতবাদ প্রচার শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অভ্যুদিত নাৎসিবাদ, নিৎসের মতো গেয়র্গের মতামতকেও ঈষৎ

বিকৃত করে কাজে লাগাতে দেরি করেনি। প্রথমদিকে গেয়র্গ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এজরা পাউন্ডের মতো চূড়ান্ত পর্যন্ত যেতে হয়নি, হিটলার ক্ষমতায় আসার পর দলের প্রবক্তা এবং সভাকবি করার জন্য গেয়র্গকে আহ্বান করেন, সেই সময়েই তিনি নিঃশব্দে পালিয়ে যান সুইটসারল্যান্ড এবং অচিরেই মৃত্যু, ১৯৩৩-এ।

প্রভূত পাণ্ডিত্য এবং মনীষা সত্ত্বেও গেয়র্গের কবিতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। জার্মান সাহিত্যে তাঁর আসন চিরস্থায়ী। ফরাসি সিম্বলিস্টদের কাছে তাঁর শিক্ষা, বোদলেয়ারের সমগ্র লে ফ্লর দু মাল অনুবাদ করেছেন, র‍্যাঁবোকে গুলি করার পর ভের্লেন যখন দু' বছর জেল খেটে বেরিয়ে আসছেন, গেয়র্গ ছিলেন সেখানে। মোট সাতটি ভাষা তিনি অনুবাদ করেছেন।]

তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু

তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু
তুমি সকালের মতো এত কোমল উজ্জ্বল
তুমি মহৎ বৃক্ষের থেকে প্রস্ফুটিত শাখা
তুমি পাহাড়ি ঝরনার মতো গোপন সরল
রৌদ্রময় মাঠে মাঠে তুমি আছো আমার সন্নিধে
তুমিই আলোর মতো তুমি কুয়াশায়
সায়াহ্নের শীতে তুমি কেঁপে ওঠো আমার শরীরে
তুমি ঠান্ডা হাওয়া, তুমি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

তুমি আমার বাসনা তুমি আমার ভাবনা
আমি প্রত্যেক নিশ্বাসে করি তোমাকে গ্রহণ
আমি প্রত্যেক চুমুকে করি তোমাকেই পান
আমি প্রত্যেক সুগন্ধে করি তোমার চুম্বন।
তুমি মহৎ বৃক্ষের থেকে প্রস্ফুটিত শাখা
তুমি পাহাড়ি ঝরনার মতো গোপন সরল
তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু
তুমি সকালের মতো এত কোমল উজ্জ্বল।

দ্বীপের প্রভু

মৎস্যজীবীদের গল্পে শোনা যায়, দক্ষিণ প্রদেশে
সুগন্ধ মশলা, তেল ভরা এক দারুচিনি দ্বীপে
যেখানে বালির মধ্যে ঝলসায় বহুমূল্য মণি
সেইখানে আছে এক পাখি, যার ডানা
মাটিতে ছড়ানো থাকে তবু ঠোঁট তুলে
বিশাল গাছের মাথা ছিঁড়ে আনতে পারে।
শামুকের রস মাখা যেন তার পালকের রং
যখন সে উড়ে যায় অল্প উঁচু, বিশাল শরীরে
মনে হয় যেন এক খণ্ড কালো মেঘ।
দিবাভাগে সে লুকোয় বনের ভিতরে
সন্ধেবেলা ফিরে আসে সমুদ্রের পাড়ে
ঝাঁঝি ও নুনের ঘ্রাণ ভরা সেই সমুদ্র বাতাসে
তার মিষ্টি শিস ওঠে, তীব্র হয়ে ভাসে—
শুশুকেরা গান ভালোবেসে আসে সৈকতের পাশে
সমুদ্রে সোনার পাখনা, স্বর্ণ উচ্ছলতা,
সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সে ছিল এরকম
দৈবাৎ জাহাজ-ভাঙা মানুষেরা এক পলক দেখতে পেত তাকে
প্রথম যেদিন সাদা পাল তুলে মানব সভ্যতা
জাহাজের মুখ ফেরায় সেই দ্বীপে দৈবের নির্দেশে
সেই পাখি উড়ে গিয়ে বসল এক পাহাড় চূড়ায়
চেয়ে রইল নির্নিমেষে তার প্রিয় দ্বীপটির দিকে
বিষাদের চাপা স্বর তুলে মরে রইল সেখানেই।

[প্রথম কবিতাটি একটি প্রেমের কবিতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে লেখা কোনও বাংলা কবিতা এ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। ভালোবাসা এখানে শারীরিক আস্বাদের স্তরে এসেছে পর্যন্ত, কিন্তু কবিতাটি একটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লেখা। অর্থাৎ এই ভালোবাসা অনেকটা গ্রিক আদর্শের। ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রনবার্গার নামে একটি দেবপ্রতিম কিশোরকে তিনি ম্যাক্সিমিন নামে ডাকতেন এবং তাঁকে মনে করতেন প্রাচীন গ্রিসীয় আদর্শের প্রতিমূর্তি। ছেলেটি অকালে মারা যায়। গেয়র্গ এই কবিতাটি লেখেন, ম্যাক্সিমিন মারা যাবার কুড়ি বছর পরে। দ্বিতীয় কবিতায় শুশুকদের সংগীত প্রীতির প্রসঙ্গেও প্রাচীন গ্রিসের উপকথার উল্লেখ। কবি অরিওনকে জাহাজে দস্যুরা সর্বস্ব লুট করে যখন সমুদ্রে ফেলে দিতে যায়, তখন অরিওন শেষবারের মতো একটি গান গাইবার অনুমতি

চেয়েছিলেন। তাঁর মধুর গান শুনে হাজার হাজার শুশুক জাহাজের পাশে এসে ভিড় করে এবং অরিওন তখন নিজেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন। এবং শুশুকরা তাঁকে কাঁধে করে নির্বিঘ্নে পাড়ে পৌঁছে দেয়। গেয়র্গের অনেক কবিতাই সভ্যতা শুরু হবার আগের জগৎ নিয়ে।]

হুগো ফন হফমান্সথাল

[হফমান্সথালের জন্ম ভিয়েনায়, ১৮৭৪-এ। যদিও ভিক্টর য়ুগো সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের সাহিত্য সাধনায় রোমান্টিসিজমকে অস্বীকার করেছেন। 'দু'জন' কবিতাটি যখন লেখেন, তখন তাঁর বয়েস ২৬, এবং জার্মান সাহিত্যে তাঁর আসন তখনই অবিসংবাদীভাবে স্বীকৃত, কিন্তু ক্রমশ তিনি কবিতা থেকে সরে গিয়ে মঞ্চ জগতে আশ্রয় নেন। জার্মান গীতিনাট্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর নাম। সোফোক্লিস, মলিয়েরের ভাষান্তর ছাড়াও তিনি কয়েকটি কালোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি লিখেছেন নিজে— এবং সুরকার হিসেবে পেয়েছিলেন রিচার্ড স্ট্রাউসকে। এখন জার্মান সাহিত্যে তাঁর সুনাম প্রধানত প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার হিসেবে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিরা হফমান্সথালের কবিতারই বেশি ভক্ত। ওঁর ছেলে হঠাৎ আত্মহত্যা করায়, ভগ্নহৃদয় হফমান্সথালের মৃত্যু ১৯২৯-এ।]

দু'জন

মেয়েটি এক হাতে নিয়েছে পাত্রখানি
মুখ ও চিবুক বাসনের মতো ডৌল
এমন সহজ, নির্ভয় তার লীলায়িত পথ চলা
হাতের পাত্র থেকে এক ফোঁটা উছলে পড়েনি মাটিতে
এমনই সহজ এবং কঠিন ছিল পুরুষের হাত
তরুণ অশ্বে আরূঢ় ছিলেন তিনি
এবং তখন অনায়াস ভঙ্গিতে
থামালেন সেই বেগচঞ্চল অশ্ব।
যা হোক, যখন মেয়েটির হাত থেকে
পাত্রটি নিতে হাত বাড়ালেন ঝুঁকে
দু'জনেরই কাছে সে কাজ বিষম কঠিন
দু'জনেই খুব কেঁপে উঠেছিল তখন
দু'জনের হাত ছোঁয়নি পরস্পর
গাঢ় লাল মদ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

বহির্জীবনের ব্যালাড

গভীর দু' চোখ নিয়ে শিশু বড় হয়
কিছুই জানে না তারা, বড় হয়, ফের মরে যায়।
মানুষেরা চলে যায় যে-যার রাস্তায়।

তেতো ফল একদিন মিষ্টি হয়ে ওঠে
মরা পাখিদের মতো ঝরে যায় রাতে
কয়েকদিন পড়ে থাকে, ফের মরে যায়।

হাওয়া আছে সব সময়, তবু বার বার
কত কথা শুনি আমরা কত কথা বলি
শরীরের যন্ত্রপাতি সুখ আর দুঃখ ভোগ করে।
ঘাসের ভিতর দিয়ে রাস্তা হয়, গ্রাম ও শহর
এখানে ওখানে ভরা পুকুর ও গাছপালা, আলো
কিছু আছে বিশ্রী লোক, কিছু আছে মড়ার মতন।

কেন এরা বেড়ে ওঠে? কেন পরস্পর
দু'জন সমান হয় না? কেন এরা এত সংখ্যাহীন?
কেন একবার হাসি, তার পরই কান্না, শুকনো হাওয়া?

এইসব ছেলেখেলা— আমাদের কাছে আর কতটুকু দামি
আমরা ক'জন তবু রয়েছি অসাধারণ, অনন্ত একাকী
চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, কখনও খুঁজিনি কোনও শেষ।

এত সব বিচিত্রকে লক্ষ করা কেন প্রয়োজন?
যা হোক, সেই তো সব কিছু বলে, যে বলে 'সায়াহ্ন'
এই এক শব্দ থেকে ভেসে ওঠে গভীর কাতর স্বর, দুঃখ নিরবধি
শূন্য মৌচাক থেকে যেরকম প্রবাহিত মধু।

[হফমান্সথালের "দু'জন" কবিতাটি বর্তমান লেখকের খুব প্রিয়, শুদ্ধ কবিতার রূপাঙ্কিত এই রচনা, অথচ বাংলায় এই কবিতাটির যথাযথ অনুবাদ প্রায় অসম্ভব। কারণ, বাংলা সর্বনামে নারী-পুরুষ বোঝা যায় না। সে বা তার ছাড়া কবিতাটিতে অন্য কোনও বর্ণনা নেই, অথচ বাংলায় মেয়েটি বা পুরুষ লিখিতে বাধ্য হলুম। 'মেয়েটি' ইত্যাদি লেখার বিপদ এই যে, এতে বয়েস বোঝা যায়। বালিকা, কিশোরী, যুবতী, রমণী বা নারী— সবই বয়েসবাচক,

যেমন ছেলেটা, লোকটা, লোকটি, পুরুষ ইত্যাদি। অথচ 'সে'— বা 'তার'-এর কোনও বয়েস নেই। যথাযথ শব্দের অভাবে বাংলা কবিতা এখনও অতিকথন দোষে দুষ্ট। প্রথম লাইনেই 'মেয়েটি' ব্যবহার করতে না হলে, এই অনুবাদের আকার নিশ্চয়ই বদলে যেত।

যেমন, দ্বিতীয় লাইনে, মেয়েটি যে সুরার পাত্রটি ধরে আছে, তার হাতলের সঙ্গে মেয়েটির মুখ ও চিবুকের রেখার তুলনা করা হয়েছে। আমি বরং উপমাটি নষ্ট করে দিয়েছি, তবু হাতল ব্যবহার করিনি। একটি মেয়ের (সুন্দরী, বলাই বাহুল্য) মুখের সঙ্গে তুলনা দিতে, এই রকম কবিতায় হাতলের মতো শব্দ ব্যবহার করতে মন চায় না। চেয়ারের হাতল আছে, লরি স্টার্ট দেবার জন্য যে বিকট লোহার ডাণ্ডাটা ঘোরাতে হয়, সেটার নাম হাতল, অফিসে যাবার সময় ট্রাম-বাসের যে দুর্লভ অংশটুকু ধরে ঝুলে থাকা যায়, তার নামও হাতল, আর চায়ের কাপটি পাতলা ঠোঁটের কাছে তুলে আনার জন্য কোনও নবীনা নারী চম্পক অঙ্গুলিতে কাপের যে-অংশটা ধরে থাকে, তার নামও হাতল? সত্যি, কী গরিব আমরা। কত অল্পে কাজ চালাচ্ছি।

হাত থেকে মদ চলকে পড়ে যাবার মানে হল, দু'জনের মিল হবে না। হফমান্সথালের কবিতার প্রতিটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েটির চঞ্চলতা, সহজ ভাব ও পুরুষটির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, তবু দু'জনে যখন মিলিত হয়, তখন কেঁপে উঠেছিল। মদ পড়ে যাওয়া রক্তেরও প্রতীক। অর্থাৎ মিলন। এই শতাব্দীর শুরুতেই প্রথম দেখা দিল মিলনের মধ্যে সব সময় কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছুটা দূরত্ব ও অস্বস্তি।

দ্বিতীয় কবিতার শেষ দিকে 'আমরা', এই শতাব্দী-পরিবর্তনের কবিরা। 'সায়াহ্ন' কথাটির অর্থ— না অর্থ নয়, ভাব— কবিতা। 'সায়াহ্ন'র কথা বলা মানে এখানে কবিতা লেখা। জীবনের সব কিছুই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি তা কবিতার মধ্য দিয়ে বলা না যায়।]

রাইনের মারিয়া রিলকে

[রিলকের জন্ম চেকোশ্লোভাকিয়ায়, ১৮৭৫ সালে। কৈশোর কেটেছে সামরিক বিদ্যালয়ে। যৌবনে তিনি নিজের কবিতা ছাপিয়ে প্রাহা শহরের পথে পথে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন পর্যন্ত। পরে তাঁর জীবন একেবারে বদলে যায়। একাধিক রূপবতী ও ধনবতী মহিলা তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন ও তাঁর জন্য প্রচুর সুযোগের সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। একবার তাঁর জন্য একটি সম্পূর্ণ দুর্গ-ভবন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কথিত আছে যার চূড়ায় বসে রিলকে দৈবী প্রেরণার প্রতীক্ষা করে ছিলেন। নিৎসের প্রেমিকা ও ফ্রয়েডের বান্ধবী লু আনড্রিয়াস সালোমির সঙ্গে তিনি রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন ১৮৯৯ সালে, সেখানে টলস্টয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরের বছর ক্লারা ওয়েস্টহপ নাম্নী ভাস্করকে বিয়ে করার পর প্যারিসে কিছুদিন রোদ্যাঁর কাছে ছিলেন। এর পর অনুরাগী-অনুরাগিণীদের আতিথ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে জোর করে ডাকা হয়েছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। শেষ পর্যন্ত বহু সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত আবেদনের ফলে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৬ সালে সুইটসারল্যান্ডে লিউকোমিয়া রোগে রিলকের মৃত্যু।

এক শতাব্দীর মধ্যে জার্মান ভাষায় সবচেয়ে বড় কবি এবং পৃথিবী ধ্বংস হবার আগের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন রিলকে। বাংলার প্রধান কবিরা রিলকের অনেক কবিতা অনুবাদ করেছেন, বুদ্ধদেব বসু, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখদের অনুবাদ বিশেষ পরিচিত। রিলকের কবিতার ভাষান্তরণ অতীব শক্ত, কোনও কোনও সমালোচক হয়তো রোদ্যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা মনে রেখেই— তাঁকে বলেছেন, 'শব্দ-ভাস্কর'। শুনেছি বহু শিক্ষিত জার্মানের পক্ষেও 'ডুইনো এলেজি'র বহু সাধারণ বাক্যের অসাধারণ প্রয়োগ বুঝতে পারা যথেষ্ট শক্ত। প্রথম জীবনে সরল রচনা দিয়ে শুরু করে ক্রমশ কঠিন দুর্বোধ্য শিখরে আরোহণ করেছেন রিলকে। এখানে রিলকের দুটি অপেক্ষাকৃত সরল কবিতা, যা বাংলায় আগে অনূদিত হয়নি, দেওয়া হল।

রিলকে মূল ফরাসিতেও অনেক কবিতা লিখেছেন। টি এস এলিয়টও তাঁর কাব্য সংগ্রহের শেষ সংস্করণে কয়েকটি নিজস্ব ফরাসি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মাতৃভাষায় ছাড়া কবিতা লেখা যায় না— এলিয়ট ও রিলকের ফরাসি রচনা এই ধারণার বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু এলিয়টের মূল ফরাসি রচনা ফরাসি দেশে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি। আর রিলকের ফরাসি কবিতা সম্পর্কে ফরাসিরা বলেন, তাঁর রচনায় কিছু 'মিষ্টি ভুল' আছে।]

পাথরের সেতু

পাথরের সেতুর উপরে ওই যে অন্ধ মানুষটি আছে দাঁড়িয়ে
নামহীন বহু পরিধির সীমা-পাথরের মতন ধূসর
হয়তো ও-ই সে উপাদান, সেই অনন্ত কালের একমাত্র
যাকে ঘিরে বহু দূরে অনাদি নক্ষত্র কাল ঘূর্ণ্যমান,
ও সেই ভিখারি, এখনও সপ্তর্ষিদলে কেন্দ্রবিন্দু
ওর চার পাশ থেকে ঝরে পড়া সকল স্রোতের ধারা চরম উজ্জ্বল।

ও-ই সে অনড় ন্যায় দেবপ্রিয় একমাত্র সৃষ্টি
বসে আছে নানান জটিল ধাঁধা রাজপথের কেন্দ্রে
এখানেই মৃত্তিকার জগতের ম্লান প্রবেশের দ্বারপথে
কৃত্রিম মনুষ্য ভিড়ে অন্ধ বসে আছে এখানেই।

মৃতদেহ প্রক্ষালন

[একটি ফ্ল্যাট বাড়ির অগোছালো ঘরে একজন মানুষ মরে পড়ে আছে। তার সেখানে কোনও আত্মীয় বন্ধু নেই। দু'জন স্ত্রীলোককে ডাকা হয়েছে তার মৃতদেহ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে।]

তারা লোকটিকে কিছু চিনেছিল, কিন্তু যে-সময়ে
রান্নাঘর থেকে এল কুপি, জ্বলতে লাগল থিরথিরিয়ে
অন্ধকার হাওয়া চলাচলে— সেই অজানা মানুষ
হয়ে এল সম্পূর্ণ অচেনা। তারা তার কণ্ঠনালি ধুয়ে দিল,
এবং যে-হেতু তারা কিছুই জানত না তার জীবনের গল্প
নিজেরাই বানিয়ে নিল অন্য জীবন
ধোয়া মোছা ঠিক চলেছে, একজন কেশে উঠল একবার
একজন এক সময় ভারী ভিজে ভিনিগার স্পঞ্জ
রাখল সেই মুখে। অর্থাৎ সেই সময়ে একটু বিরতি
দ্বিতীয় নারীর জন্য। শক্ত রুক্ষ ব্রাশ থেকে জল
ঝরছে টিপটিপ করে; মৃতের ভয়ংকর হাত
মুচড়ে থেকে যেন সেই মুহূর্তের সমগ্র গৃহকে
জানাতে চেয়েছে, আর তার কোনও তৃষ্ণা নেই।

এবং সে প্রমাণও করেছে। যেন অপ্রস্তুত হয়ে সেই দু'জন নারী
সংক্ষিপ্ত কাশি দিয়ে আরও দ্রুত মোছা শুরু করে,
তারা কাজ করে যায়, দেয়ালের রঙিন কাগজে
দু'জনের বক্র ছায়া কুঁকড়ে ওঠে, কখনও গড়ায়

যেন পাশবদ্ধ, সেই দেওয়ালের চতুর্দিকে নিঃশব্দ নকশায়
যতক্ষণ চলে সেই দু'জনের সব ধোয়া মোছা
পর্দাহীন জানালার কাছে এক থেমে থাকা রাত্রি
অত্যন্ত নির্দয়। সেই নামহীন দেহ
শুয়ে থাকে নগ্ন পরিচ্ছন্ন, নিয়মের সৃষ্টি হয়।

[ঈশ্বর গরিবদের কেন বেশি ভালোবাসেন? 'ঈশ্বরের গল্পে' রিলকে বলেছিলেন, ঈশ্বর যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন সেই প্রথম মানুষ আদম, বেঁচে ওঠার অতি ব্যস্ততায় নিজেই ঈশ্বরের হাত থেকে লাফিয়ে নেমে যায়। ঈশ্বর যখন এক মুহূর্ত পরে তাকে খোঁজার জন্য তাকালেন (ঈশ্বরের এক মুহূর্ত অর্থাৎ এক কল্পান্ত)— দেখলেন সারা পৃথিবী গিসগিস

করছে মানুষে, কিন্তু সবাই, পোশাক-পরিচ্ছদে ঢেকে আছে, সুতরাং তিনি ঠিক কীভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তা আর দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, তিনি এমন একটি দরিদ্র মানুষকে সৃষ্টি করবেন, যে কিছুতেই জামাকাপড় পরে নগ্নতা ঢাকতে পারবে না। ঈশ্বর নিজের আসল সৃষ্টিকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন সব সময়।... রিলকের গুরু রোদ্যাঁও বলতেন, নগ্নতাই পৃথিবীর মূল সৌন্দর্য। প্যারিসের পঁ দু ক্যারুজেল নামে পাথরের সেতুর ওপর বসে থাকা অন্ধ ভিখিরিই এ জন্য প্রথম কবিতাটিতে প্রধান পুরুষ।

দ্বিতীয় কবিতায়, মৃতদেহ ধোয়া মোছা যেন রাজসিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠানের মতোই ঠিক বিপরীত। বহুমূল্য পোশাক ও মুকুট পরানোর বদলে এখানে সব কিছু খুলে ফেলা জীবন ছেড়ে মৃত্যুর সিংহাসনে অধিষ্ঠানের জন্য। মুখের ওপর ভিজে স্পঞ্জ রাখা, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতীক। রিলকের কবিতায় অন্যত্র সেই বর্ণনা আছে। যিশুর মুখের সামনে মদ-ভেজানো স্পঞ্জ তুলে ধরেছিল নিষ্ঠুর রক্ষীরা। এখানে শবদেহ বুঝিয়ে দিচ্ছে, তার আর তৃষ্ণা নেই। কবিতাটি কথ্য গদ্য ভঙ্গিতে লেখা, চাপা ছন্দ আছে, দ্বিধার মুহূর্তে সামান্য বিচ্যুতি।]

রুডলফ আলেকসান্ডার শ্রয়েডর

[জার্মান সাহিত্যের জন্ম ধর্মগীতি ও সন্তদের জীবন গাথায়। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরেই ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম হয়। কয়েকটি দেশের—যেসব ভাষাকে বলা হয় রোমান্স ল্যাঙ্গয়েজ, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, প্রভাঁসাল, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাদের জননী ল্যাটিন, সেসব দেশের ভাষাগুলির জন্ম হতে একটু দেরি হয়েছে। কারণ, উন্নত-ভাষা ল্যাটিন ছিল শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ভাষা এবং সেই ভাষাই হয়েছে প্রথম দিকে খ্রিস্টধর্মের বাহন। কিন্তু ল্যাটিন যাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য গির্জার প্রচারকরা স্থানীয় ভাষার উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। বাংলা দেশেও শ্রীরামপুরের পাদরিদের বাংলা গদ্যের চর্চার কারণ যেমন একই।

যে টিউটনিক জাতির বাসভূমি ছিল ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর জার্মানি, তাদের মধ্যে ইংরেজ ও আইরিশ ধর্মপ্রচারকরা এসে প্রচারের সুবিধের জন্য স্থানীয় ভাষাকে সুষম করতে সাহায্য করেন। সেই সমস্ত ধর্মগীতি থেকেই জার্মান সাহিত্য ধীরে ধীরে রূপ নেয়। বাংলা কবিতারও জন্ম বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের কারণে, কিন্তু নিছক ধর্ম ও দেবদেবীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রক্তমাংসের মানুষকে সাহিত্যে উপজীব্য করতে বাঙালি লেখকদের বড় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়, চৈতন্যদেবের কালও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কোর্টলি লাভ এবং শিভালরির অভ্যুত্থান হলে, এবং ততদিনে জেগে-ওঠা ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে, দ্বাদশ শতাব্দীতেই জার্মানিতে বিশুদ্ধ প্রেমগীতি লেখা শুরু হল। ত্রিস্তান এবং সোনালি ইসল্টের অবৈধ মধুর প্রেমের গাথার প্রথম সার্থক রূপ দেখা যায় (যদিও অসমাপ্ত) ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর জার্মানিতে, গটফ্রিড ফন স্ট্রাসবুর্গের রচনায়।

তবু ধর্মগীতি রচনার স্রোত চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রেষ্ঠ জার্মান গীতি-কাব্যের অধিকাংশ ধর্মসংগীত। সেই কারণে আমরা এবার বিংশ শতাব্দীর একজন বিশুদ্ধ ধর্মসংগীতের কবিকে বেছে নিয়েছি। শ্রয়েডর ধর্মে প্রোটেস্টান্ট। কবি হিসেবে তিনি খুব বড় নন এবং জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান হয়তো তেমন উজ্জ্বলভাবে নির্দেশিত হবে না, কিন্তু ধর্মীয় সাহিত্যে তাঁর যুগপৎ বৈদগ্ধ্য ও সরলতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনার ধারা খুঁজলে সপ্তদশ শতাব্দীর পল গেরহার্ড কিংবা আরও আগে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের মূল প্রচারক মার্টিন লুথারের নাম করা যায়। যে সরল এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী প্রতিবাদ ছিল লুথারের চরিত্র (গির্জার দরজায় পেরেক ঠুকে নিজের ইস্তাহার লটকে দিয়ে আসা কিংবা মঠ-পরিত্যক্তা নানকে বিয়ে করে গির্জার অনুশাসন অমান্য করা), পরবর্তী যুগের প্রোটেস্টান্টদের তা চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে। লুথার অনূদিত বাইবেল (তাঁর জীবদ্দশাতেই ৩৭৭ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল) প্রথম দৃঢ় জার্মান গদ্যের নিদর্শন এবং তাঁর রচিত কবিতাবলী ও গান ('ঈশ্বর আমাদের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ') পরবর্তী দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শ্রয়েডরের রচনাতেও তার চিহ্ন পাওয়া যায়।

জার্মান সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পর ঈশ্বর হয়ে যান এক ও নিরাকার, গ্রিসের হাস্যমুখর-কলহপরায়ণ চমৎকার দেবদেবীরা ধূলিসাৎ হয়ে যান। কিন্তু গেয়র্গের কবিতার আলোচনায় আমরা দেখেছি, গ্রিক দেবদেবীদের সমাজকেই তিনি আদর্শ মানব সমাজ মনে করতেন, হোল্ডারলিনও এরকম বিশ্বাসী এবং আরও অনেকে। শ্রয়েডরও কিছুটা এই ধারার কবি।

শ্রয়েডর-এর জন্ম ১৮৭৮ সালে। বিদগ্ধ ও সাত্ত্বিক জীবন। বহু ভাষায় পণ্ডিত; গ্রিক, ফরাসি ও ইংরেজি ক্লাসিকসের অনুবাদক। তাঁর সরল ও মধুর ধর্মগানগুলি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'নৈবেদ্য' পর্যায়ের কবিতাগুলির কথা মনে পড়ায়; প্রোটেস্টান্টদের বিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা উপনিষদের ধারণারও মিল আছে। শ্রয়েডর-এর কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে কি না বা পড়া সম্ভব ছিল কি না, আমার জানা নেই।]

দুটি গান

১

আমি তো চাইনি তোমার চোখের বালি
ও চোখের ওই বিচারসভায় আমি কে?
সানন্দে আজ ছেড়েছি আমার ঐশ্বর্যের ডালি
যা ছিল তোমার তাই তো দিয়েছি রেখে!
অপর লোকের যত্নে লুকোনো রত্নের সিন্দুকে
আবর্জনার স্তূপ জমে আছে খালি।

হে পথিক, তুমি থেমো না এখানে একা
এই বীভৎস ছবিতে
এই কুৎসিত ভয়ংকরকে দেখা
পারে বুক ভেঙে খান খান করে দিতে।
ফেরাও নয়ন, মূর্খের পদচিহ্ন অনুসরণ
তোমার জন্য নয়
ওরা শুধু বলে আবহমানের সৃষ্টির অনুখন
উৎকণ্ঠা ও ভয়।

তবু হায় আজও নিজেই পারিনে আমি
উৎকণ্ঠায় যা দেখেছি ওই মুখে
পথিকের মুখে অপমান-লাজ, নিয়েছি নিমেষে চিনে
ওই অপমান আমারই, লজ্জা রয়েছে আমার বুকে।

২

যদিও তোমার রয়েছে একটি শরীর
অস্থি মাংসে গড়া
যদিও তোমার পরীক্ষা নয় কঠিন
হৃদয় কঠিন করো!
যে-হৃদয় তুমি পেয়েছ সে যদি কখনো
ব্যথা পায়, চায় বাসনায় ঘুরে মরা,
সময়ের দাবি: প্রস্তর হোক মন
প্রস্তরই ভিত, প্রস্তর দৃঢ়তর।

গটফ্রিড বেন

[কবিতা কী, এর উত্তরে জীবনানন্দ দাশ খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন, কবিতা অনেক রকম। একথা বলার সময় তাঁর চোখ ছিল সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর কবিতার দিকে, কারণ, বাংলা দেশে এখনও কবিতা অনেক রকম নয়। লিরিকের প্রতিই এখনও বাংলা দেশের ঝোঁক বেশি, একটু সুরেলা, কিছুটা নরম সৌরভময় পাপড়িমেলা না হলে বাংলা কবিতা এখনও যথেষ্ট গ্রাহ্য হয় না।

কবিতা যে অর্থে অনেক রকম, তার মধ্যে কিছু কিছু চাক্ষুষ রূপান্তরও পড়ে। কোনও রকম ছেদচিহ্ন ব্যবহার না করা, কখনও বড়-টাইপ, তারা-ফুটকি এগুলোও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। কিংবা অ্যাপোলিনেয়ার বা পাউন্ড যা করেছিলেন, বৃষ্টিধারার মতো বা চ্যাপটা বা সরুভাবে স্তবক সাজানো—কিংবা কামিংস যেমন ছিলেন ক্যাপিটাল লেটারের জাতশত্রু—এগুলিও কবিতারই অঙ্গ। নাটক-সংগীত বা চিত্রকলার অনুগ্রাহকদের বিপরীত, কবিতার পাঠক কখনও চোখের সামনে থাকে না বলেই কবি পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা নিতে পারেন। কিন্তু বাংলা দেশে এখনও সামান্য এলোমেলোমিকে পাগলামি বলে গণ্য করা হয়। সেদিক থেকে, গটফ্রিড বেনের কবিতায় ক্রিয়ার অনুপস্থিতি বা বাক্য সাজানোর নিয়ম অগ্রাহ্য করা— খুবই দুর্বোধ্য ঠেকবে। এই সূত্রে গটফ্রিড বেন ছিলেন নিহিলিস্ট।

বহিরঙ্গ ছাড়াও, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের নানা আন্দোলন এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে-দেখার ভঙ্গি বার বার বার বদলে দিয়েছে। এ শতাব্দীর শুরুতে ফরাসি দেশে যখন সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে, জার্মানিতে তখনকার নতুন আন্দোলনের নাম এক্সপ্রেশানিজম। পরবর্তীকালে সুররিয়ালিজম এবং এক্সপ্রেশানিজম দুটোই এসে মিশে যায় বা ধ্বংস হয় একজিসটেনশিয়ালিজমে।

এক্সপ্রেশানিজম সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলা যায়, এই মতবাদীদের বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বের যেকোনও বস্তুর আন্তরিক সত্যটুকুই প্রকাশ করা উচিত। তার রূপের বর্ণনা বা শুধু নাম উল্লেখ করা অর্থহীন। এবং এই আন্তরিক সত্যটি প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আসে। এই বিশ্বাসের কেন্দ্র হয় এই সভ্যতা, যা বাইরে থেকে দেখতে চকচকে এবং সহস্র পুষ্পে সজ্জিত মনে হয়, কিন্তু সেটা আসলে ভেতরে পচা। সুতরাং 'সভ্যতা' এই নামটা অর্থহীন। গটফ্রিড বেন বলেছেন, এই বিশৃঙ্খল জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয়, একমাত্র শিল্প ছাড়া।]

নষ্ট অহমিকা
(অংশ)

নষ্ট অহমিকা, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বিপর্যস্ত,
আয়নের শিকার, গামা রশ্মির মেষশিশু
কণিকা ও প্রান্তর, অন্তরের দুঃস্বপ্ন-প্রাণী
তোমার নত্‌রদামের ধূসর পাথরে।
তোমার জন্য দিন কাটে রাত্রিহীন, ভোরহীন
বৎসর তুষারহীন এবং ফল—
ধরে আছে অনন্ত শাসানিময় গোপন
পৃথিবী যেন শূন্য যাত্রা।
কোথায় শেষ তোমার, কোথায় ফেলবে তাঁবু

কোথায় তোমার শূন্য স্তরে প্রসারিত লাভ, ক্ষতি
পশুদের নিয়ে এক খেলা, অনেকগুলি শাশ্বত
তুমি তাদের বাধা পেরিয়ে যাও।
পশুর চাহনি, তারাগুলি ষাঁড়ের অস্ত্র
জঙ্গলের মধ্যে মৃত্যু অস্তিত্ব ও সৃষ্টির কারণ
মানুষ, জাতি সংঘর্ষ, ক্যাটালনিয়ার
প্রান্তর, পশুর গলা দিয়ে নেমে যায়।

পৃথিবী চিন্তায় খণ্ড খণ্ড। স্থান ও কাল
এবং আর যা কিছু এই মানবসমাজকে
বুনেছে ও ওজন করেছে, সবই শাশ্বতের নিত্য ক্রিয়া।
পুরাণকাহিনী মিথ্যুক।
কোথায় যাবে? কোথা থেকে? না রাত্রি, না সকাল
না ইভো, না মৃতের জন্য প্রার্থনা
তুমি শুধু চাও একটা ধার-করা স্লোগান,
কিন্তু কার কাছ থেকে ধার-করা?

আ, যখন তারা সবাই নত হয়ে প্রণাম করেছে এক কেন্দ্রে
যখন চিন্তাশীলরাও শুধু চিন্তা করেছেন ঈশ্বরকে
যখন তারা ছড়িয়ে গেছেন মেষপালক ও মেষের দিকে
প্রত্যেকবার শেষ ভোজনের সুরাপাত্র থেকে রক্ত তাদের শুদ্ধ করেছে।

এবং প্রত্যেকেই এক ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত
প্রত্যেকেই একটা রুটি ভেঙে টুকরো মুখে দিয়েছে
হে দূরের বাধ্য হিসেবে পরিপূর্ণ সময়
তুমি একবার নষ্ট অহমিকাও গ্রাস করেছিলে।...

[জন্ম ১৮৮৬ সাল। ডাক্তারি পাশ করার পর বেন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ছিলেন সামরিক চিকিৎসক দলে, কিন্তু পরবর্তী কালে ডাক্তারি করার চেয়ে সাহিত্যিকদের দলে আড্ডা মারাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ১৯১২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'লাশকাটা ঘর' নামের প্যামফ্লেট খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই সময়েই তাঁর আত্মজীবনীমূলক কিছু কিছু গদ্য রচনা এক্সপ্রেশানিস্ট সাহিত্যের রূপ স্পষ্ট করে তোলে, এগুলির মধ্যেই তিনি আধুনিক পৃথিবীর বহুখণ্ডিত মানুষকে উপস্থিত করেন।

এক সময় তিনি নাৎসিদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিছুটা

যুক্তও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে সংস্কৃতির জগতে নাৎসিদের উৎপাত তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন, নাৎসিরা তাঁর সমস্ত রচনা বাজেয়াপ্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও তাঁকে ডাক্তার হিসেবে যোগ দিতে হয়েছিল। যুদ্ধ থেমে গেলে, মিত্রপক্ষও আবার তাঁর রচনা জার্মানিতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে কিন্তু তরুণ জার্মান লেখকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, ১৯৪৯ সালে সুইটসারল্যান্ড থেকে তাঁর রচনা আবার প্রকাশিত হলে তাঁর প্রতি শাসকবর্গের বিরূপ মনোভাব ক্রমশ কমতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই, গটফ্রিড বেনের খ্যাতি জার্মানি ছাড়িয়ে সারা ইউরোপে ছড়ায় এবং ইউরোপের একজন প্রধান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। মৃত্যু ১৯৫৬, পশ্চিম জার্মানিতে।

গেয়র্গ ট্রাকল

[প্রায় বালক বয়েসে, অথবা সদ্য যৌবনেই মৃত্যু, কিন্তু কবি হিসেবে অমর হয়েছেন, এরকম দু'-একজন কবি প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই। কিটসের কথা মনে পড়লেই চোখে ভাসে তাঁর রোগশয্যায় শুয়ে থাকা শরীর, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর দুঃখিত মৃত্যু। শেলিরও তো মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর বয়সে। কত মানুষ কত দীর্ঘ দিন ব্যর্থ বেঁচে থেকে পৃথিবীকে শুধু ভারী করে রাখে, আর ওই দুটি ছোকরা পৃথিবীকে কত ধনী করে দিয়ে গেল। ফরাসি ভাষায় এরকম উদাহরণ বেশি। র‍্যাঁবো-র কথা উল্লেখ করে লাভ নেই, কারণ শুধু ফরাসি ভাষায় নয়, সারা পৃথিবীতেই দেব-দানবের সমাহারে সৃষ্টি এরকম এক বালকের অলৌকিক কীর্তির আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে লাফর্গের কথা খুব মনে পড়ে। মাত্র সাতাশ বছরে মৃত্যু, কিন্তু লাফর্গের নাম ফরাসি ভাষায় চিরকালীন হয়ে গেছে, এবং নিজের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিভাবান কবিদের (পাউন্ড, এলিয়ট, হার্ট ক্রেন) প্রভাবিত করেছে— ওই তিক্ত, হতাশ, করুণাপ্রার্থী যুবা। ইতালিতেও আমরা দেখেছি, গুইদো গৎসানো রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরেও বাঁচতে পারেননি, তেত্রিশ বছরে মৃত্যু।

জার্মানিতে এরকম গেয়র্গ ট্রাকল। ভয় ও বীতস্পৃহার মধ্যে মাত্র সাতাশ বছরে মৃত্যু। প্রথম মহাযুদ্ধে কর্পোরাল হিসেবে লড়াই করেছে একজন অস্ট্রিয়ান, অ্যাডলফ হিটলার, আর, আরেকজন অস্ট্রিয়ান— গেয়র্গ ট্রাকল অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে শুশ্রূষা করেছেন। কিন্তু মানুষকে বাঁচাবার কাজ ট্রাকল বেশিদিন করতে পারেননি, কারণ তাঁর নিজেরই বাঁচার কোনও ইচ্ছে ছিল না। জন্ম ১৮৮৭, ছেলেবেলা থেকেই নানারকম মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই পৃথিবীটা ছিল তাঁর কাছে ভয়ের বস্তু সেই ভয় তাঁকে সব সময় তাড়া করে ফিরত। কবিতা লেখা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোনও অবলম্বন ছিল না। গ্রোডেকের যুদ্ধের পর রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখে তাঁর মন স্তম্ভিত হয়ে যায়, তা ছাড়া, ট্রাকল তখন মেডিকেল কোরের লেফটেনান্ট, তাঁর অধীনে ৯০ জন গুরুতর আহত সৈনিক, তাদের বাঁচাবার কোনও উপায়ই তাঁর হাতে নেই— এই পরিবেশে তাঁর মানসিক

ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হল তখন, সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করলেন, সেদিন ৩ নভেম্বর, ১৯১৪।

এক্সপ্রেশানিস্ট লেখকদের মধ্যে ট্রাকলের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। জার্মান কবিতার তিনি একদিকে মোড় ঘুরিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক লেখকদের ওপর তাঁর প্রভাব প্রবল। জীবনে অত হতাশা ও অসহায়তা থাকলেও ট্রাকলের কবিতাবলী ভারী মধুর, এবং বেঁচে থাকার উপযোগী একটা মিষ্টি আশার ইঙ্গিত আছে।]

একটি শীতের সন্ধ্যা

শার্সির গায়ে ঝুরুঝুরু ঝরে তুষার
গির্জায় বাজে করুণ দীর্ঘ ধ্বনি
খানার টেবিলের চামচ পিরিচ সাজানো
সজ্জিত গৃহ, মনোরম তাপ, শান্ত।

বহু পথ ঘুরে কারা যেন ফিরে আসে
আঁধার পথের পাশে দরজায় থামে
দরজার পাশে দয়ালু বৃক্ষ, থোকা থোকা সোনাঝুরি
জননী ধরার সুশীতল রস টানে।

দরজা পেরিয়ে মৃদু পায়ে এল পথিক
গভীর দুঃখে অঙ্গনটুকু নিথর।
টেবিলে সাজানো সতেজ খাদ্য টলটলে লাল মদ
নিখুঁত আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাশ্চাত্য সংগীত

হে আত্মার নৈশ ডানার আন্দোলন;
রাখাল, আমরা একদা গিয়েছিলাম আঁধার অরণ্যে
লাল হরিণ, সবুজ ফুল এবং ধ্বনিময় বসন্ত আমাদের মান্য করেছিল
হে প্রাচীন ঝিল্লিস্বর
মন্দিরের বেদিতে গড়ানো রক্ত ফুল হয়ে ফুটে আছে

পুকুরের সবুজ নিস্তব্ধতার ওপরে ভাসে একটি পাখির কান্না।
হে ধর্মযুদ্ধ, মাংসময় শরীরের উজ্জ্বল যন্ত্রণা
সন্ধ্যার বাগানে ঝরে পড়া রক্তিম ফল
একদিন এখানে ধার্মিক শিষ্যবৃন্দ ভ্রমণ করেছিল
আজ সৈন্যদল এখানে আহত শরীর নিয়ে জেগে উঠে তারার স্বপ্ন দেখে
হে রাত্রির কোমল শস্যস্তবক!

হে তুমি সোনালি শরৎ ও শান্তির কাল
আমরা শান্ত সন্ন্যাসীরা একদিন তোমার মধ্যে বসে
আঙুর পেষণ করেছি
আর আমাদের ঘিরে পাহাড় ও অরণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।
হে তোমার শিকারদেশ ও দুর্গ; সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা
নিজের নিরালা ঘরে মানুষ চেয়েছে সুবিচার
নিঃশব্দ প্রার্থনায় দ্বন্দ্ব করেছে ঈশ্বরের জীবিত মাথার জন্য।

হে ধ্বংসের তিক্ত সময়,
এখন আমরা কালো জলের মধ্যে একটি পাথর-কঠিন
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।
তবু উজ্জ্বল প্রেমিকেরা তুলে ধরে তাদের রূপালী ঢাকনা—
মিলিত এক শরীর।
গোলাপের মতো নরম বালিশ থেকে ভেসে আসে ফুলের সুরভি
আর ঘুম ভাঙার পর মধুর গান।

বের্টল্ট ব্রেহ্‌খ্‌ট
বেচারি বি.বি.

আমি বের্টল্ট ব্রেহ্‌খ্‌ট, এসেছি কালো জঙ্গল-দেশ থেকে
আমার মা আমাকে যখন শহরে আনেন, তখন আমি ছিলুম
তাঁর পেটের মধ্যে। এবং সেই জঙ্গলের সিরসিরানি
আমার শরীরে থাকবে— যতদিন না আমি অদৃশ্য হয়ে যাই।

এই পিচ-বাঁধানো শহরে আমি বেশ মানিয়ে গেছি। প্রথম
থেকেই মুমূর্ষুর প্রতিটি মন্ত্রে আমি সজ্জিত: খবরের
কাগজ, তামাক এবং মদ। সন্দেহপ্রবণ আর অলস
থেকে শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত।

আমি মানুষের প্রতি অসাময়িক, ওদের শিষ্টতা অনুযায়ী
আমি মাথায় টুপি পরে থাকি। আমি বলি: এরা সব
অবিকল এক একটি গন্ধমূষিক! আবার আমি বলি: তাতে
কিছু যায় আসে না, আমি নিজেও তাই।

কোনো কোনো সকালে আমি আমার খালি দোলনা
চেয়ারে কয়েকটি মেয়েকে এনে বসাই এবং খুশি চোখে তাকিয়ে
থাকি তাদের দিকে। আমি ওদের বলি: আমি হচ্ছি সেই
ধরনের মানুষ, যাদের কক্ষনো বিশ্বাস করা যায় না।

সন্ধের দিকে আমি কিছু লোক জড়ো করি। পরস্পরকে আমরা
ডাকি, 'জেন্টলম্যান'। ওরা আমার টেবিলের ওপর পা তুলে
দিয়ে বলে, শিগগিরই আমাদের সুদিন আসছে হে! আমি
আর জিজ্ঞেস করি না: কবে?

শেষ রাত্রির দিকে, ধূসর ঊষার পাইন গাছরা সময় হিসি করে,
আর গাছের উকুন অর্থাৎ পাখিরা শুরু করে চেঁচামেচি।
সেই সময়টায় শহরে আমি শেষ গ্লাসে চুমুক দিয়ে,
চুরোটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলে ঘুমোতে যাই, উদ্বিগ্ন।

আমরা অর্বাচীনের দল এমন সব বাড়িতে থাকি, যেগুলো
ধ্বংসের অতীত বলা যায়। (এইভাবেই ম্যানহাটান দ্বীপের
বিশাল কুঠরি বাড়িগুলো তৈরি করেছি আমরা—আটলান্টিকের
মধ্যে দিয়ে কথা বলা তারাগুলোও।)

এইসব শহরগুলোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত শুধু তাই টিকে
থাকবে—যা শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে যায়, হাওয়া! এই বাড়ি
ভোজনবিলাসীদের খুশি করে— খালি হয়ে যায়। আমরা জানি
আমরা শুধু সূচনা, জানি আমাদের পর যারা আসবে—

উল্লেখযোগ্য কিছুই না।
সামনের ভূমিকম্পে আমি আশা করছি, আমার চুরোটটা
নিবে গিয়ে তেতো হতে দেবো না।
আমি, বের্টল্ট ব্রেহখ্‌ট, যখন আমি মায়ের পেটে ছিলুম
সেই বহুদিন আগে কালো জঙ্গল-দেশ থেকে এই
পিচ-বাঁধানো শহরে পরিত্যক্ত হয়েছি।

নিমজ্জিতা মেয়েটি

জলে ডুবে গেল, ভেসে গেল খরস্রোতে
পেরিয়ে ঝরনা, ঢেউ উত্তাল নদীতে—
আকাশে সূর্য উজ্জ্বল নীলমণি
যেন তিনি চান ওই মৃতদেহ জুড়োতে।

শরীরে জড়াল শ্যাওলা, সাগর-পানা
ক্রমশই ভারী হয়ে এল সেই শরীর
দু' পায়ের ফাঁকে ভেসে যায় কত মাছ
শেষ যাত্রায় প্রাণী ও ঝাঁঝির বাধা বার বার জড়ায়।

সন্ধ্যা আকাশ ধোঁয়ার মতন কালো
রাত্রে তারার আলো হয়ে এল অনড়
তবুও বিকেলে ছিল স্বচ্ছতা, নীলিমার নীল দিন
আরও কিছু ভোর এবং সন্ধ্যা এখনও রয়েছে সামনে।

যখন পাচন শুরু হল তার ম্লান দেহটিতে জলে
খুব ধীরে ধীরে ঈশ্বর তাকে অনায়াসে ভুলে গেলেন।
প্রথমে মুখটি, তার পর হাত, সব শেষে তার চুল
এখন সে শুধু পচা গলা মাস, নদীতে অন্য পচা মাংসের মতন।

[নাট্যকার ও মঞ্চ প্রযোজক হিসেবে ব্রেহখ্‌টের প্রভূত খ্যাতি তাঁর চমৎকার লিরিকগুলিকে কিছুটা চাপা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাঁর কবিতার নিপুণ-সারল্য অননুকরণীয়। কখনও কখনও তিনি চিনে কবিতার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মতে তাঁর শব্দ ব্যবহার বাইবেলগন্ধী— যদিও কোনও কোনও সমালোচক তাঁর কাব্য-সংগ্রহকে বলেছেন, 'শয়তানের প্রার্থনা

পুস্তক'। এর কারণ, ব্রেহখ্‌ট সমাজের নিচু শ্রেণীর নরক-সমান পরিবেশের বঞ্চিত, অপমানিত মানুষের কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতে পেরেছেন।

প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর জীবনী জানা যায়। এ ছাড়া, উল্লেখযোগ্য তথ্য এই, জন্ম ১৮৯৮, রাজনৈতিক মতবাদের জন্য একাধিকবার নির্বাসন। তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং জার্মানি বিভাগের পর শেষ পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন পূর্ব জার্মানিতে। নাট্যকার হিসেবে তাঁর সম্মান পৃথিবীব্যাপী এবং সম্ভবত তিনিই একমাত্র কমিউনিস্ট লেখক। যাঁর নাটকের ধারাবাহিক অভিনয় হয় আমেরিকায়। মৃত্যু ১৯৫৬।]

ইনগেবর্গ বাখমান

[এই শতাব্দীর শুরুতেই নিঃসঙ্গতা নামক নির্মম ব্যাধিটি প্রবলভাবে আক্রমণ করে কবি ও শিল্পীদের। অধিকাংশ রচনাতেই ফুটে ওঠে সমাজের প্রতি কবির অনাস্থা, মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বোধ। সমস্ত শিল্পই ক্রমশ হয়ে ওঠে অতি ব্যক্তিগত, শিল্পীর একক নিঃসঙ্গতার অভিব্যক্তি। কিন্তু ১৯২০-র পর জার্মানির একদল লেখক (ব্রেহখ্‌ট প্রমুখ) চেয়েছিলেন সমাজের সঙ্গে কবির নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে, ঘোষণা করেছিলেন মানুষের সম-ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু কয়েক বছর পর হিটলারের উত্থান এই শুভ বিশ্বাসকে তছনছ করে দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জার্মানিতে আবার এক নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদের বলা হয় ৪৭-এর দল। এই দলের লেখকরাও বিদ্রোহী নন, শান্ত, চাপা-আচ্ছন্ন, সংগীতময় রচনা এঁদের বৈশিষ্ট্য। এঁদের মধ্য থেকে আমরা একমাত্র শ্রীমতী ইনগেবর্গ বাখমানকে বেছে নিলাম।

শ্রীমতী বাখমান জাতে অস্ট্রিয়ান, জন্ম ১৯২৬। দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট। দুটি কবিতার বই এবং একটি ছোট গল্পের বই বেরিয়েছে। এই রূপসী বিদুষী তরুণী, অল্প বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন, ইংরেজি অনুবাদকরাও বলেছেন, অনুবাদে তাঁর কবিতার রস খুবই নষ্ট হয়।

জার্মান কবিতা সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকরা বিশদ পরিচয়ের জন্য পাওলিক-হাকার-মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা নামের বাংলা অনুবাদের বইটি দেখতে পারেন।]

দুপুর

গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন লেবু গাছগুলি
নিঃশব্দে ভরে যায় ফুলে
শহরের বহু দূর থেকে দিনের বেলার চাঁদ

পাঠিয়ে দেয় আলোর ম্লান ছায়া:
দুপুর হয়ে এল,
এখন ঝরনার জলে কাঁপে সূর্যের আলো

এখন প্রাচীন ভগ্নস্তূপের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে
ফিনিক্স পাখি মেলে দেয় তার বিক্ষুব্ধ ডানা,
পাথর ছুড়ে ছুড়ে ক্ষতবিক্ষত হাত
এখন জাগ্রত ফসলে ডুবে যায়।

যেখানে জার্মান আকাশ পৃথিবীকে কালো করে দেয়
সেখানে এক মুণ্ডহীন দেবদূত খুঁজছে একটি কবর
মানুষের ঘৃণার জন্য
আর তোমার জন্য সে রেখে যায় একটি হৃদয়ের চাবি।

একমুঠো দুঃখ মিলিয়ে যায় পাহাড়ের ওপারে।
সাত বছর পর
তোমার পুরনো চিন্তা তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষায় আছে,
সেই দরজার সামনে ঝর্নায়:
খুব গভীর ভাবে সেদিকে তাকিয়ো না, না, তাকিয়ো না
অশ্রু তোমার চক্ষু ডুবিয়ে দেবে।

সাত বছর পর
যে বাড়িতে মৃতেরা শুয়ে আছে
সেখানে গত কালের হত্যাকারীরা তুলে ধরেছে
তাদের সোনালি পানপাত্র
তুমি চোখ নামিয়ে নাও, চোখ ফেরাও।
এখন পুরো দুপুর।
ছাইয়ের মধ্যে
কুঁকড়ে উঠছে লোহা, কাঁটাঝোপ ছাড়িয়ে
উড়ছে পতাকা, আদি কালের স্বপ্নের পাথরগুলি
শিকলে রূপান্তরিত ঈগলকে ধরে আছে।
আলোয় অন্ধ হয়ে যাওয়া আশা শুধু শিউরে ওঠে।

তার শিকল খুলে দাও, শিখর থেকে নামিয়ে
আনো তাকে, তোমার দু' হাতে ঢাকো তার চোখ

যেন ছায়া তাকে ঝলসে দেয়।
যেখানে এক জার্মান আকাশ পৃথিবীকে কালো করে
সেখানে মেঘ খোঁজে শব্দ,
বোমার গর্তগুলি ভরিয়ে দেয় স্তব্ধতায়
গ্রীষ্মের আগে সেই শব্দ শুনতে পায় সামান্য বৃষ্টি ধারায়।

সারাদেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায় সেই অব্যক্ত অনুভব
শুধু ফিসফিস করে শোনা যায়:
এখন দুপুর ॥

[ফিনিক্স মিশরের একটি পৌরাণিক পাখি। এই সুন্দর উজ্জ্বল পাখিটি ৫০০ বছর বাঁচার পর নিজেই ইচ্ছে করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার সেই ছাই থেকে হয় পুনর্জন্ম। ফিনিক্স পাখি অমরত্বের প্রতীক। পাহাড় চূড়ায় যে বন্দি ঈগলের উল্লেখ আছে— সেই ঈগল পাখিও সাধারণভাবে যেকোনও জাতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে পরাভূত জার্মান জাত। কবিতাটিতে জার্মানির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বিষাদ স্পষ্ট। পৃথিবীতে যখন সভ্যতার দ্বিপ্রহর, তখন জার্মানিতে ছায়ার জন্য ভয়।]

আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো

[বাংলা দেশের কবিতায় দশক ভাগ করার একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তৃতীয় দশক, চতুর্থ দশক, পঞ্চম দশক এই অনুযায়ী কবিদের নিতান্ত জন্মসাল বা কবিতার লেখার কাল দিয়ে শ্রেণী ভাগ করার রীতি আর কোথাও চোখে পড়ে না। কোনও পত্রিকা বা কোনও শক্তিশালী দলকে কেন্দ্র করে কবিতায় স্মৃতির পুনরুদ্ধার বা নতুন ধ্যান ও রীতির উদ্ভব হয়, কবিতার ইতিহাস তৈরি হয় সেরকমভাবে। বাংলা দেশে কবিদের ইতিহাস লেখা হয়েছে, কবিতার ইতিহাস নিয়ে এখনও আলোচনা শুরুই হয়নি। আমাদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, জার্মান কবিতায় এ শতাব্দীতে তেমন বলা যায় রিলকে, কিন্তু আমি অন্তত সাতটি জার্মান কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ খুঁজে দেখেছি, কোথাও রিলকে-পূর্ববর্তী কিংবা রিলকে-পরবর্তী কবি— এ ধরনের কোনও আলোচনা চোখে পড়েনি।

এক্সপ্রেশানিজমই এ শতাব্দীতে এ পর্যন্ত জার্মানিতে মুখ্য কাব্যচিন্তা। যদিও আরম্ভের কালে ও পরবর্তী চিন্তায় অনেক পার্থক্য। জার্মান কবিতা পর্যায় শেষ করার আগে আমরা একজন তরুণ লেখককে বেছে নিয়েছি যাঁর কাব্য এক্সপ্রেশানিস্টদেরই রূপান্তর এবং বলা যায় এক্সপ্রেশানিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক, তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতেও কবিতার শরীর ভাঙাচোরার চেষ্টা করছেন। কবিতার এরকম গঠন বাঙালি পাঠকদের কাছে হয়তো নতুন ও চিত্তাকর্ষক মনে হবে।

আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো জাতে চেকোশ্লোভাক, এখন অস্ট্রিয়ার নাগরিক। পেশায় রাসায়নিক, কিন্তু উগ্রপন্থী আধুনিক কবিদের অন্যতম। তাঁর বয়স এখন ৩৬, এই কবিতাটি ২৯ বছর বয়সে লেখা।]

সবুজ সুর

...সবুজ সুর নীল নারী
ছুটির দিন সাদা

আমি সবুজ মাঠের মধ্যে তরুণ গ্রামের
আমার গোলা হলুদ রং নারী সমেত শস্য সমেত
আমার নারী হলুদ রং গোলা সমেত শস্য সমেত
আমি সবুজ শস্য দেশে তরুণ গ্রামের

সূর্য এখন বাজার পথে ঘুরে চলেছেন
আমার নারী বাজার পথে হেঁটে চলেছে
আমার সবুজ শস্য নারী আমার সবুজ মাঠের নারী
আমার সবুজ তরুণী গ্রাম তরুণী এখন বাজার পথে হেঁটে চলেছে

বাজার ঘর ভরতি এখন চালকুমড়োয়
চালকুমড়োগুলোই এখন বাজার ঘরের সাদা ধুলো
দুপুরবেলার বাজার ঘরের সাদা ধুলো
সাদা ধুলো বাড়ির পথে মেয়ের দিকে বাগান পথে

আমি সবুজ বিকেলবেলা নারীর মধ্যে বাগান এখন
আমি এখন সবুজ হচ্ছি নারীর মধ্যে বাগান এখন
একটি ঘর ঠান্ডা একটি নীল রঙের ডোরা কাপড়
দুপুর কলসি নীল গেলাস একটি জল

আমিই সেই ঠান্ডা ঘর আমি এখন ঠান্ডা ঘরে
আমি এখন যেখানে শেষে মেয়েটি আমি মেয়ের সঙ্গে
মেয়েটি আর জল ও পাখি পান করেছি কিছুটা জল
কলসি এই ঘর ভিতরে আছি দু'জনে

একটা পিঁপড়ে পেরিয়ে গেল ল্যাটিন গ্রামার
জানলা দিয়ে উড়ে এল গাছের পাতা
এক ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল আমার মুখে
একটি ধীর ছোট্ট ঘড়ি সৃষ্টি করে অ্যালুমিনিয়াম বিকেলবেলা

আমি চকচক রূপে রৌদ্রে অ্যালুমিনিয়াম
ফুলের টবের মাটির নীচে কবর দিলুম আমার ঘড়ি
আমার নারী অরণ্যের ভিতরে ছোটা ঝিঁঝি পোকা না
আমার নারী গ্রীষ্মভূষায় জানলা ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে

জানলার ঝিলমিলির ওপর, ছোট চেয়ার হালকা টেবিল তার ওপরে
ছায়ার ওপর রৌদ্র স্মৃতি আজ বিকেলের ওপরে বাগান
আমি এখন বুঝতে পারি ছোট ছেলেটা কেন যে যায় তাস খেলায়
আমি এখন বুঝতে পারি ছোট মেয়েটা রাখে আখুল সবুজ পাতায়...

আমিই সব ছুটির দিন আমি সবুজ
আমি সবুজ মাঠের ওপর ধানের মধ্যে
আমিই নীল সেই নারীর ঘরের মধ্যে
বিকেলবেলা, আমি নারীর ভিতরে নীল।

[কবিতাটি থেকে তিনটি স্তবক অনুবাদে বাদ দিয়েছি। পুরো কবিতাটির একেবারে শেষ লাইনে মাত্র একটি কমা ও শেষে দাঁড়ি আছে—এ ছাড়া আর কোথাও কোনও ছেদচিহ্ন নেই। সুতরাং কোনও বিশেষ্যের সঙ্গে কোনও বিশেষণের কী সম্পর্ক— সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ পাঠকের। সবুজ রংটিকে কোথাও কোথাও ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'আমি সবুজ বিকেলবেলা'— এখানে অর্থ, বিকেলবেলাটা সবুজ, না আমিই সবুজ, না আমি বিকেলকে সবুজ করছি এর মীমাংসা পাঠক নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ঠিক করে নেবেন। আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।]

স্প্যানিশ কবিতা: রূপের অনুসন্ধান

আমাদের এই আলোচনা ও অনুবাদের পরিধি বিংশ শতাব্দী। কিন্তু অনেক পাঠক হয়তো আশ্চর্য বোধ করবেন যে, বিংশ শতাব্দীর স্প্যানিশ কবিতার অনুবাদে আমি রুবেন দারিয়ো-কে গ্রহণ করিনি। রুবেন দারিয়ো এ শতাব্দীর শুরুতে অন্তত কুড়ি বছর স্প্যানিশ কবিতায় সম্রাটত্ব করেছেন।

তাঁকে গ্রহণ করিনি, তার কারণ, এই শতাব্দীর শুরুতে প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই কতকগুলি আধুনিক, জটিল ও গভীর মনোযোগযোগ্য সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে এবং বহু নবীন ও বলীয়ান কবির দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় সেরকম কোনও সাহিত্য আন্দোলন দেখা যায়নি। স্পেনের সাহিত্য তখন প্রধানত ফরাসিদের ছত্রছায়ায় মুগ্ধ ছিল। রুবেন দারিয়ো নিজেই একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন, যার নাম মডার্নিজম, যা আসলে কিছুই এমন মডার্ন নয়। শুধু আধুনিকতা কথাটার কোনও মানে হয় না, পূর্ববর্তীদের তুলনায় আলাদা কোনও চিন্তা ও রীতির সৃষ্টি না হলে তা নিরর্থক। রুবেন দারিয়ো সেরকম কিছুই করেননি, পুরনো সৌন্দর্যতত্ত্ব ও রক্তমাংসের বর্ণনার সঙ্গে তিনি ফরাসি সিম্বলিস্টদের রীতি গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। যদিও লেখক হিসেবে তিনি অসীম শক্তিশালী ছিলেন, সন্দেহ নেই। দারিয়োর জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার নিকারাগুয়ায়, তরুণ বয়েসে নানা দেশ ঘুরে তিনি চিলিতে এসে কিছু সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসে ফরাসি সিম্বলিস্ট কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই প্রভাবে রচিত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়তা এনে দেয় এবং মূল স্প্যানিশ ভূখণ্ডেও তিনি অবিলম্বে প্রধান লেখকের স্বীকৃতি পান। তাঁর একটি ভক্তদল গড়ে ওঠে এবং মডার্নিজম কথাটির সূত্রপাত হয়। আসলে তাঁর বিষয় ছিল বাস্তব থেকে পলায়ন, বিশুদ্ধ রূপের স্তুতি, বিদেশ বা অচেনা দেশের জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা এবং বোদলেয়ারের কাছ থেকে পাওয়া অবক্ষয় ও পাপের প্রতি কৌতূহল। ১৯১৬-তে রুবেন দারিয়োর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই মডার্নিজমেরও মৃত্যু হয়। দারিয়োর রচনা এখন প্রায় ক্লাসিকাল পর্যায়ে পড়ে।

তবে, জাতিগতভাবেই স্প্যানিশরা অনেকখানি রূপাভিলাষী। সৌন্দর্যতত্ত্বে ও বিশুদ্ধরূপের অনুসন্ধান পরবর্তী খাঁটি আধুনিক স্প্যানিশ কবিদের মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যজ্ঞান নিছক সময় বহির্ভূত এবং নিছক অভিভূত প্রকাশ নয়। হিমেনেথের অকিঞ্চিৎকর বর্ণনা বর্জনের প্রয়াস এবং লোরকার পল্লিগাথার প্রতি

আকর্ষণও এক হিসেবে এই সৌন্দর্য পিপাসার ইঙ্গিতবহ। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক কালের মতো নিষ্ঠুরতা, বীভৎস রসের প্রাধান্য, অলৌকিক কিংবা সুপ্ত মনের ভয়াবহতার প্রকাশ স্প্যানিশ কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। আনতোনিও মাচাদো দূরের দ্বীপে বসে তাঁর রচনাগুলিতে রুবেন দারিয়োর বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। দারিয়োর বাইরের আড়ম্বর ও উচ্ছলতা পরিহার করে তিনি প্রবেশ করেছেন অন্তরে, তাঁর ভাষা প্রায় গদ্যের কাছাকাছি সরল, কিন্তু তিনি নিজের আত্মার দিকে তাকিয়ে তবেই দেখতে চেয়েছেন প্রকৃতির রূপের প্রতিচ্ছবি, আবিষ্কার করতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে স্প্যানিশ কবিতায় নবীন সার্বজনীনত্ব, আমাদের আলোচনা এখান থেকেই শুরু করেছি। এই শতাব্দীর শুরুতে স্প্যানিশ ভাষায় আলাদাভাবে উচ্চারণ করার মতো প্রচার কোনও সাহিত্য আন্দোলন দেখা দেয়নি, কিন্তু বেশ কয়েকজন অসম্ভব শক্তিমান কবির রচনা উপহার পেয়েছেন এ পৃথিবী। ১৯৫৬ সালে হিমেনেথ যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন অনেক সমালোচক বলেছিলেন, এ পুরস্কার শুধু হিমেনেথের নয়, আসলে এ পুরস্কার মিলিতভাবে তিনজনের—হিমেনেথ, মাচাদো এবং লোরকার, কেননা, শেষোক্ত দু'জন তখন বেঁচে ছিলেন না, নইলে তাঁদের পুরস্কার না দেওয়া নোবেল পুরস্কারেরই অপবাদ।

মিগুয়েল দে উনামুনো

[এই শতাব্দীর স্প্যানিশ চিন্তা ও সংস্কৃতিতে উনামুনো এক বিশাল স্তম্ভস্বরূপ। সলোমাংকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বসে তিনি যখন বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন তখন তা শোনবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আসত লেখক ও দার্শনিকরা। তাঁর কাছে গুণীজন আসতেন তীর্থদর্শনে। স্পেনের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় সলোমাংকা, সেখানে উনামুনো ছিলেন গ্রিক ভাষার অধ্যাপক, পরবর্তীকালে ওখানে রেকটর হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রকার আলাপচারি সক্রেটিসের কথা মনে পড়ায়, কিন্তু উনামুনোর দুর্ধর্ষ প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়েছিল তরুণ বয়সেই। জন্ম ১৮৬৪, এবং বিংশ শতাব্দী শুরু হবার মুখেই তিনি তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজের দলপতি।

পরবর্তীকালে দার্শনিক হিসেবে উনামুনো সর্বজনস্বীকৃতি পেলেও, তিনি ধর্মনেতা বা নৈতিক গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন আজীবন বিপ্লবী, 'উনামুনো' কথাটিরই শব্দার্থ 'বিজয়ী'। গোঁড়া ক্যাথলিকদের দেশেও তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গলায় টাই পরতেন না, শৌখিন শার্ট গায়ে দিতেন না, কালো গলাবন্ধ কোট পরা তাঁর চেহারা ছিল সাধুর মতো, কিন্তু ধর্মের ক্রীতদাস না হয়ে। যে-সময় রুবেন দারিয়ো স্প্যানিশ কবিতায় আধুনিকতা এনে হই-হই করছেন, বলছেন রক্তমাংসই শ্রেষ্ঠ দেবতা, তখন উনামুনো প্রকাশ করলেন সমস্ত সীমানা ভাঙার নির্দেশ। স্প্যানিশ সাহিত্য ও

সংস্কৃতিকে তিনি ইউরোপীয় তথা সর্ব জাগতিক হতে বললেন। মানুষ সম্পর্কেও তিনি বলেছেন, মানুষ তার জন্মভূমি থেকে লাফিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়ুক।

উনামুনো কবিতা লিখতে শুরু করেন ৩০ বছর পেরিয়ে যাবার পর। তাঁর কাছে কবিতা ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের মুহূর্তকে অনন্ত করা। মুহূর্তকে তিনি আদেশ করেছেন, তুমি দাঁড়াও, আমার ছন্দ তোমাকে আবদ্ধ করেছে। এই কবিতাটি তাঁর একটি অতি বিখ্যাত রচনা। বিষয় ও গভীরতায় কবিতাটি ভালেরির 'সমুদ্রের পাশে কবর'-এর সঙ্গে তুলনীয়। কবিতাটিতে স্পষ্টত দুটি ভাগ, আমরা শুধু দ্বিতীয় ভাগটিই এখানে অনুবাদ করেছি। এই দ্বিতীয় অংশের যে বক্তব্য, তাঁর অধিকাংশ রচনাও বহু বিতর্কমূলক বই 'দি ট্রাজিক সেন্স অব লাইফ'-এরও বক্তব্য প্রায় এক। কবিতাটির প্রথম অংশে একটি কবরের বর্ণনা, সেখানে বৃষ্টি পড়ে, রোদ আসে, ভেড়ার পাল চরে বেড়ায়। দ্বিতীয় অংশে, কারখানার ক্রুশচিহ্ন মৃতদেহ পাহারা দেয়, আর জীবিত মানুষের জন্য কোনও ক্রুশ লাগে না—কারণ ঈশ্বর স্বয়ং ব্যগ্র হয়ে মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই ঈশ্বরের মানুষকে দরকার। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের: আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।]

ক্যাসটিলিয়ার এক গ্রাম্য কবরে
(অংশ)

তোমার পাশ দিয়ে গিয়েছে পথ, জীবিত মানুষের
তোমার মতো নয়, তোমার মতো নয়, দেয়াল ঘেরা
এ পথ দিয়ে তারা আসে ও যায়
কখনও হাসে আর কাঁদে।
কখনও কান্নার কখনও হাস্যের ধ্বনিতে ভেঙে যায়
তোমার পরিধির অমর স্তব্ধতা!

সূর্য ধীরভাবে মাটিতে নেমে এলে
ঊষর সমতল স্বর্গে উঠে যায়
এখন স্মরণের সময় মনে হয়
বেজেছে বিশ্রাম ও পূজার ঘণ্টা
রুক্ষ পাথরের স্থাপিত ক্রুশখানি
তোমার মাটি ঘেরা প্রাচীরে দাঁড়িয়ে
নিদ্রাহীন অভিভাবক যে-রকম
একলা প্রহরায় গ্রামের গাঢ় ঘুম।

জীবিত সংসারে গির্জা ক্রুশহীন
এরই তো চারপাশে ঘুমোয় গ্রামখানি

ভক্ত কুকুরদের মতন ক্রুশখানি রয়েছে প্রহরায়
স্বর্গে যারা আছে, মৃতের সেই ঘুম।
রাত্রিময় সেই স্বর্গ থেকে যিশু
রাখাল রাজা তিনি
সংখ্যাহীন তাঁর চোখের ঝিকমিকি
ব্যস্ত গণনায় মেঘের ঝাঁকগুলি।

দেয়াল ঘেরা এই কবরে মৃতদল
একই তো মাটি গড়া দেয়াল এখানের
শান্ত নির্জন মাঠের মাঝখানে
একটি ক্রুশ শুধু ভাগ্যে তোমাদের।

আনতোনিও মাচাদো

['আমার হৃদয়ে বাসনার কাঁটা ফুটে ছিল। অনেক চেষ্টায় একদিন আমি সেই কাঁটাটা তুলে ফেললাম। তারপর থেকে আমি আমার হৃদয়ের অস্তিত্বই টের পাই না'—এই রকম সরল ভাবে আনতোনিও মাচাদো কবিতার মূল সত্যগুলি ব্যক্ত করতে পেরেছেন। পৃথিবী ও মানুষের জীবন ক্রমশ অতি জটিল হয়ে আসছে এই যুক্তিতে আজকের পৃথিবীর কবিতাও যখন জটিল—তখন মাচাদো অতি সহজ ভাষায় আশ্চর্য সৌন্দর্য সাধনা করে গেছেন। কবিতাকে তিনি বলেছেন 'আত্মার হৃৎস্পন্দন', শব্দ নয়, বর্ণ নয়, রেখা নয়, অনুভূতি নয়, কবিতা শুধু 'আত্মার হৃৎস্পন্দন'। এই নিবিড় ধ্যানময়তায় মাচাদো স্প্যানিশ ভাষায় এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

জন্ম ১৮৭৫, দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়ায়, শৈশব কেটেছে মাদ্রিদে, যৌবন ক্যাসটিলিয়ায়। ক্যাসটিলিয়ার বোরিয়া শহরে তিনি ছিলেন ফরাসি ভাষার শিক্ষক, এখানকার ভাঙা দুর্গ, দিউরো নদী, অরণ্য, পূর্বপুরুষের গর্ব নিয়ে বেঁচে থাকা বঞ্চিত মানুষ—এই সব নিয়েই তাঁর কবিতা। বিকেলবেলা তিনি একা হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন বহু দূরে, ফুলের সমারোহ আর ঝরে পড়া পাতার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কথা বলতেন নিজের সঙ্গে, প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি প্রকৃতির স্তুতি পাঠক ছিলেন না, প্রকৃতি তাঁকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করত। এই রকম বেড়াতে বেড়াতেই বনের মধ্যে একদিন লিওনোর নামের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, সেই অপূর্ব রূপসীকে মনে হয় বনদেবী, জেগে ওঠে ভালোবাসা। পরবর্তী কালে তিনি সেখানেই থেকেছেন, এই অঞ্চলটির কথা তাঁর সব সময় মনে থেকেছে, এখানকার পরিবেশ নিয়েই লিখেছেন। ১৯৩৯-এ ফরাসি দেশে তাঁর মৃত্যু।

মাচাদো ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন অ্যাগনস্টিক বা নির্বিকার। তাঁর অধিকাংশ কবিতারই নাম নেই, কারণ কবিতা যেহেতু আত্মিক উপলব্ধি—তাই তা রহস্যময় ও আখ্যার অতীত— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সূর্য, ফুল, স্বপ্ন, আয়না— এই বিষয়গুলি তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। তাঁর কবিতার একটি প্রবল ত্রুটিও আছে, তাঁর কবিতা বড় বেশি অর্থবহ, এত বেশি অর্থ যে অনেক সময় তা রূপকের পর্যায়ে চলে যায়। কবিতার প্রত্যেক লাইনে লাইনে গভীর অর্থ থাকলে—তা কবিতাকে ক্লান্ত করে। যেমন, উপরে উদ্ধৃত প্রথম লাইনে, আমার হৃদয়ে একটা কাঁটা ফুটে ছিল—এইটুকু বলাই যখন যথেষ্ট হতে পারত·সেখানে মাচাদো সেই কাঁটাটাকে থর্ন অফ প্যাশান পর্যন্ত বলে দিতে চান।]

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
স্বচ্ছ এক ঝরনা বহে যায়
ঘুরে ঘুরে আমার হৃদয়ে।

বলো, কোন গুপ্ত গলি পথে
জল তুমি এলে মোর কাছে,
নতুন জন্মের ঝরনা তুমি
আমি যার পাইনি আস্বাদ?

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
একখানি জীবিত মৌচাক
আমার হৃদয় জুড়ে আছে।

সোনালি রঙের মৌমাছিরা
কাজে ব্যস্ত হৃদয়ে আমার
খুঁড়ে খুঁড়ে পুরনো ব্যর্থতা
মোম আর মধু তৈরি করে।
কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
একটি জ্বলন্ত সূর্য উঠে
জেগে আছে বুকের গভীরে।

সে ছিল জ্বলন্ত বিকিরণ
লাল উনুনের মতো তাপ
এবং সে সূর্য, তাই আলো,
সূর্য এসে আমায় কাঁদাল।

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি—দিব্য উদ্ভাসন—
সেই তো ঈশ্বর আমি যাকে
হাতের মুঠোয় ধরে আছি।

একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বলল

একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বলল
আমি তোমার শান্ত হৃদয়ে ফুল ফুটিয়েছি
বহু বছর আগে, তোমার মনে পড়ে পুরনো পথিক,
তুমি পথের পাশ থেকে ফুল ছেঁড়োনি।
তোমার অন্ধকার হৃদয়, সে কি দৈবাৎ মনে রেখেছে
আমার সেই পুরনো দিনের লিলির সুগন্ধ?
আমার গোলাপেরা কি এখনও ঘ্রাণ মেখে দেয়
তোমার হিরের মতো উজ্জ্বল স্বপ্নের পরীর ভুরুতে?
আমি বসন্তের ভোরকে উত্তর দিলুম:
আমার স্বপ্নেরা শুধু কাচ
আমি আমার স্বপ্নের পরীকে চিনি না
আমি তো জানিনি, আমার হৃদয় ফুলের মধ্যে আছে!
তুমি যদি সেই পবিত্র ভোরের জন্য অপেক্ষা করো
যে এসে ভেঙে দেবে কাচের পাত্র
তবে হয়তো পরী তোমার গোলাপ ফিরিয়ে দেবে
আমার হৃদয় দেবে তোমায় লিলির গুচ্ছ।

হুয়ান র‍্যামোন হিমেনেথ

[হিমেনেথের জন্ম ১৮৮১, মৃত্যু ১৯৫৮। জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে একমাত্র বড় ঘটনা নোবেল প্রাইজ পাওয়ায় তিনি সমস্ত বিশ্বে, এবং বাংলা দেশেও বহু আলোচিত হয়েছেন। বাহুল্যবোধে হিমেনেথ সংক্রান্ত বিবরণ পুনরোচ্চারণ না করে, আমরা হিমেনেথের শুধু দুটি কবিতা এখানে বাংলায় প্রকাশ করলুম। কবিতা দুটি তাঁর জীবনের দুই প্রান্তের, প্রথমটি লিখেছিলেন যখন তিনি সদ্য-যুবা, আর দ্বিতীয়টি লেখেন বার্ধক্যে পৌঁছে, স্বদেশ থেকে দূরে 'সমুদ্রের অন্য পাড়' আমেরিকায় যখন প্রবাসী। প্রথম কবিতাটি সংলাপের ভঙ্গিতে লেখা, এখানে দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর কবির। প্রথম স্তবকে জল ও ফুল নামক স্পর্শসহ অস্তিত্বে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, দ্বিতীয় স্তবকে এনেছেন হাওয়া ও মায়া। হিমেনেথের কবিতায়—দণ্ডিত কার্মেলাইট, সেন্ট জন অব দি ক্রশ—ছাব্বিশটি কবিতার জন্য যিনি অমর হয়ে আছেন—তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। হিমেনেথের বিখ্যাত কবিতাবলী, প্লাতেরো নামক একটি গাধার সঙ্গে কথাবার্তা, এই বিষয়টিও তিনি পেয়েছেন সেন্ট জন অব দি ক্রশের কাছ থেকে, সেন্ট জন নিজের শরীরটাকেই বলতেন, মাই ব্রাদার অ্যাস। অর্থাৎ, এখানেও, নিজের সঙ্গেই কথাবার্তা।

তাঁর রচনা যতটা গভীর, ততটা অবশ্য গতিশীল নয়। আধুনিক স্প্যানিশ কবিতায় হিমেনেথের অনুকরণ তেমন নেই।]

কেউ না

—ওখানে কেউ না। জল।— কেউ না?
জল কি কেউ নয়?—ওখানে
কেউ না। ফুল।—ওখানে কেউ না?
তবু ফুল কি কেউ না?

—ওখানে কেউ না। হাওয়া।—কেউ না?
হাওয়া কি কেউ না?—কেউ
না। মায়া।—ওখানে কেউ না? আর
মায়া কি কেউ না?
পাখিরা গান গায়

সারা রাত জুড়ে
পাখিরা
আমাকে শোনালে তাদের রঙের গান।

এই রং নয়
সুর্যোদয়ের ঠান্ডা হাওয়ায়
তাদের ভোরের ডানার।
এই রং নয়
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণে
তাদের সান্ধ্যবুকের।
এই রং নয়
রাত্তিরে নিবে যাওয়া
প্রত্যহ চেনা ঠোঁটের
যে রকম নেবে
ফুল ও পাতার
প্রত্যহ চেনা রং
অন্য বর্ণ
আদিম স্বর্গ
এ জীবনে যাকে হারিয়ে ফেলেছে মানুষ।
সেই যে স্বর্গ
ফুল ও পাখিরা
শুধু যাকে চেনে গভীর—
ফুল ও পাখিরা
সুগন্ধে আসে যায়
সৌরজগতে ঘুরে ঘুরে তারা ওড়ে।
অন্য বর্ণ,
অবিনশ্বর স্বর্গ
মানুষ সেখানে স্বপ্নে ভ্রমণ করে।
সারা রাত জুড়ে
পাখিরা
আমাকে শোনালে তাদের রঙের গান।
অন্য বর্ণ
যা শুধু রয়েছে তাদের অন্য জগতে
শুধু রাত্তিরে নিয়ে আসে তারা হাওয়ায়।
কয়েকটি রং
আমি তো দেখেছি অতি জাগ্রত
জানি আমি তারা কোথায়।
জানি আমি ঠিক কখন
পাখিরা আসবে

রাত্রে আমায় শোনাতে তাদের গান।
জানি আমি ঠিক কখন
পেরিয়ে বাতাস পেরিয়ে বন্যা
পাখিরা গাইবে গান।

লেয়ন ফেলিপ

[পৃথিবীর সব দেশেই এই শতাব্দীর কবিতা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার ক্রমাগত অভিযোগ আছে। স্প্যানিশ কবিতা সম্পর্কে সে অভিযোগ খুবই কম খাটে। এখন আমরা এমন একজন কবিকে উপস্থিত করছি, যিনি সরল, স্পষ্ট, কিছুটা গদ্যময় কবিতায় বিশ্বাসী। তাঁর কবিতা বই পড়ার চেয়ে সভা-সমিতিতে আবৃত্তি শুনলে বেশি ভাল লাগে। এইরকম সর্বপ্রকাশ্য কবিতায় লেয়ন ফেলিপ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লেয়ন ফেলিপের পুরো নাম লেয়ন ফেলিপ কামিনো গালিথিয়া। জন্ম স্পেনে, ১৮৮৪। অন্যান্য অনেক স্প্যানিশ কবির মতোই, তিনিও গৃহযুদ্ধের সময় দেশ থেকে পলাতক হন। এখন মেক্সিকোয় স্থায়ী নিবাস।]

আমি নই গভীর সঞ্চারী

—'আমার গভীর সমুদ্র সঞ্চারী বন্ধু পাবলো নেরুদাকে'

আর, কালকেই এসে কেউ বলবে:
এই কবি তো কোনোদিন সমুদ্রের গভীরে আসেনি
এমনকী ছুঁচো বা নেউলের মতো মাটি খুঁড়ে যায়নি ভিতরে
এই কবি কোনোদিন দেখেনি সুড়ঙ্গের প্রদর্শনী
অথবা ভ্রমণ করেনি ঘোর তন্তুর অরণ্যে
সে ঢোকেনি মাংস ভেদ করে, খুঁড়ে দেখেনি হাড়
কখনো পৌঁছতে পারেনি অন্ত্র, পাকস্থলী পর্যন্ত
শিরায় শিরায় খালে-নদীতে সে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি,
রক্তের মধ্যে জীবাণু-বাহী হয়ে পাল তুলে ভ্রমণ করতে করতে
সে পৌঁছয়নি মানুষের জমাট হৃদয়ে।

কিন্তু সে বৃক্ষ চূড়ায় দেখেছে কীট

গম্বুজের মাথায় দেখেছে পঙ্গপালের ঝড়
হীরকোজ্জ্বল জলকে দেখেছে লালচে আর পঙ্কিল হতে,
দেখেছে হলদে প্রার্থনা
দেখেছে মৃগী রুগি পাদরির পুরু ঠোঁটে সবুজ লালা
গোল ঘরের ছাদে সে দেখেছে চটপট প্রাণী
প্রার্থনার বেদিতে দেখেছে রাত-পোকা
গির্জার দরজায় দেখেছে উইয়ের বাসা
বিশপের শিরস্ত্রাণে দেখেছে ঘুণ...
সে মোহান্ত প্রভুর ধূর্ত পিটপিটে চোখ দেখে বলেছে:
ইঁদারার শুকনো ছায়ায় আলো মরে আসছে ক্রমে
এই আলো আমাদের বাঁচাতেই হবে, কান্নার বন্ধনে।

ভেলাথকোয়েথ অঙ্কিত 'ভালেকা-র শিশু' চিত্রের পরিচিতি

এখান থেকে কেউ যেতে পারবে না
যতদিন এই ভালেকার শিশুর বিকৃত মাথাটি থাকবে
কেউ চলে যাবে না।
কেউ না
না সন্ন্যাসী, না আত্মহত্যা।

প্রথমে চাই তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার
প্রথমেই চাই তার সমস্যার সমাধান
আমরাই তার সমাধানের জন্য দায়ী
এর সমাধান চাই বিনা কাপুরুষতায়
পোশাকের ডানা মেলে বিনা পলায়নে
অথবা স্টেজের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে না গিয়ে—
এখান থেকে কেউ চলে যেতে পারবে না
কেউ না
না সন্ন্যাসী, না আত্মহত্যা।
নিরর্থক
নিরর্থক সব পলায়ন
(ওপরে বা নীচে)
সকলকেই ফিরে আসতে হবে।

বারবার।
যতদিন না (এক সুদিনে)
ম্যামব্রিনোর হেলমেট—
এখন আলোর বৃত্ত, হেলমেট বা গামলা নয়।
সাঞ্চোর মাথায় ঠিক খাপ খেয়ে যায়
এবং আমার ও তোমার মাথায়
ঠিক ঠিক, মাপে মাপে—
সেদিন আমরা সবাই চলে যাবো
ডানা মেলে
তুমি, আমি, সাঞ্চো
এবং সন্ন্যাসী ও আত্মহত্যা।

[ভেলাথকোয়েথ, বাংলায় যাকে আমরা বলি ভেলাস কুয়েজ, তাঁর এই বিখ্যাত ছবিটি একটি বাচ্চা বামনকে নিয়ে আঁকা, যার সর্বাঙ্গ বিকৃত, মনও নির্বোধ ও জড়। রাজা চতুর্থ ফিলিপ এই ধরনের বাচ্চা বামনদের রাজসভায় এনে মজা উপভোগ করতেন। কবি এখানে ওই বামনটিকে সমস্ত মানব সমাজের নির্যাতন, অপমান ও দুঃখভোগের প্রতীক করেছেন।

ডন কুইক্সোট (আসল উচ্চারণ যাই হোক না কেন) এবং তারা অনুচর সাঞ্চোকে বাংলাতে আমরা বহুদিন চিনি। ডন কুইক্সোট একদিন একটা নাপিতের পেতলের গামলা কেড়ে নিয়ে মাথায় দিয়ে ভেবেছিলেন, তিনি মহাশক্তিমান দুর্ধর্ষ দৈত্য ম্যামব্রিনোর বিখ্যাত হেলমেটের অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় কবিতার শেষ অংশে কবি এর উল্লেখ করে বলছেন, ওই হেলমেট শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক, ডন কুইক্সোটের মাথায় সেটা হয়ে ওঠে কবিত্ব ও কল্পনার আলোকমণ্ডল, কিন্তু পৃথিবীর সমস্যা দূর করতে গেলে, সাঞ্চোর মতন তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথাতেই তার বেশি দরকার।]

সেজার ভায়েহো

[এক বৃহস্পতিবার, প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে আমার মৃত্যু হবে— এই নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন সেজার ভায়েহো, তখন তাঁর বয়েস ২৮, এবং আশ্চর্য, এর ১৫ বছর পর কবিতাটিতে বর্ণিত অবস্থায় প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনাহারে, প্রবল যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করে, প্যারিসের একটি ঘরে মরে পড়ে ছিলেন তিনি ১৯৩৮ সালে।

তাঁর জন্ম ল্যাটিন আমেরিকার পেরুতে ১৮৯৫ সালে। ১৯১৮ সালে প্রথম কবিতার বই ছাপা হবার পর তাঁকে নির্যাতন, বিচার ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পরবর্তী জীবনে প্রবল

দারিদ্র ও উপবাসকে সঙ্গী করে স্পেন ও ফ্রান্সে ভ্রাম্যমাণ হয়ে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা ক্রমশ বিশ্বজনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

প্রথম কবিতাটির শিরোনামার অর্থ এই, তাঁর দেশের প্রাচীন রীতি ছিল জীবনের কোনও শুভ ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রাখা হত সাদা পাথরের ফলক লাগিয়ে, দুঃখের ঘটনায় কালো পাথর।]

একটি সাদা পাথরের ওপর কালো পাথর

প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে আমার মৃত্যু হবে
সেই দিন,—আমার স্মৃতিতে গাঁথা আছে:
প্যারিসেই মরবো আমি—একথায় ভয় পাইনি কোনো—
শরৎকালের এক বৃহস্পতিবার ঠিক আজকেরই মতো।
বৃহস্পতিবারই ঠিক, কারণ আজকের এই বৃহস্পতিবারে
আমার কবিতা লেখা গদ্যের মতন রুক্ষ হয়ে আসে
দু'হাতের হাড়ে খুব ব্যথা করে, যেরকম ব্যথা আমি কখনো বুঝিনি;
দীর্ঘ পথ ঘুরে এসে জীবনে কখনো আগে নিজেকে এমন
মনে হয়নি পরিত্যক্ত একা।

সেজার ভালেখা আজ মারা গেছে। সকলেই মেরেছিল তাকে
অথচ কারুর কোনো ক্ষতি সে করেনি।
তারা তাকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছিল, কঠিন প্রহার
কখনো চাবুকে; তার সাক্ষী আছে
বৃহস্পতিবারগুলি, দু' হাতের ব্যথাময় হাড়
আর নির্জনতা, বৃষ্টি, দীর্ঘ পথ।

আমিই একমাত্র বিদায় নিয়ে

আমি একমাত্র, পিছনের সবকিছু ফেলে বিদায় নেবো:
আমি এই বেঞ্চি থেকে উঠে দুরে চলে যাচ্ছি
আমি আমার আন্ডারওয়্যার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমার কাজ, এই নির্দিষ্ট জগৎ থেকে আমি চলে যাচ্ছি

আমার ভেঙে ছিটকে পড়া বাড়ির নম্বর থেকে দুরে চলে যাচ্ছি
সব কিছু ফেলে আমিই একমাত্র বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।
সাঁজেলিজে থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমি
চাঁদের পিঠে কোনো এক অদ্ভুত গলিপথে একবার বাঁক নিতে।
আমার মৃত্যুও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, আমার বিছানা বিদায় নিয়েছে;
চারপাশে রিক্ত, স্বাধীন মানুষের দল নিয়ে
আমার শারীরিক দ্বিতীয় সত্তা বেড়াতে বেরিয়ে এক এক করে
বিদায় দিচ্ছে তার প্রেতগুলিকে।
আমি সব কিছু থেকে বিদায় নিতে পারি, কারণ
পিছনে সব কিছু পড়ে থাকবে সূত্র হিসেবে।
আমার জুতো, ফিতের গর্ত, কোণায় লেগে থাকা কাদা
পরিষ্কার ধপধপে শার্টের ভাঁজ—এরাও থাকবে।

[দ্বিতীয় কবিতায় উল্লেখিত 'সাঁজেলিজে' হয়তো অনেকেরই পরিচিত, তবু বলি, 'সাঁজেলিজে' হচ্ছে প্যারিসের একটি বিখ্যাত, সুরম্য রাজপথ, মূল বানান Champs Elysees।]

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা

[একদিন সকালবেলা, তখনও ভালো করে ঘুম ভাঙেনি, একদল ফ্যাসিস্ট সৈনিক এসে লোরকাকে ডাকল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হল। তখন লোরকার বয়স মাত্র ৩৭, এবং এইভাবে স্প্যানিশ ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি এবং আধুনিক পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট কবির মৃত্যু হয়। তখন ১৯৩৬ সাল, স্পেনে গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে, বহু কবিই স্পেন থেকে পালিয়ে যান সেসময়, লোরকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখন অনেকে বলেন যে, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কোনো সৈনিক ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই লোরকাকে খুন করে।

লোরকার জন্ম ১৮৯৯, ভালো ছাত্র ছিলেন, কবিতা, নাটক এবং ছবি আঁকার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কৈশোরেই। ছাত্রাবস্থার শেষে নাটক লেখা ও পরিচালনা করাই ছিল তাঁর নেশা ও জীবিকা। একসময় সালভাদোর দালির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে সুররিয়ালিজমের প্রভাবে পড়েন কিন্তু গ্রাম্য গাথা, স্পেনের উপকথা ও জিপসিদের জীবন ও চরিত্র নিয়ে লেখাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ। বিশেষত জিপসিদের নিয়ে লেখাগুলিই তাঁকে অমর করছে। অবশ্য,

লোরকার এই শেষোক্ত কারণে খ্যাতি খুব পছন্দ ছিল না। একবার এক বন্ধুকে দুঃখ করে ছেলেমানুষের মতো লিখেছিলেন, জিপসি নিয়ে লিখি বলে লোকে ভাবে আমার বুঝি শিক্ষাদীক্ষা কিছুই নেই, আমি যেন একটা গ্রাম্য কবি! আমি মোটেই তা নই।

অনূদিত দ্বিতীয় কবিতাটি জিপসিদের নিয়ে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। সেজন্যও লোরকার দুঃখ ছিল। কারণ, অনেকে এই কবিতাটির আদিম সৌন্দর্য বুঝতে না পেরে শুধু যৌন সম্ভোগচিত্রই উপভোগ করেছে!]

বিদায়

যদি মরে যাই
জানলা খুলে রেখো

শিশুটির মুখে কমলালেবু
(জানলা থেকে আমি দেখতে পাই)
গম পেষাই করছে এক চাষা
(জানলা থেকে শব্দ শুনতে পাই)

যদি মরে যাই
জানলা খুলে রেখো।

অবিশ্বাসিনী পত্নী

তখন তাকে নিয়ে এলাম নদীর ধারে
ভেবেছিলাম যে সে তখনো কুমারী মেয়ে
কিন্তু তার স্বামী ছিল।

সে রাত ছিল সন্ত জেমস উৎসবের
কিছুটা যেন বাধ্য হয়েই ঠিক তখন
পথের আলো ক্রমশ নিবে আঁধার হল
আলোর মতো জ্বলে উঠল ঝিঁঝি পোকার সমস্বর

শহর ছেড়ে নির্জনতায় এসে
ছুঁয়ে দিলাম তার ঘুমন্ত স্তন দুটি

তখুনি তারা আমার জন্য পাপড়ি মেলে ফুটে উঠল
কচুরিপানার মঞ্জরীর মতন।

তার বুকের ব্রেসিয়ারের শক্ত মাড়
খসখসিয়ে উঠল আমার কানের কাছে
যেন রেশমি এক টুকরো মসৃণতা
দশ ছুরিতে ছিন্নভিন্ন করল কেউ

পাতার ফাঁকে নেই রুপোলি আলোর রেখা
বৃক্ষগুলি দীর্ঘ হয় ক্রমশ
এক দিগন্ত ভরা অসংখ্য কুকুর পাল
ডেকে উঠল বহু দূরের নদীর প্রান্তে।

পেরিয়ে কালো জামের বন
রাঙচিতে আর কাঁটাগাছের ঝোপ ছাড়িয়ে
তার চুলের আড়ালে বসে বেলাভূমিতে
নরম কাদায় আমি একটা গর্ত খুঁড়ি।

আমার গলার টাই খুলেছি একটানে
সে খুলেছে তার ঘাগরা, কাঁচুলি
রিভলবার সুদ্ধ আমার কোমরবন্ধ খুলে রেখেছি
সে খুলেছে চার রকমের অন্তর্বাস।

মাধবীলতা, সাগর ঝিনুক পায়নি এত রূপ
এত মসৃণ, সুন্দর তার ত্বকের রং
স্ফটিক-রঙা দিঘিতে চাঁদের আলোও নয়
তার শরীরে এমন উজ্জ্বলতা।

দু'খানি উরু পিছলে যায় উরুর নীচে
হঠাৎ ধরা মাছের মতন যেন অবাক
খানিকটা তার উষ্ণতা আর কিছুটা হিম
জঙ্ঘা ভরা শীত গ্রীষ্ম দুই ঋতু

সেই রাত্রে আমার অশ্ব-ভ্রমণ হল
জগতের সব পথের মধ্যে সেরা পথে

হিরে-পান্না দিয়ে সাজানো তরুণী ঘোড়া
বল্গা নেই, রেকাব নেই, তবুও বাঁধা।

পুরুষ আমি, তাই কখনো বলতে চাই না
ফিসফিসিয়ে আমায় সে যা শুনিয়েছিল
জিপসিদের ছেলে আমি, এটুকু জানি
গোপন কথা গোপন রাখাই খাঁটি নিয়ম।

চুমোর আঠা, বালির মধ্যে মাখামাখি
নদীর তীর থেকে উঠিয়ে নিলাম তাকে,
অন্ধকারে বনতুলসীর ধারালো পাতা
হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে মেতে ব্যস্ত তখন।

পুরুষ আমি, জানি পুরুষ-যোগ্য ব্যবহার
খাঁটি জিপসি সন্তানের মতন
একবাক্স রঙিন সুতো কিনে দিয়েছি তাকে
আড়াই গজ হলুদ-রঙা সাটিনও উপহার।

কিন্তু আমি প্রেমে পড়িনি সেই নারীর
আমি তো ঠিকই বুঝেছিলাম সে বিবাহিতা
তবুও কেন মিথ্যেমিথ্যি বলল আমায় কুমারী সে
যখন তাকে নিয়ে গেলাম নদীর ধারে?

[জিপসি ও অবিশ্বাসী নারী একসঙ্গে শুয়ে ভ্রমণ শুরু করল। বল্গাহীন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ। লোরকার এই বিখ্যাত কবিতাটি নিয়ে এক সময় বিতর্কের ঝড় ওঠে। লোরকা এখানে একটি নৈতিক সিদ্ধান্তও করেছেন যে, সঙ্গমের পর মেয়েটিকে পরিত্যাগ করার সময় পুরুষটির কোনো গ্লানি নেই—কারণ শুধু এই যে, সে জেনেছে মেয়েটি কুমারী নয়। পুরুষটিকে নির্দোষ দেখাবার জন্য লোরকা এমন একটি কায়দা প্রয়োগ করেছেন, যা অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কবিতার সব স্তবকগুলো চার লাইনের হলেও প্রথম স্তবকটি তিন লাইনের। অর্থাৎ একটি লাইন উহ্য আছে, সেখানে আন্দাজ করা যায়, মেয়েটিই প্রথম মিথ্যে কথা বলে পুরুষটিকে প্রলুব্ধ করেছিল।]

রাফায়েল আলবের্তি

[দেবদূত বিষয়ক কবিতাবলীই রাফায়েল আলবের্তির শ্রেষ্ঠ রচনা। যদিও সমুদ্র ও আন্দালুসিয়ার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার জন্য মাত্র ২৩ বছর বয়েসে তিনি সাহিত্যের জাতীয় পুরস্কার পান, হিমেনেথ প্রমুখ প্রবীণ কবিরা তাঁকে অভিনন্দন জানান, এবং সেই তরুণ বয়সেই আলবের্তি প্রতিষ্ঠিত কবি। কিন্তু যেবিষয়ে লিখে সার্থক হয়েছেন—তাকে অবলীলায় পরিত্যাগ করে বিষয়ান্তরে যেতে কোনও কবিরই দ্বিধা হয় না। সমুদ্র ছেড়ে আলবের্তি এলেন স্থলভাগে। কোনও সমালোচক এই দ্বিতীয় স্তরের আলবের্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'স্থলে ভ্রাম্যমাণ তরুণ ইউলিসিস।' নিঃসঙ্গ দেবদূতের মতো তিনি অচেনা মানব সমষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আলবের্তির জন্ম সাল ১৯০২। প্রথম যৌবন স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মাদ্রিদে কাটলেও পরবর্তী দীর্ঘ জীবন কাটে প্রবাসে, নির্বাসনে। শীতের সময় মানস সরোবর ছেড়ে আসা পাখিদের মতো, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোপন্থীদের বিজয়কালে, দলে দলে কবি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে চলে যান, অনেকেই আর ফিরতে পারেননি। নিরাশা, অত্যাচার এবং কবি বন্ধুদের মৃত্যু দেখে (লোরকা ছিলেন আলবের্তির ঘনিষ্ঠ সুহৃদ) প্রথম দিকে খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, আর কবিতা লিখবেন না। পরে, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায় হিসেবে, দূর থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতন কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন স্পেনের উদ্দেশ্যে। মাতৃভাষার প্রতি স্প্যানিশ লেখকদের টান এত প্রবল যে প্যারিস বা লন্ডনে তাঁরা নির্বাসন নেননি, অনেকেই গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা, কিংবা মেক্সিকোয় যেখানে স্প্যানিশ ভাষা চলে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বুয়েনস এয়ারিসে কাটাবার পর আলবের্তি এখন ইতালিতে আছেন, মাতৃভূমির কাছাকাছি।

কবিতার বহিরঙ্গে প্রথাগত ফর্ম এবং প্রাচীন ছন্দের পুনরুদ্ধার করলেও আলবের্তি মনে প্রাণে একজন সুরলিয়ালিস্ট।]

সংখ্যার দেবদূত

কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার,
কম্পাস, নজর রাখে
অন্তরীক্ষের ব্ল্যাক বোর্ডে।

এবং সংখ্যার দেবদূত
ভাবুক, উড়ে যায়
১ থেকে ২, ২ থেকে
৩, ৩ থেকে ৪-এ।

ঠান্ডা চক এবং স্পঞ্জ
ঘষে দেয়, মুছে দেয়
মহাশূন্যের আলো।
না সূর্য চাঁদ, না তারা
না বজ্র বিদ্যুতের
আকস্মিক সবুজ,
না বাতাস, শুধু কুয়াশা।

কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার নেই
কম্পাস নেই, কাঁদছে।
এবং মৃত ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর
সংখ্যার দেবদূত
মৃত, ঢেকে শোয়ানো
১ এবং ২-এর ওপরে,
৩-এর ওপরে, ৪-এর ওপরে...

দেবদূতের প্রত্যাগমন

যাকে আমি চেয়েছিলাম, সে ফিরে এসেছে,
যাকে আমি ডেকেছিলাম।
সে নয়, যে মুছে নেয় নিরস্ত্র আকাশ
নিরাশ্রয় তারা,
দেশহীন চাঁদ,
তুষার।
একটি হাত থেকে ঝরে পড়ে যে তুষার
একটি নাম
একটি স্বপ্ন
একটি কপাল

সে নয়, যার চুলের সঙ্গে
বাঁধা আছে মৃত্যু।
আমি যাকে চেয়েছি
বাতাস ছিন্নভিন্ন না করে

পাতাদের আহত না করে, জানলার শার্সি না কাঁপিয়ে
সে আসবে, যার চুলের সঙ্গে
বাঁধা আছে নিস্তব্ধতা।
সে আমাকে আঘাত না দিয়ে খুঁড়ে তুলবে
আমার বুকের মধ্যে এক মিষ্টি আলোর ভাণ্ডার
এবং নৌবাহনযোগ্য করবে আমার আত্মাকে।

[প্রথম কবিতায়, এই বিশ্বের সুর সংগীত যে এলোমেলো ভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তার তির্যক উল্লেখ। দ্বিতীয় কবিতায় মানুষকে শান্তি দিতে একজন দেবদূতের পুনরাগমন। যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, অন্ধকারের পরেও এক একজন দেবদূত আসে নিস্তব্ধতার বন্দনা শোনাতে। দেবদূত, অর্থাৎ কবি। কবিই ইচ্ছে করলে অন্ধকার জাগাতে পারে, আবার তারই হাতে উদ্ভাসনের অধিকার।]

পাবলো নেরুদা

সোনাটা

যদি আমায় প্রশ্ন করো, কোথায় আমি ছিলাম, তবে
আমি বলব, "এই রকমই হয়ে থাকে।"
আমি তখন পাথর-ঢাকা মাটির কথা বলতে বাধ্য,
বলতে হবে নদীর কথা ধৈর্য যাকে ধ্বংস করে;
আমার জানা শুধুই যে-সব পাখির ত্যক্ত
পিছনে ফেলা সাগর কিংবা এখন আমার বোনের কান্না।
কেন রয়েছে এত জগৎ, কেন প্রতিটি দিনের সঙ্গে
অন্য দিন সুতোয় বাঁধা? কেন একটি আঁধার রাত্রি,
মুখের মধ্যে ভরে উঠেছে? কেন মৃত্যু?
যদি আমায় প্রশ্ন করো, কোথা থেকে যে এসেছি আমি—
আমাকে কথা বলতে হবে ভাঙা জিনিসের
বলতে হবে তিক্ত আসবাবের কথা
কথা বলব, কখনো পচা, বিশাল বিশাল প্রাণীর সঙ্গে
কথা বলব আমার কাতর বুকের কাছে।
যা কিছু যায় হৃদয় ঘুরে সকলই নয় স্মৃতির ছায়া
বিস্মৃতিতে ঘুমোয় এক বাদামি পায়রা, সেও তো নয়,
কিন্তু কান্নাসিক্ত মুখ

গলার কাছে আঙুল
আর যা পাতা ঝরায়, তাদের ছায়া;
দিনের কালো মিলিয়ে যায়
আমাদের এই দুঃখী রক্তে প্রতিপালিত একটি দিন।
এখনও আছে মাধবীফুল, ইষ্টকুটুম পাখির ডাক
এসব দেখে ভালোই লাগে, এসব দেখি মিষ্টি শখের
ছবির কার্ডে
যেন সময় মধুরতার দু' হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়।
এসব দাঁত ছাড়িয়ে আরও গভীরে যাওয়া ভালো না
নৈঃশব্দ্যের ঢাকনাটাকে কামড়ে ছেঁড়া ভালো না
কারণ আমি জানি না ঠিক কী উত্তর দেব:
এত মৃত্যু। চতুর্দিকে কত মৃত্যু
সমুদ্রের কত দেয়ালে চিড় ধরাল লাল সূর্যের আলো
কত না মাথা নৌকোর গায় ধাক্কা মারল
কত না হাত দু' হাত ভরা চুমু রেখেছে
কত কিছুই আমি এখন ভুলতে চাই।

এখন আমি লিখতে পারি

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা

ধরা যাক লিখি: "আকাশ তারায় সাজানো
তারা, নীল তারা, কাঁপে দূর মহাশূন্যে।"

রাত্রির হাওয়া ঘুরে ঘুরে আসে, মহাকাশে গান গায়।

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা
আমি তাকে খুব ভালোবাসতুম,
সেও কোনোদিন আমায় বেসেছে ভালো
এরকমই কোনো রাতে আমি তাকে
দুই হাত ভরে জড়িয়ে রেখেছি।

আকাশের নীচে কত অসংখ্য চুম্বন করেছিলাম ওষ্ঠে।

সে আমায় খুব ভালোবেসেছিল,
কোনো কোনোদিন আমিও বেসেছি ভালো
আয়ত শান্ত তার দুই চোখ ভালো না বাসা কি সম্ভব?

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা
শুধু এই ভেবে, সে তো কাছে নেই, হারিয়েছি তাকে আমি।

কান পেতে শুনি বিশাল রাত্রি
তাকে ছাড়া আরও বিপুল বিশাল
কবিতা আমার বুকের ভিতরে ঝরে ঝরে পড়ে,
ঘাসের উপরে শিশিরের মতো।

আমার প্রণয় তাকে কাছে ধরে রাখতে পারেনি,
কিবা আসে যায়
রাত্রি এখন তারায় তারায়, সে আমার কাছে আজ নেই আর।

এই সব শেষ। দূর থেকে যেন গান গায় কেউ, খুব দূর থেকে
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় একটুখানিকও পূর্ণ হয়নি।

যেন তাকে কাছে টেনে নিতে চাই,
আমার দৃষ্টি খুঁজে ফেরে তাকে
আমার হৃদয় খুঁজে পেরে তাকে,
সে আমার পাশে আজ আর নেই।

আমি তাকে ভালোবাসি না এখন,
একথা সত্যি, তবু কত ভালোবেসেছি তাকে
আমার কণ্ঠ বাতাস খুঁজেছে, তার শ্রবণের কাছে পৌঁছোতে।

অপরের। আজ সে তো অপরের। যেমন আমার চুম্বন নিত
তার স্বর, তার সরল শরীর, অনাদি চক্ষু সবই অপরের
আমি তাকে ভালোবাসি না এখন, হয়তো এখনো ভালোবাসতুম
ভালোবাসা কত সামান্য, আর বিস্মৃতি এর বিপুল দীর্ঘ

এরকমই কোনো রাতে আমি তাকে
দুই হাত ভরে জড়িয়ে রেখেছি
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় একটুখানিকও পূর্ণ হয়নি।

এই শেষবার তার ব্যথা আমি হৃদয়ে পেলাম
আমার জীবনে তার উদ্দেশ্যে এই কবিতাই শেষবার লেখা।

[পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪-এ, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে। স্বদেশপ্রেম ও মানবতা সম্পর্কে তার সরল ও জোরালো কবিতাবলীর জন্যই তিনি বিখ্যাত। বাংলায় তাঁর কবিতা আগে অনেকগুলি অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই, একটি নারী যে কবিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে লেখা ২০টি কবিতার সিরিজে এইটিই শেষ কবিতা।]

নিকোলাস গিয়েন

[আমেরিকায় সম্প্রতি যে নতুন করে নিগ্রো স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিকোলাস গিয়েন রচিত নিগ্রোদের বিষয়ে একটি মর্মান্তিক কবিতা এখানে অনুবাদ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিকোলাস গিয়েন-এর জন্ম ১৯০২ সালে, কিউবায়। কিউবার তিনি প্রখ্যাত কবি এবং সমগ্র স্প্যানিশ কবিতাতেও তাঁর স্থান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা অনেকটা চারণ কবিতাসুলভ, আন্তরিকতায় এবং ছন্দ ও ধ্বনি মাধুর্যে খুবই প্রফুল্ল। স্পেনের প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবি উনামুনো এক সময় নিকোলাস গিয়েনকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনার কবিত্ব প্রতিভায় এবং শব্দের উপরে অধিকার দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছি। আপনার কবিতা পড়েই আমি নিগ্রোদের কথায় সুর ও ছন্দ বুঝতে শুরু করেছি।'

এই কবিতাটি যেসময়ে লেখা, তখনও কিউবা আমেরিকার মিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কমিউনিস্ট ঘেঁষা রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। আমেরিকার সঙ্গে কিউবার তখন ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার ফলে, আমেরিকার নিগ্রোদের দুঃখের সঙ্গে কিউবার একাত্মবোধ ছিল। কবিতায় বর্ণিত নিগ্রোদের দুরবস্থার সঙ্গে এখনকার নিগ্রোদের অবস্থার বিশেষ কোনও তফাত নেই। তবে নিগ্রোরা এখন পেয়েছে আইন অনুযায়ী সমান অধিকার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমর্থন।]

নিগ্রো

একটি ব্লুজ পাঠিয়ে দিল ছন্দময় আর্তনাদ
চমৎকার ভোরের দিকে।
লিলি শুভ্র দক্ষিণ তার চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল,
ভাঙল তাকে।
কচি নিগ্রো ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায়, সঙ্গে তাদের
ঘিরে রয়েছে শিক্ষা বন্দুক।
যখন তারা ক্লাসের মধ্যে ঢুকবে এসে
তারা দেখবে জিম ক্রো স্বয়ং তাদের শিক্ষক
লিঞ্চ নামে সেই জজ সাহেবের ছেলেমেয়েরাই অন্য ছাত্র;
প্রত্যেকটি নিগ্রো শিশুর দেরাজে থাকবে
কালির বদলে তাজা রক্ত
পেন্সিল নয় জ্বলন্ত কাঠ।

এই তো দক্ষিণ, এখনে কখনো চাবুকের শিস থেমে থাকে না।
সেই অত্যাচারিত জগতে
সেই কর্কশ, গ্যাংগ্রিন হওয়া অসহ্য আকাশের নীচে
নিগ্রো শিশুরা
সাদা শিশুদের পাশে বসে লেখাপড়া করতে পারবে না।
তারা তো শান্তভাবে বাড়িতে বসে থাকলেই পারে—
অথবা—অথবা আর কী পারে কে জানে—
তারা রাস্তা দিয়ে না হাঁটলেই পারে
অথবা তারা পারে চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করতে
অথবা বেছে নিতে পারে বন্দুক অথবা থুতুর নীচে মৃত্যু;
তারা একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে শিস দিতে পারে
অথবা ভয় পেয়ে, চোখ নিচু করে বলতে পারে, 'হ্যাঁ,'
মাথা নিচু করে, 'হ্যাঁ'

এই 'স্বাধীন পৃথিবীতে'—ডালেস যার ঘোষণা করছেন
বিমানবন্দর থেকে বন্দরে, 'হ্যাঁ,'
আর, এই সময় একটা সাদা বল
লঘু ছন্দময় ছোট একটা সাদা বল
প্রেসিডেন্টের গল্‌ফ খেলার বল—সেই ক্ষুদ্র গ্রহ—

গড়িয়ে যায় নিবিড় ঘাসের ওপর দিয়ে,
সবুজ, পবিত্র, নরম, মসৃণ ঘাস, 'হ্যাঁ'।
তা হলে এবার,
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, তরুণ যুবতীরা,
শিশু
এবং বৃদ্ধ—টাক অথবা চুলো মাথা, এবার
ইন্ডিয়ান, নিগ্রো, মুলাটো, সঙ্কর, এবার
এবার একবার ভেবে দেখুন
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত দক্ষিণ অঞ্চল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত চাবুক এবং রক্ত
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই সাদা মানুষদের জন্য সাদা ইস্কুল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত পাথর আর খুদের দল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত ইয়াঙ্কি আর অত্যাচার
ভাবুন সেই মুহূর্ত একবার
অন্তত একবার তা কল্পনা করে দেখুন!

[এ কবিতায় 'দক্ষিণ' বলতে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের চারটি প্রদেশ—মিসিসিপি, জর্জিয়া, অ্যালাবামা ও ভার্জিনিয়া—এদের বোঝায়। নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচার এখানেই সবচেয়ে প্রবল এবং অনবরত।

ব্লুজ—নিগ্রোদের লোকগীতি। এর সুর হয় ঢিমে লয়ের জ্যাজ—এবং এ গানের কথা সব সময়েই খুব করুণ। জিম ক্রো—একটি প্রাচীন নিগ্রো গান। এখন এই একটি মাত্র শব্দে—নিগ্রোদের প্রতি সমস্ত অত্যাচার ও বৈষম্য বোঝায়।

লিঞ্চ কথাটার মানে কোনও লোককে বিনা বিচারেই জনতা কর্তৃক হত্যা। শব্দটি তৈরি হয়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভার্জিনিয়ার দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট, কর্নেল চার্লস লিঞ্চ আর ক্যাপ্টেন উইলিয়াম লিঞ্চ এদের নাম থেকে। এই দু'জন বিচারক কোনও আইন না মেনেই অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিগ্রো) জনতার হাতে তুলে দিতেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলার জন্য। বিমানবন্দরে ডালেসের ঘোষণা—এর মর্মার্থ, আমেরিকার বিমানবন্দরে, কোনও বিদেশি পদার্পণ করলেই তার হাতে একটি ছাপানো শুভেচ্ছাবাণী তুলে দেওয়া হয়, যার বক্তব্য, এই স্বাধীন দেশে সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির সমান অধিকার। ইন্ডিয়ান—আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড ইন্ডিয়ান'দের ডাকনাম।

মুলাটো— অর্থাৎ কোনও নিগ্রো আর ককেশিয়ান—অর্থৎ সাদা মানুষের মিলনের ফলে জাত সন্তান। অর্থাৎ যাদের গায়ের রং কিছুটা হালকা, প্রায় ফর্সা।]

অকতাভিও পাজ

[অকতাভিও পাজের জন্ম মেক্সিকোতে, ১৯১৪, শিক্ষা মেক্সিকো ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। মেক্সিকোর সাহিত্য আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাকে বলেছেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী সবচেয়ে খাঁটি কবি। তিনি এখন ভারতবর্ষে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে থাকেন।]

নীল উপহার

যখন জেগে উঠলাম, ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভেজা। আমার ঘরের মেঝে সদ্য ধোয়া, লাল ইট থেকে উঠে আসছে উষ্ণ কুয়াশা। একটা মথ বাল্‌বের চারপাশে ঘুরছে, আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে। আমি খাট থেকে নেমে খালি পায়ে সাবধানে হেঁটে এলাম, যাতে না একটা কাঁকড়াবিছেকে মাড়িয়ে দিতে হয়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি ঘুমন্ত প্রান্তর থেকে ভেসে আসা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। আমি শুনতে পাই রাত্রির গভীর, রমণী নিশ্বাস। তারপর আমি বাথরুমে গিয়ে বেসিনে জল ঢেলে তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিলাম। ভিজে তোয়ালে দিয়ে আমি আমার বুক ও পা মুছে, খানিকটা শুকনো হয়ে, পোশাক পরতে শুরু করি, আগে দেখে নিই জামাকাপড়ের ভাঁজে ছারপোকাটোকা লুকিয়ে আছে কিনা। হালকা পায়ে সবুজ রং করা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হোটেল ম্যানেজারের মুখোমুখি পড়ে যাই। লোকটির এক চোখ কানা, দুঃখী, স্বল্পভাষী মানুষ, সে একটা দড়ির চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল চোখ বুজে।

সে ভাল চোখটা খুলে আমার দিকে তাকাল। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছেন, সেনর?

—একটু বেড়িয়ে আসি। আমার ঘরের মধ্যে বড় গরম।

—কিন্তু এখন তো সব বন্ধ। আমাদের এখানে রাস্তায় আলো থাকে না। আপনার ঘরে থাকাই ভালো।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিম্নস্বরে বললুম, 'এখুনি ফিরে আসব।' অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম। প্রথমটায় আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। পাথর-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে সোজা খানিকটা হেঁটে আমি সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটা কালো মেঘের পেছন থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, উদ্ভাসিত করে তুলল একটা জল-হাওয়া-জর্জর দেয়াল। সেই বিপুল সাদায় আমার প্রায় চোখ ঝলসে গিয়েছিল। ঝুরুঝুরু বাতাস দুলে উঠল, আমার নাকে ভেসে এল তেঁতুলগাছের গন্ধ। রাত্রির মধ্যে পাতার খসখসানি ও কীটের গুঞ্জন। চোখ তুলে তাকালাম উঁচুতে, এখন নক্ষত্রও ফুটে উঠছে। আমার মনে হল, এই বিশ্ব একটি বিশাল সংকেত প্রকল্প, বিশাল অস্তিত্বের কথোপকথন— আমার কান, ঝিঁঝির ডাক, তারার মিটমিটানি— এগুলি সবই

আসলে সেই সংলাপের যতি, পর্ব, অসম তাল। আমি একটি মাত্র শব্দের একটি মাত্র সিলেবল। কিন্তু সেই শব্দটা কী? কে সেই শব্দ উচ্চারণ করছে? কাকে? আমি সিগারেটটা রাস্তার পাশে ছুড়ে দিলাম, সেটা জ্বলন্ত অর্ধবৃত্তে ধূমকেতুর ছোট সংস্করণের মতো ঘুরে পড়ল। আমি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলাম। নিজেকে নিরাপদ এবং মুক্ত মনে হল, কারণ সেই বিশাল ওষ্ঠ আমাকে এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে, এমন সুখে। রাত্রি একটি চক্ষুর উদ্যান।

যখন একটি রাস্তা পার হচ্ছিলাম, বুঝতে পারলুম, কেউ যেন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ফিরে তাকিয়ে কারুকে দেখতে পেলাম না। দ্রুত হাঁটতে শুরু করি। একটু পরেই পাথরের ফুটপাতে লোহা-পরানো জুতোর শব্দ। পিছন ফিরে তাকাইনি, যদিও অনুভব করছি একটা ছায়া আমার কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। দৌড়ব ভেবেছিলাম, পারিনি। হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। কেন জানি না। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম কিন্তু তক্ষুনি আমার পিঠে একটা ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার স্পর্শ টের পেলাম। একটি চাপা কণ্ঠস্বর, 'নড়বেন না, সেনর, তা হলেই কিন্তু মৃত্যু।'

মাথা না ঘুরিয়েই আমি বললাম, 'তুমি কী চাও?'

'আপনার চোখ, সেনর।' লোকটির গলা অদ্ভুত রকমের ভদ্র, যেন কিছুটা অপ্রস্তুত।

'আমার চোখ? আমার চোখ নিয়ে কী করবে? দেখো, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, খুব বেশি নয় যদিও, তা সবই আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না।'

'না, না, সেনর, আমি আপনাকে খুন করতে চাই না, আমি শুধু আপনার চোখ দুটো চাই।'

'কেন?'

'আমার বান্ধবীর একটা শখ। সে এক গুচ্ছ নীল চোখের স্তবক চায়। বেশি লোকের তো ওরকম নেই।'

'তা হলে আমার দুটো দিয়েও কাজ হবে না। ও চোখ নীল নয়, ধূসর।'

'আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি আপনার নীল চোখ।'

'কিন্তু, আমরা খ্রিস্টান হে! তুমি হঠাৎ আমার চোখ দুটো তুলে নিতে পারো না। আমি আমার কাছে যা আছে সব দিচ্ছি।'

'শুধু শুধু গণ্ডগোল করবেন না,' তার কণ্ঠ এবার কর্কশ, 'ফিরে দাঁড়ান।'

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বেঁটে রোগা লোকটা, তালপাতার টুপিতে অর্ধেক মুখ ঢাকা। ডান হাতে একটা লম্বা ছুরি, চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে।

'মুখের সামনে একটা দেশলাই জ্বালুন।'

আমি দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে মুখের সামনে ধরলাম। আলোর জন্য আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু সে আঙুল দিয়ে আমার চোখের পাতা খুলে দিল। সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না, সে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঁকি মারল।

দেশলাইকাঠি পুড়ে শেষ হয়ে আসায় আঙুল জ্বালা করতেই ছুড়ে ফেলে দিলাম। সে একটুক্ষণ চুপ।

'এখন দেখলে তো? আমার চোখ নীল নয়।'

'আপনি বড় চালাক, সেনর। আর একটা কাঠি জ্বালুন।'

আমি আর একটা কাঠি জ্বেলে চোখের খুব কাছে ধরলাম। সে আমার জামা টেনে বলল, 'নিচু হয়ে বসুন।'

আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। সে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিল। তারপর সে আমার ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, ছুরিটা কাছে এগিয়ে এল, আরও কাছে, ছোঁয়া লাগল আমার চোখের পাতায়। আমি চোখ বুজলাম।

'চোখ খুলে তাকান!' সে বলল, 'পুরোপুরি!'

আমার চোখ চাইলাম। দেশলাইয়ের আগুনে পুড়ে গেল আমার চোখের পাতা। হঠাৎ আমায় ছেড়ে দিল।

'নাঃ, নীল নয়! মাপ চাইছি আমি।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই কথা বলে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মিলারেস ও দে লা সিলভা

[স্প্যানিশ কবিতা প্রসঙ্গে আমরা মূল স্পেন ভূখণ্ড ছাড়াও স্প্যানিশ-ভাষী কিউবা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের কবিদের কথা আলোচনা করেছি। এবারে আমরা খুব ছোট দুটি দ্বীপ-দেশের কবিকে উপস্থিত করছি, যেখানকার ভাষাও স্প্যানিশ। এই কবিদ্বয় তাঁদের স্ব স্ব দেশের বাইরে তেমন পরিচিত নন, কিন্তু এঁদের রচনার সরলতা ও আবেগের তীব্রতা সর্বজনীন।

অগাস্টান মিলারেসের জন্ম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৯১৭ সালে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ঠিক কোথায়, পাঠকের যদি এই মুহূর্তে মনে না পড়ে তবে জানাই, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপ-সমষ্টি ক্যানারি, জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ।

সলোমন দে লা সিলভার জন্ম ১৮৯৩ সালে নিকারাগুয়ায়। নিকারাগুয়া মধ্য আমেরিকায় ক্যারিবিয়ান আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ছোট্ট দেশ, লোকসংখ্যা এগারো লক্ষ। সলোমন দে লা সিলভা জীবনে অনেক কাজ করেছেন, উপন্যাস, কবিতা ও সাংবাদিকতা ছাড়াও যুদ্ধ করেছেন, শ্রমিক আন্দোলন গড়েছেন ও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্যারিসে নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ওইখানেই ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যু।]

অগাস্টান মিলারেস

শুভেচ্ছা

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে কবিতা
শুধু মানুষের সত্য অস্তিত্বের প্রকাশ,
কবিতা শুধু সত্যের গান, তাকে জাগিয়ে তোলা
যে দৈত্য দিবা রাত্রি পাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে।

কবির কণ্ঠই একমাত্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে
সেই ঊষাকে ভেদ করে জেগে ওঠা প্রথম শিখর
সেই পাহাড়েই ধ্বনিত হয় সময়ের সংগীত
তার হৃদয়ই প্রথম ছিন্নভিন্ন হয় যেকোনো যুদ্ধে

প্রথম সারিতে তার স্থান কখনওই অস্বীকার করা যাবে না
স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে তার আত্মীয়তা তাকে সেই স্থান দিয়েছে
একজন কবি সব সময়েই সেই মানুষের সঙ্গী
যারা যুদ্ধের সময় নির্ভীকভাবে ঝাঁপ দেয়

কবিই মৃত্যুরোধকারী জনতার প্রতিনিধি—
আকস্মিক রাত্রে যখন সব কিছুই বিস্মৃত
যখন কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই, কোনও জীবিত কবি নেই
তখন বাতাস না থাকায় পাখিরা ওড়ে না।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আমার ক্রোধ
যখন শাসানি আসে স্বাধীনতার প্রতি, আমাদের উষ্ণকারী সূর্যের প্রতি।
পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে এলে কবিও উত্তাপহীন হয়ে যায়
পৃথিবীতে তখন হৃদয় নেই, সুবিচার নেই।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আজকের দিনের
কর্কশ পথে একজন কবিকেই মানুষ তার ভাই বলে চিনবে।
আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে একজন কবিই সত্যিকারের মানুষ
যদিও কখনো কখনো সে আমাদের বোঝাতে যায় যে সে দেবতা।

সলোমন দে লা সিলভা

বুলেট

যে বুলেট আমাকে হত্যা করবে
সেই বুলেটেরও প্রাণ থাকবে

এই বুলেটের আত্মা হবে একটি গোলাপের মতো
যদি ফুল গান গাইতে পারে:
অথবা সে হবে হলদে মুক্তার সৌরভ
যদি রত্নেরও সৌরভ থাকে:
অথবা সে হবে সংগীতের শরীরের ত্বক
যদি আমাদের হাত দিয়ে
নগ্ন সংগীতকে স্পর্শ করা সম্ভব হত।

যদি সেই বুলেটটি এসে আমার মাথায় আঘাত করে
তবে সে বলবে, "আমি দেখছিলাম তোমার ভাবনা কত গভীর।"
যদি সে ঢুকে যায় আমার হৃৎপিণ্ডে
তবে সে বলবে, "আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাই,
আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি।"

রুশ কবিতা: প্রতীক্ষিত ক্রান্তিকাল

১৯১৭ সালের বিপ্লব রাশিয়ার জীবনযাত্রা, ইতিহাস সব কিছু অকস্মাৎ বদলে দেয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু বিপ্লব-পরিকল্পনার অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার সাহিত্যে একটা আমূল পালাবদল প্রতীক্ষিত ছিল।

গত শতাব্দীর প্রথম খণ্ডেই রুশ কবিতার স্বর্ণ-যুগের অভ্যুদয় ও অবসান। এই স্বর্ণ-যুগের সম্রাট ছিলেন পুশকিন, এ ছাড়া প্রায় কাছাকাছি প্রতিভাধর জুকভস্কি এবং ব্যাটিয়োস্কভ। পুশকিন একই সঙ্গে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতার সভাকবি, তিনি রাশিয়ার লোকসংগীত, পল্লিগাথার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন সমগ্র ইউরোপীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ফসল, তাঁর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাবলে রুশ কবিতা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে মন্দাকিনী ও ফল্গু। রাজনৈতিক কবিতা রচনার জন্য তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেই নির্বাসন তাঁর ক্ষেত্রে সুফলা হয়েছিল, নির্বাসনকালে লেখা তাঁর দীর্ঘ-কবিতাবলীতে রোমান্টিসিজম, সৌন্দর্যবন্দনা এবং বাস্তবতার অপূর্ব সমাহার দেখা যায়।

১৮৩৭ সালে পুশকিনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুশ কবিতার স্বর্ণ-যুগের অবসান হয় বলা যায়। পুশকিনের সময় আর একজন বিপ্লবী তরুণ, লেরমেনটফ কবিতায় বিদ্রোহ আনার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, বাসনার তীব্রতা এবং অহংকৃত নৈঃসঙ্গ ফুটে উঠেছিল লেরমেনটফের কবিতায়, কিন্তু মাত্র সাতাশ বছরে তাঁর মৃত্যু অকস্মাৎ সেই বিপ্লবে ছেদ এনে দেয়। পুশকিন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার গদ্যকাহিনীও লিখেছেন, তখনকার রাশিয়ার সেই কিশোর-গদ্য ক্রমে অতিকায় দানবের রূপ নিয়ে জেগে ওঠে, কবিতাকে দমন করে গদ্যের এমন প্রভুত্ব গত শতাব্দীতে পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। ১৮৪০-এর পর অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে রাশিয়ায় কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে। পুশকিন এবং গোগোলের গদ্য রচনা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, পরবর্তী দু' তিন দশকে আস্তে আস্তে দেখা দিলেন, ডস্টয়েফস্কি, টুর্গেনিফ, গনচারফ এবং টলস্টয়। তখন আর কবিতা কে পড়ে! এঁদের রচনায় সামাজিক বাস্তবতা এমন মর্মভেদী এবং সত্য হয়ে দেখা দেয় যে, তখন বহু সমালোচক কবিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরে বলেছিলেন যে, সেসব কবিতা লেখার কোনওই মানে হয় না, যার সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্কই নেই। এমনকী, একজন সমালোচক এসময় বলেছিলেন, একজোড়া জুতোর দামের চেয়েও শেকসপিয়ারের রচনাবলী কম মূল্যবান! টলস্টয়ও লিখেছিলেন, শেকসপিয়ারের রচনা

শুধু মাতাল, বেশ্যা আর খুনোখুনিতে ভরতি, ওর মধ্যে কোনও সাহিত্য নেই। ফলে এই সময় কবিতা খানিকটা মুখচোরা হয়ে পড়ে। সমাজের অনুশাসন মেনে কিংবা নিছক দেশের উপকারের জন্য কবিরা কখনও কলম ধরতে চাননি, কখনও হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে রাজি হননি। ফলে রাশিয়ায় সেই সময় কবিতা নিষ্প্রভ হয়ে গদ্যের উদ্ভাসিত জ্যোতি প্রত্যক্ষ হয়। তারপর সিম্বলিস্টরা এসে এই প্রায়ান্ধকারের অবসান ঘটায়।

গদ্যের এই জয়যাত্রার যুগে মাত্র দু'জন বড় কবির দেখা পাওয়া যায়। এই দু'জন দু'-দলের প্রতিনিধি। একদল সমাজবাস্তবতাবাদী, অপর দলের তখনও বিশ্বাস আর্ট ফর আর্টস সেক। এই দ্বিতীয় দল তখন কোণঠাসা, কিছুটা ধিক্কৃত, এঁদের মধ্যে প্রধান, আফানাসি ফেট—মধুর ললিত ভাষায়, প্রকৃতি, প্রেম ও বিষাদের কবিতা লিখে কিছু লোকের মন জয় করেছিলেন। তবু, ফেট-কে অবশ্য বিপ্লবের বহু আগেই 'রি-অ্যাকশনারি' আখ্যা পেতে হয়েছিল। প্রথম দলের প্রধান কবি নেক্রাসফ প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তখনকার গদ্যবাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নেক্রাসফের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশের দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক অপব্যবহার—এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যই কবিতা লেখা উচিত। অনুগামীদের তিনি ধমকে বলেছিলেন, 'তোমাকে কবি না হলেও চলবে, কিন্তু তোমাকে দেশের খাঁটি নাগরিক হতেই হবে!'

রাশিয়ার কবিতার জগতে এরকম বিশৃঙ্খলা চলেছিল গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত। ১৯১৭-র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, সাহিত্যকে সমাজবাস্তববাদী হতেই হবে এমন যে দাবি ওঠে, দেখা যাচ্ছে সেটা আকস্মিক বা ঠিক জোর করা নয়, এরকম প্রত্যাশা রাশিয়ায় গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই জেগেছিল এবং শুরু হয়েছিল। সে চেষ্টা অবশ্য ধারাবাহিক হয়নি, বাস্তবতা ও আদর্শের চিৎকারে পুরোপুরি হাঁপিয়ে ওঠার পর ১৮৯০ সালে আবার কবিতায় আধুনিক আন্দোলন শুরু হয়। একদল কবি বাস্তবতার বাড়াবাড়ি অগ্রাহ্য করে— ফিরতে চাইলেন হৃদয় গহনে, সামাজিকের বদলে ব্যক্তিগত দুঃখবোধ, অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধান, রহস্যের বন্দনা, ইত্যাদি প্রবেশ করল কবিতায়। ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল— অর্থাৎ শতাব্দী-শেষের কবিতায় যে চরিত্রলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ফরাসি কবিতায়, রাশিয়াতেও তার প্রভাব দেখা গেল, এই আধুনিক আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে সিম্বলিজম, বহু শক্তিমান কবির অভ্যুদয় হল, সমালোচকরা এই পর্বের নাম দিয়েছেন রুশ কবিতার দ্বিতীয় স্বর্ণ-যুগ। কিন্তু প্রথম স্বর্ণ-যুগের পুশকিন কিংবা লেরমেনটফের তুল্য মহান শক্তিধর কবি এঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না বলে, একে রুপোলি যুগ বলাই ভাল। রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই কবিরাই প্রধান স্থান অধিকার করে ছিলেন।

সিম্বলিস্ট আন্দোলনের প্রথম দলের কবিরা, ভাষার তীক্ষ্ণতা, শব্দঝংকার, ছন্দবৈশিষ্ট্য নিয়েও বেশি কারিকুরি দেখিয়েছেন। এঁদের পরবর্তী কবির দলই প্রকৃত অর্থে সিম্বলিস্ট, এঁদের মধ্যে সকলকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠে আসেন আলেকসান্দার ব্লক, বিংশ শতাব্দীর প্রকৃত রুশ কবিতার তিনিই প্রথম স্তম্ভ।

আলেকসান্দার ব্লক

[বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুশ কবিতায় দুটি পর পর স্পষ্ট সাহিত্য আন্দোলনের বিকাশ দেখা যায়। এই দুটি আন্দোলনেরই জন্ম পশ্চিম ইউরোপের অন্য দুটি দেশে। ফরাসি দেশ থেকে সিম্বলিস্টদের কবিতা ও রচনাদর্শ অনুপ্রাণিত ও পুনরুজ্জীবিত করে রুশ কবিতা, ব্লক এই ধারার অন্তর্গত। এর কিছু পরেই, ইতালির ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ঢেউ-ও এসে পৌঁছায় রাশিয়ায়, এবং এ আন্দোলনের নেতা হিসেবে দেখা দেন মায়াকভ্স্কি।

আলেকসান্দার ব্লকের জন্ম ১৮৮০-তে। রাশিয়ার সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, আজ পর্যন্ত রুশ কবিতায় তাঁর প্রবাহ অপ্রতিরোধ্য। বোদলেয়ার, মালার্মের প্রভাবে রাশিয়ায় সিম্বলিস্ট কবিরা জেগে ওঠেন। বোদলেয়ার প্রচারিত করেসপন্ডেন্স অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে একটা সত্য যোগসূত্র আছে, একমাত্র কবিরাই ব্যক্তিগত প্রতীকে তা প্রকাশ করতে পারেন, রুশ কবিরাও এ ধারণা গোড়ার দিকে মেনে নিয়েছিলেন। পরে কবিদের নিজস্ব প্রতিভায় তা অনন্যতা পায়। তিনি কবিতায় সুরের সর্বাত্মক প্রাধান্য বিশ্বাস করতেন।

১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, বস্তুত ১৯০৫ সাল থেকেই বিপ্লবের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শান্তি ও সংগীতময় জগৎ পেয়ে যাবার আশা করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের ঠিক পরেই যে অবধারিত বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা যায়, তাতে তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। দেশের কোথাও তখন সুরের উপযোগী আবহাওয়া নেই, সুতরাং শেষ জীবনে তাঁরও বুক থেকে সুর হারিয়ে যায়, কবিতা লেখার সব প্রেরণা থেকে নিঃস্ব হয়ে তাঁর মৃত্যু মাত্র ৪১ বছরে, ১৯২১ সালে।]

নামহীন একটি কবিতা

তুষার গোধূলিতে একটি কালো কাক
রৌদ্রে পীত কাঁধে কৃষ্ণ মখমল
একটি সুরময় কণ্ঠে মৃদু গান
আমাকে শোনাল সে দক্ষিণাঞ্চলে রাত্তিরের গান।

হৃদয় লঘু, এল কামনা বাধাহীন
সাগর যেন আজ জানাল সংকেত
অতল পাতালের থেকে অনন্তে
কীটেরা উড়ে যায় সঘন শ্বাস ফেলে।

বরফ-মেশা হাওয়া, তোমার নিশ্বাস
আমার নেশাখোর ওষ্ঠাধর...
ভ্যালেন্টিনা, তুমি স্বপ্ন, তারা!
তোমার দোয়েলেরা কেমনে গান গায়...

ভীষণা এ পৃথিবী! বড়ই ছোট এই বুকের তুলনায়!
তোমার চুম্বনের প্রলাপ জড়ানো,
জিপসি গানে গানে অন্ধকার ফাঁদ,
আকাশে উল্কার সবেগে উড়ে যাওয়া।

সুরদেবীর উদ্দেশ্যে
(শেষ অংশ)

রাত্রি, রাজপথ, আলো, একটি ওষুধের দোকান
একটি অর্থহীন মিটমিটে বাতি।
যদি তুমি বেঁচে থাকো আরও এক সিকি শতাব্দীতে
সব কিছুই তবু এই রকম থাকবে। এর থেকে মুক্তি নেই।
তুমি মরে যাবে, আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করে দেখো
সব কিছুরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সেই পুরনো কালের মতন;
রাত্রি, খালের জলে বরফ-মেটানো ছোট ঢেউ, সেই
একটি ডাক্তারের দোকান, রাজপথ, সেই আলো।

আনা অখমাতোফা

[রুশ দেশে সিম্বলিজম ও ফিউচারিজম এই দুই আন্দোলনের মাঝখানে আর এক সংক্ষিপ্ত কাব্যাদর্শ দেখা দিয়েছিল, যার নামকরণ হয়েছিল অ্যাকমেয়িজম, এর আয়ু মোটামুটি ১৯১০ থেকে ১৯১৭। সিম্বলিস্টদের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য এই ছিল যে, লৌকিক ও অলৌকিকের যোগাযোগের ধারণা ভুল, কবির যাবতীয় জ্ঞান এই মাটির পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই। কবিতায় এঁরা শব্দের নানা অর্থ পরিহার করে নির্দিষ্ট একটি অর্থকেই প্রকাশ করতে চান। আফ্রিকার আদিবাসীদের গান, অজানা বিদেশি রীতির প্রতি রোমান্টিক মোহ, প্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সরল বিষয় ছিল এঁদের বৈশিষ্ট্য। আনা অখমাতোফা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রথম রচনা শুরু করেন।

তাঁর জন্ম ১৮৮৮-তে। আসল নাম আনা আন্দ্রিয়েফনা গোরেঙ্কো। ২৬ থেকে ২৯ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অ্যাকমেয়িস্ট দলের প্রধান কবি গুমিলেফের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এর কিছু পরেই একটি পারিবারিক ট্র্যাজিডিতে তিনি আঠারো বছর কবিতা লেখা ছেড়ে চুপ করে ছিলেন। তাঁর স্বামী গুমিলেফ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অসম সাহসে লড়াই করেছেন, কিন্তু শেষ দিকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কবি গুমিলেফকে গুলি করে মারা হয়।

দীর্ঘকাল পরে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রেষ্ঠ জীবিত কবির সম্মান পান। তাঁর 'নায়কহীন একটি কবিতা' নিউইয়র্ক থেকেও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে।]

সায়াহ্নে
(অংশ)

বাগান থেকে সুরের ধারা ছড়িয়ে যায়
শব্দহীন ব্যথায়
টাটকা, কটু সাগর ঘ্রাণ ভেসে আসে
বরফে গড়া পিরিচে রাখা ঝিনুকে।

সে বলেছিল, আমি তোমার আন্তরিক সখা—
শুধু আমার পোশাকে তার হাত
আলিঙ্গনের চেয়েও এ যে অন্যরকম,
একটুখানি ছোঁয়া।

এমনি করেই মানুষ তার পোষা বিড়াল, পাখি
ছুঁয়ে আদর করে
এমনি করেই মানুষ দেখে সার্কাসের নটী।
সোনালি তার লঘু চোখের শান্ত পাতার নীচে
রয়েছে শুধু হাসি।

আলগা ধোঁয়ার আড়াল থেকে বাজে করুণ বীণা
যেন আমায় বলে:
স্বর্গে জানাও নতি, কারণ আজই প্রথম তুমি
একা পেয়েছ তোমার দয়িতাকে।

‘নায়কহীন একটি কবিতা’ থেকে
১৯১৩-র সেন্ট পিটার্সবার্গ

ক্রিসমাস-জোয়ার উজ্জ্বল হয়েছে উৎসবের আলোয়,
শকট উলটে যায় ব্রিজ থেকে, সমগ্র লোকের শহর
ভেসে যাচ্ছে কোন অজানা লক্ষ্যে, নেভা নদীর
নিম্ন স্রোতে অথবা উত্তরণে, যেখানেই হোক, তার
কবর থেকে অনেক দূরে। গ্যালারনায়া রাস্তার তোরণ
অন্ধকারে রেখাচিত্রার্পিত, গ্রীষ্মের বাগানে একটি আবহাওয়া-যন্ত্র
ধাতব সুরে গান গায়, উজ্জ্বল রূপালিচাঁদ হিম হয়ে
আসে রুশিয়ার রূপালি যুগে।
প্রতিটি রাজপথে একটি ছায়া ধীরে এগিয়ে আসে
প্রতিটি গুল্মের কাছে, সেইজন্য অন্ধকার
ঘনায় বসবার-ঘরে, খোলা-মুখ ফায়ার প্লেস থেকে
আর তাপ আসে না, ফুলদানিতে শুকিয়ে যায়
লাইলাক ফুল। এবং সমস্ত সময় জুড়ে দম আটকানো,
হিমশীতল, কামুক এবং অশুভ যুদ্ধপূর্ব দিনগুলির
বাতাসে একটি দুর্বোধ্য ঘর্ঘর শব্দ লুকানো...কিন্তু
সেই শব্দ তখন শূন্যগর্ভ শুনিয়েছিল...ঠিকমতো
কানে এসে পৌঁছোয়নি, হারিয়ে গেছে
নেভা-র তুষার-স্রোতে।
মানুষ যেন তখন আচ্ছন্ন, কোনো ভয়ংকর
রাত্তিরের আয়নায় সে নিজেকে তখন চিনতে চায়নি,
আর সেই প্রবাদময় নদীতীরে, ক্যালেন্ডারের নয়,
বাস্তব বিংশ শতাব্দী এগিয়ে আসছিল।

বরিস পাস্তেরনাক

[পাস্তেরনাক সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন তার পুনরুল্লেখ অবান্তর। মুখ্য তথ্যগুলি এই: জন্ম ১৮৯০, পিতা ছিলেন খ্যাতিমান চিত্রকর, প্রথম কবিতার বই বেরোয় ১৯১৪ সালে, কোনও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেননি, প্রায় ১৯৩৪ সাল থেকেই ১৯৫৩-তে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত, যখন সরকারের পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার লোকদের প্রতি নানান অনুশাসন জারি হতে থাকে, তিনি কবিতা লেখা

বা প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন, এই সময় বিদেশি সাহিত্যের বিশেষত শেকসপিয়ার অনুবাদ করেছেন। তাঁর উপন্যাস 'ড. জিভাগো' রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হলেও গোপনে ইতালিতে ছাপা হয় ১৯৫৭ সালে, পরে ইংরেজিতে। ১৯৫৮-তে তাঁর নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা ও প্রত্যাখ্যান, ১৯৬০-এ ভগ্নহৃদয় মৃত্যু। তাঁর রচনা রাশিয়ায় অন্যায় ভাবে নিষিদ্ধ করা এবং রাশিয়াকে সমালোচনা করার জন্য পশ্চিমি সভ্যতা তাঁর রচনাকে যেরকম অস্ত্রের মতন ব্যবহার করেছে—এই দুই বিষয়েই তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। বাংলায় পাস্তেরনাকের কবিতার সার্থক অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। পাস্তেরনাকের একটি কবিতা সংগ্রহ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন নচিকেতা ভরদ্বাজ।]

হ্যামলেট

ফিসফাস মিলিয়ে গেছে। আমি এসে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি
দরজার ফ্রেমের গায় ভর দিয়ে কান পেতে শুনি
দূরাগত প্রতিধ্বনির ভিতরে কোন বাণী,
কোন উপাদান, গল্প আগুয়ান আমার জীবনে।

রাত্রির গ্রহণ-আলো এখন আমার মুখে স্থির
সহস্র অপেরা-গ্লাস এদিকে ফেরানো
যদি বা সম্ভব হয়, তবে আব্বা, পিতা,
এ পেয়ালা আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও তুমি।

আমার পছন্দ হয় তোমার এ কঠিন রচনা
এই ভূমিকায় আমি অভিনয়ে যথেষ্ট সহজ
কিন্তু দেখো, এসময় অন্য নাটকের মধ্য পথ—
এখন আমার সেই রূপান্তরে মুক্তি পেতে চাই।

যদিও প্রতিটি দৃশ্য সুচিন্তিত, পূর্ব নির্ধারিত
যেখানে শেষের অঙ্ক, সেখানেই অবিচল শেষ।
আমি এক, সব কিছু ডুবে যায় কপট বিশ্বাসে
মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া—এক জীবন শেষ করা নয়।

শীতের রাত্রি

সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে
ছড়িয়ে গেল তুষার,
ছড়িয়ে গেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

যেমন আগুনের শিখার দিকে উড়ে যায়
গ্রীষ্মের পতঙ্গের ঝাঁক
বাইরের মিহি বরফ ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে জানলার দিকে।

হিম ঝঞ্ঝা বৃত্ত হয়ে ঘোরে,
তির পাঠায় জানলার শার্সিতে
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

ঘরের উজ্জ্বল ছাদে ছায়া পড়ে;
দু' দিকে মোড়া হাত, দু' দিকে মোড়া পা
দু' দিকে মোড়া নিয়তি।

ধপ্ করে শব্দ হয়ে দুটো জুতো পড়ল মাটিতে
পোশাকের ওপর কান্নার ফোঁটার মতন মোম
ঝরে পড়তে লাগল রাত্রির আলো থেকে।

আর সব কিছুই হারিয়ে গেল
ধূসর-সাদা তুষার-কুয়াশায়
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

কোণ থেকে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল
মোমের শিখায়
তখনি পরীর মতন, লোভের উত্তাপ তুলে ধরল দুটি ডানা
ক্রুশকাষ্ঠের ভঙ্গিতে।

বারবার মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি

['জনতার রুচির গালে এক থাপ্পড়'—এই নামে একটি ইস্তাহার বেরুল ১৯১২ সালে। নতুন সাহিত্য অভিযান শুরু করে যে চারজন তরুণ কবি এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিল তাদের মধ্যে ১৯ বছরের ছোকরা মায়াকভ্স্কিই সবচেয়ে তেজি। ইতালির মেরিনেত্তি যে ফিউচারিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রভাব এসে পড়ে রাশিয়ায়, কবিতার পূর্ব সংস্কার ভেঙে একদল কবি বিপ্লব করলেন। যা কিছু তথাকথিত কবিত্বময়, প্রথাসিদ্ধ সুন্দর, সেইসব আবরণ খুলে ফেলে এঁরা কবিতাকে রক্তমাংসের, সমসাময়িক জীবনের ও যথাযথ আবেগের প্রকাশ হিসেবে দেখতে চাইলেন। তারপর ১৯১৭ সালে এসে গেল রুশ বিপ্লব। মায়াকভ্স্কির মধ্যে একটা বেপরোয়া, তেজি, উদ্দাম-হৃদয় ছিল, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবের মধ্যে। এবং রুশ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেন। তাঁর জোরালো ও উচ্চকণ্ঠ শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারের ক্ষমতা ও ঝোঁক, তাঁর কবিতাকে বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে জনতার কাছে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, বিপ্লবীরা আসলে জন্মরোমান্টিক। সাম্যবাদী বিপ্লবের মধ্যে রোমান্টিকতার স্থান সামান্য, কিন্তু যে সমস্ত কবি ও লেখক প্রথমে এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন এক প্রকার রোমান্টিক প্রেরণাবশত। এইজন্যই এইসব সাহিত্যকারদের মধ্যে অবিলম্বেই আত্মহত্যা, নির্বাসন ও স্বপ্নভঙ্গের হিড়িক পড়ে যায়। বিপ্লবের মধ্যে একটা প্রবল ভাঙাচোরা আছে—যা শিল্পকে সব সময়েই আকর্ষণ করে, কিন্তু পরবর্তী গঠনের যুগে শিল্পী নিশ্চিত খানিকটা উদাসীন। কারণ, তাঁর বুকের মধ্যে ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকেই যায়। বিপ্লবের কবিতাগুলির জন্যই মায়াকভ্স্কি বিখ্যাত, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতাবলী, ভয়ংকর আবেগ, আত্মঘাত, অপমানবোধ, ক্রোধ ও করুণা প্রার্থনা—ইত্যাদির মিশ্রণে পৃথিবীতে অনন্যস্বাদ।

১৯৩০ সালে মায়াকভ্স্কি আত্মহত্যা করেন। বয়স মাত্র ৩৭, তখন তিনি খ্যাতি ও সম্মানের উচ্চশিখরে। তাঁর নোট বইয়ের মধ্যে যে ক'টা অসমাপ্ত কবিতা পাওয়া যায়, তার দুটি টুকরোও আমরা এখানে উপস্থিত করেছি।]

আমাদের যাত্রা

বিপ্লবের দামামা বেজে উঠুক ময়দানে
উচ্চে তোলো সারবন্দি অহংকারী মাথা
বিশ্বময় সব শহর ভাসিয়ে দেবো বানে
দ্বিতীয় মহাপ্রলয় আজ ছড়াবে সবখানে।
দিনের বাহন হেলে পড়েছে অতি
বৎসরের গরুর গাড়ি ঢিমে
গতি আমাদের দেবতা, শুধু গতি
হৃদয়গুলি দামামা সম্প্রতি।

আমরা সোনার চেয়েও দামি, জানি
বুলেট যেন ভ্রমণ, বুকে বেঁধে না
গানে আমরা হয়েছি শস্ত্রপাণি
গলার সুরে সোনালি ঝনঝনা।
ধূসর মাঠ, আনো তোমার সবুজ
দিনের জন্য পথ বানাও ঘাসের
হে রামধনু, এবার নীলাকাশের
ঘোড়া ছোটাও বৎসরের, সঘন নিশ্বাসের।

তারায় ভরা আকাশ আজ ম্লান
ওদের ছাড়াই আমরা লিখি গান।
সপ্ত ঋষি! শোনো এ দাবি জানাই
আমরা স্বর্গে জীবন্ত যেতে চাই!
চালাও ফুর্তি! গান করো! উৎসব!
বসন্ত ঋতু প্রত্যেক ধমনীতে
হৃদয়ে এখন তোলো যুদ্ধের রব
ধাতুর দামামা হৃদয়ের বৈভব।

অসমাপ্ত

২

এখন রাত একটা
  তুমি নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে আছ
অথবা, হয়তো, তুমিও আমার মতো...
  আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই।
এখন কোনো মানে হয় না, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে
  তোমাকে জাগিয়ে তোলা বা বিরক্ত করার—

৫

আমি জানি শব্দের ক্ষমতা, আমি জানি শব্দের মাদকতা
সেই শব্দ নয়, যা থিয়েটারে হাততালি পায়,
সেই শব্দ যা কফিন ফেটে বেরিয়ে দারুময় চার পায়ে হাঁটে
কখনো কখনো লোক তোমাকে বাতিল করে, ছাপা হয় না, প্রকাশক জোটে না
কিন্তু শব্দ তো অশ্বারোহী, বল্গা দৃঢ় করে ছুটে যায়
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাজে সেই শব্দ
রেল ট্রেনও একসময় হামাগুড়ি দিয়ে আসে কবিতার
  বিবর্ণ হাতে চুম্বন করার জন্য।
আমি জানি শব্দের ক্ষমতা। কখনো তাকে দেখায় খুব সাধারণ
নর্তকীর পায়ের কাছে ঝরে পড়া পাপড়ির মতন
কিন্তু মানুষ তার নিজের আত্মায়, ওঠে, হাড়ের মধ্যে...

সার্গেই এসেনিন

আমার মা-কে লেখা চিঠি

বুড়ি, তুমি কি এখনো বেঁচে রয়েছ?
আমিও বেঁচে আছি। আমি তোমায় ভালোবাসি
আমি তোমায় আশীর্বাদ করি তোমার ছোট্ট ওই বাড়িতে
বাণীর অতীত সায়াহ্নের আলোক ঝরে পড়ুক!

লোকে আমায় চিঠি লিখেছে, তোমার চোখে মুখে
—যদিও খুব লুকোতে চাও,—উৎকণ্ঠা, ভয়
আমার জন্য, আমার জন্য অধীর প্রতীক্ষায়
তোমার নাকি জীবন কাটে? বেরিয়ে এসে পথে
পুরনো কাঁথা শরীরে মুড়ে আমার জন্য তাকিয়ে থাক দূরে?
কখনও বুঝি সন্ধেবেলা নীল অন্ধকারে
হৃদয় কাঁপে আশঙ্কায়, প্রতিদিনের একই আশঙ্কায়
সরাইখানার মারামারিতে এই বুঝি কেউ আমার
বুকের মধ্যে ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে দিল!
বুড়ি, আমার মামণি, তুমি ভয় করো না, এসব
কিচ্ছু না, এ তো শুধুই ঘূর্ণী, মায়ার খেলা।
আমি কি এমন পাঁড় মাতাল হয়ে গিয়েছি, ভাবো?
তোমায় শেষ দেখার আগেই হঠাৎ মরে যাব?
আমি তোমার আগের মতোই ভালোবাসার আছি
এখন আমার দিবস জুড়ে একটি মাত্র স্বপ্ন
কখন আমি অস্থিরতা, দুঃখ ছিঁড়ে বেরিয়ে
তোমার কাছে গ্রামের সেই বাড়িতে ফিরে যাব।
ফিরব আমি, যেদিন তোমার ছোট্ট সাদা বাগান
বসন্তের অনুকরণে ছড়াবে বহু শাখা
তখন যেন খুব সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো না তুমি আমার
যেমন তোমার স্বভাব ছিল আট বছর আগে।
যে সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে তাদের জাগিয়ো না
যে সব সাধ সত্য হয়নি, তাদের ছুঁয়ে কী লাভ!
আমার এই নিয়তি ছিল, এমন দুঃখ পাওয়া
জীবন আমার শুরুই হল যন্ত্রণার দিনে।
আমাকে তুমি বলো না আমার প্রার্থনার মন্ত্র,
অতীত কালে ফেরা আবার অসম্ভব আমার।
তুমিই শুধু একা আমার সাহায্য ও শান্তি
তুমিই শুধু আমার কাছে বাণীর অতীত আলো।
আমার জন্য অমন আর ভাবনা করবে না তো?
অমন করে থেকো না আর আমার প্রতীক্ষায়
দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে পথের দিকে চেয়ে
পুরনো কাঁথা শরীরে মুড়ে দাঁড়িয়ো না আর তুমি।

শেষ কবিতা

হে বন্ধু, বিদায়
প্রিয় বন্ধু, তুমি আছ আমার হৃদয়ে...
আমাদের পূর্বনির্ধারিত এই বিদায় মুহূর্ত
ধরে আছে ভবিষ্যতে মিলন শপথ।
বিদায়, হে বন্ধু, কোনো কথা নেই, হাতে নেই হাত
দুঃখিত হয়ো না, শোকে বাঁকিয়ো না ভুরু
এ জীবনে মৃত্যুর ভিতরে কোনো নতুনত্ব নেই
অবশ্য একথা ঠিক, বেঁচে থাকা খানিকটা অভিনব বটে।

[যদিও মা-কে লেখা চিঠিতে এসেনিন বলেছিলেন, আমি সেরকম বদ্ধ মাতাল হইনি যে তোমার সঙ্গে দেখা না করে হঠাৎ মরে যাব—কিন্তু তিনি কথা রাখেননি। এলোমেলো দুর্দান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন এসেনিন, হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বিয়ে করলেন ইসাডোরা ডানকানকে। কিন্তু শিল্পের সৃষ্টি ও মানুষের জীবনকে ধ্বংস করার জন্যই তো ওসব নারীর জন্ম। সারা পৃথিবীকে তখন অকপট সৌন্দর্যের স্পন্দনে কাঁপিয়ে দিয়েছিল যে নারী, তাকে বিয়ে করল এক সাতাশ বছরের কবি। ইসাডোরার বয়স তখন চল্লিশ পার এবং অন্তত চল্লিশ জন পুরুষকে নিভৃতে দেখেছেন। সেই বিবাহবন্ধন টিকে ছিল মাত্র দেড় বছর। এর পর থেকে এসেনিন অবিরাম মদ্যপান শুরু করেন, জীবনযাত্রার সমস্ত নিয়ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারপর একদিন লেনিনগ্রাডের এক হোটেলে হাতের শিরা কেটে ফেললেন। নিজের হাত থেকে বেরিয়ে আসা ফোয়ারার মতন রক্তধারায় কলম ডুবিয়ে লিখলেন শেষ কবিতা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। তখন কবির বয়স মাত্র ৩০, তখন ১৯২৫ সাল।

এসেনিনের জন্ম ১৮৯৫-তে, বয়েসের হিসেবে তিনি যদিও পাস্তেরনাক বা মায়াকভ্স্কির পরে, কিন্তু এসেনিন যেন রাশিয়ান কবিতার একটি হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়। তখন মায়াকভ্স্কির প্রবল প্রতাপ, এসেনিন তাঁর নেতৃত্ব বা প্রভাব মানতে চাননি, তিনি এজরা পাউন্ড প্রভৃতি ইমেজিস্টদের ধরনের আন্দোলন আনতে চাইলেন রাশিয়ায়। কিন্তু তাঁর মানসিকতা ছিল অন্যরকম, ফলে এই দ্বিধার মধ্যে তাঁর কবিতা যথার্থ মর্যাদা পরবর্তীকালে পায়নি। এসেনিন বর্তমান অনুবাদকের প্রিয় কবি।

এসেনিন ছিলেন চাষার ছেলে, নাগরিকতার সবগুলো বিষ গ্রহণ করেও তিনি গ্রামের শ্যামলতার জন্য চিরদিন উন্মুখ ছিলেন। রুশ বিপ্লবের সময় তিনি সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রেণীহীন সমাজ ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু দেশের অগ্রগতির জন্য যখন গ্রাম ভেঙে আধুনিক কলকারখানা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি তৈরি শুরু হয়, তখন তিনি অযৌক্তিকভাবে কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য অরণ্য বিনাশ করে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা দরকার, কিন্তু তবুও দু'-একজন কবি থেকে যাবেই যারা ইস্পাতের সমস্ত উপকারিতা ভোগ

করেও সেই লুপ্ত অরণ্যের জন্য শোক করবে। বন্যা বন্ধ করার জন্য নদীতে বাঁধ দিতেই হবে, তবু দু'-একজন কবি নদীর সেই উগ্র, ভয়ংকর রূপ আর দেখতে পাওয়া যাবে না ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই, তা বলে, এদের প্রগতির বা সভ্যতার শত্রু বলা যাবে না, এরাই 'ধনুকের ছিলা রাখে টান'।]

এফগেনি এফতুশেংকো

[রুশ বিপ্লবের বছর পনেরো পর থেকেই শুরু হয় রাশিয়ার সাহিত্যের সবচেয়ে দুঃসময়ের কাল। সাহিত্যের ওপর আদর্শবাদের জুলুম এসে সৃষ্টিশীল লেখকদের চুপ করিয়ে দেয়। ১৯৪৯ সালে সমস্ত সাহিত্যের গ্রুপগুলোকে জোর করে ভেঙে তৈরি হয় একমাত্র রাষ্ট্রশাসিত 'সোভিয়েট লেখক সমিতি' এবং যেসব রচনায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের স্পষ্ট ছাপ নেই, তা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হতে থাকে। এই সময়ই আইশাক বাবেল তিক্ত হাস্যে বলেছিলেন, এখন খাঁটি লেখকদের দেখাতে হবে, হিরোইজম অফ সাইলেন্স। ততদিন এসেনিন এবং মায়াকভ্স্কি আত্মহত্যা করেছেন, পাস্তেরনাক ও অখমাতোফা চুপ।

স্টালিনের শিল্প-বিরোধ শাসন ও লাভেন্তি বেরিয়ার পুলিশ চক্র শেষ হলে জেগে ওঠে রাশিয়ার দ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়। এরা বিপ্লব চোখে দেখেনি, বিপ্লবের পরবর্তী দুঃখ ও নিষ্পেষণ সহ্য করেনি, এরা সুসময়ের ফসল ভোগ করছে। সুতরাং শিল্পে সাহিত্যে এরা স্বাধীনতা ও বিশ্ব আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল। এই নবীন দলের প্রধান কবি এফতুশেংকো এবং ভজনেসেনস্কি। ক্রুশ্চফের আমলে পশ্চিমের জানলা কিছুটা খুলে যায়, রুশ সংস্কৃতিদলের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করার সময় এফতুশেংকো রাশিয়ার বাইরে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হন। প্যারিসের একটি পত্রিকায় তাঁর অতিসচেতন আত্মজীবনী ছাপা হতে থাকে।

তরুণ এফতুশেংকোর কবিতা সরল ও ধ্বনিপ্রধান। তাঁর কবিতার বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, হাজার হাজার লোক শুনেছে তাঁর কবিতা পাঠ। তাঁর আবেগ সহজে মর্মভেদ করে। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, আমি কমিউনিজম জানি না, ভালোবাসা জানি। ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল, তাও গ্রাহ্য করেননি।

কিন্তু ক্রুশ্চফকে যতটা উদার মনে করা হয়েছিল, শেষদিকে সে ধারণা তিনি নিজেই ভেঙেছেন। একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ফিলিস্টিনিজম নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। অতিরিক্ত স্বাধীনতার বাড়াবাড়ির জন্য পশ্চিম ভ্রমণের মাঝপথেই এফতুশেংকোকে দেশে ফিরিয়ে এনে ধমকে দেওয়া হয়। ক্ষমা প্রার্থনা করে এফতুশেংকো কমিউনিজম ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানান। তাঁর কবিতা এখনো তারুণ্যের দীপ্তি ও দুঃসাহসময়।]

সীমান্তের বিরুদ্ধে

পৃথিবীর সব সীমান্ত আমায়
বিরক্ত করে।
আমার বিশ্রী লাগে যে আমি কিছুই জানি না
বুয়েনোস এয়ারিস কিংবা নিউ ইয়র্ক
সম্পর্কে।
আমার ইচ্ছে করে এলোমেলোভাবে
ঘুরে বেড়াই লণ্ডনের পথে পথে,
কথা বলি মানুষের সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা
ভাষায়।
বালকের মতন আমার ইচ্ছে হয়
সকালবেলার প্যারিসে
বাসে চড়ে বেড়াতে।
এবং
আমি চাই একটি শিল্প
যা আমারই মতন
পরিবর্তনশীল।

একটি কবিতা

আমি ভিজে মাটির ওপর শুয়ে থাকব
আমার কোদালটাকে জড়িয়ে।
মুখের মধ্যে একটা ঘাসের শিস
টক টক ঘাস।
এই অভিশপ্ত জমিকে খুঁড়তে খুঁড়তে
এত জোরে—যাতে কোদালটা ভেঙে যাবে প্রায়,
ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব,
কিন্তু ঘুমের প্রশ্নই তো ওঠে না।
'কী?
নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারো না?
দেখো তো ওই ছোট্ট পাখিটাকে!'

আকাশ-নীল ব্লাউজ আর বুট পরা মেয়েটির
কাছ থেকে এই বিদ্রূপ ভেসে আসে।
এবার সে একটা বিরক্তিকর গান শুরু করবে:
'যেদিন পাব প্রিয় তোমায়
  সারা শরীরে নখের দাগ বসাব'—
তার ধূসর রঙা কোদালটা হাওয়ায় ঝলসিয়ে
কানের দুলে ঝুমঝুমে শব্দ করে
সে এইরকম চালিয়ে যাবে—যতক্ষণ না
ছেলেরা গুমরে গুমরে ওঠে।
প্রত্যেকেই হাসবে:
  'সাপিনী একটা!
আংকা, একটু চুপ করতে পারো না!'
শুধু আমি জানি,
আকাশের তারা এবং লেবুর ঝোপ জানে
যখন সে আমার সঙ্গে রাত্রি বেলা অরণ্যে যায়
লেবুর গন্ধময় রাত্রে সে কেমন নিঃশব্দে
হাত দিয়ে ঘাসগুলোকে সরায়
মাতালের মতো অসংবদ্ধ ওর পদক্ষেপ
কী দুর্বল আর অসহায়,
রৌদ্র-তাম্র হাত দু'খানি ঝুলিয়ে
সে আমার সঙ্গে কথা বলে সুন্দর বিভ্রান্ত ভাষায়...।

আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন লেগেছে!
সেই হলঘরগুলি
সেই সব রেখাচিত্র, সব
জায়গায় আগুন, মার্জনার চিঠির
মতন, আগুন! আগুন!

লাল-নিতম্ব গোরিলার মতন
ওই উঁচুতে ঘুমন্ত কার্নিশে—
জানলা ভেঙে যায়, গর্জন করছে ঝাঁপিয়ে
পড়ার জন্য, আগুনে!

আমার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য
পড়াশুনো করছিলুম, হ্যাঁ, আমাদের
উচিত, আমাদের খাতাপত্র, থিসিস
বাঁচানো! আমার গবেষণাগুলো
এর মধ্যেই ফাটতে শুরু করেছে তালাবন্ধ
সিন্দুকে—
বিরাট একটা কেরোসিনের বোতলের মতন
পাঁচটা গ্রীষ্ম, পাঁচটা শীত
হুস করে জ্বলে উঠল শিখায়
হে আমার মধুর যৌবন
আঃ, আমরা এখন আগুনে পুড়ছি!

পরীক্ষায় টুকলি করার জন্য ছোট ছোট
কাগজে নোট, উৎসব, দল, সব গেল,
যাচ্ছে, এই যে গেল, উঁচুতে উঁচুতে
লকলকে শিখায়—
তুমি ওইখানে রইলে, ট্যাপারির ঝোপে
একটি ছিটে গোলাপি
বিদায়! বিদায়!
বিদায় স্থাপত্য
বিদায় আগুনের শিখায়
শিশু কন্দর্পদের ছোট ছোট গোয়ালঘর
প্রাচীন জমকালো সেভিংস ব্যাঙ্ক, তোমাদের বিদায়
হে যৌবন, হে ফিনিক্স
হে মূর্খ, তোমার সার্টিফিকেটগুলো যে
সব আগুনে পুড়ে গেল!
হে যৌবন, লাল স্কার্টের মধ্যে তোমরা
তোমাদের পেছন দোলাচ্ছ, হে যৌবন
তোমরা বক্‌বক্ করে জিভ দোলাচ্ছ—

বিদায়, সীমানার কাল,
মাপজোক, জীবন এই রকম
এক জ্বলন্ত উৎসব থেকে অন্য প্রজ্জ্বলনে
যাতায়াত, আমরা সবাই আগুনের মধ্যে—
তুমি বেঁচে আছ—তুমি আগুনে জ্বলছ,

কোন ঘোরানো কল, কোন স্তম্ভ জেগে উঠবে
এই আগুন থেকে—
ট্রেসিং পেপারের ওপর দিয়ে প্রথম স্কি করার
দাগের মতন ছুটে যাওয়া?

কিন্তু কাল, অশুভ পাখির মতন কিচির মিচির করে,
ভোমরার চেয়ে বেশি রাগী,
এক মুঠো ছাইয়ের মধ্যে দেখা যাবে কম্পাসটাকে
হুল ফোটাবে...

সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,
বাঃ
সবাই এবার বুক ভরে নিশ্বাস নাও।
সব কিছু শেষ?
সব কিছুর শুরু হল
এবার চলো, আমরা
সিনেমা দেখতে যাই!

[রাশিয়ার যে তরুণ কবিকুল সাম্প্রতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তাঁদের মধ্যে ভজনেসেনস্কি কনিষ্ঠতম, এবং এখন সমালোচকদের বিচারে, তিনিই ওই তরুণ দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। এফতুশেংকো নেতা হিসেবে প্রচুর সম্মান ও প্রচার পেয়েছেন কিন্তু শব্দজ্ঞানে ও কবিত্বে ভজনেসেনস্কিই পাঠকদের কাছে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য। তাঁর বয়েস এখন তিরিশ পেরিয়েছে। ১৯৬০ সালে লেখা এই কবিতাটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছে, বহুদিন পর রাশিয়ার কবিতায় আবার দেখা গেল যে অগ্নিকাণ্ডের জয়গান করা হয়েছে, ভাঙন নিয়ে উল্লাস ও ইয়ার্কি করা হয়েছে। শুধু সৃষ্টি, সংগঠন, সংঘবদ্ধতার নামে জয়ধ্বনি তোলা—যা ছিল সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে সরকারি নীতি, তার বাইরে বেরিয়ে এলেন এই যুবা কবিবৃন্দ। যৌবন বয়সের সাহিত্য ভাঙার দিকে যাওয়াই স্বাভাবিকধর্ম— যেকোনও দেশে।]

সংযোজন: অগ্রন্থিত কবিতা

সূচিপত্র

একটি চিঠি ২৬৭, মাটির হৃদয় ২৬৮, স্বর ২৬৮, নীলীরাগ ২৬৯, রবীন্দ্রনাথের তেইশ বছরের শোক ২৭১, সমর সেন ২৭২, কিছুক্ষণ ২৭৩, আবর্তন ২৭৫, অন্য দেশ ২৭৬, স্বপ্নে দেখা জীবন ২৭৭, তোমার ঘুমের পাশে ২৭৮, বৃক্ষ-বন্দনা ২৭৯, লোভ এবং নির্জনতা ২৭৯, জেগে আছ ২৮০, রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা ২৮১, মৃত্যু ২৮১, উৎপাত উপলক্ষে গদ্য রচনা ২৮২, চরিত্রের অভিধান ২৮৩, কলকাতা ১৯৬৬ ২৮৮, বাধা ২৮৯, নির্বাসন ২৯০, অতীত কিশোরী ২৯০, প্রতীক্ষার পর ২৯১, চলো যাই ২৯২, সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে ২৯২, বাদলা পোকা ২৯৩, সুন্দরবন ভ্রমণ ২৯৪, তবুও আনন্দে আছি ২৯৫, সামান্য ২৯৬, দেখা ২৯৬, বুকের ভিতর ঘড়ি ২৯৭, ক্রমশ পৃথিবী ২৯৭, পতন ২৯৮, এ শহরে আজ ২৯৮, ঘুম ২৯৯, এমন মানুষ রোজই দেখি ২৯৯, দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি ৩০১, বিচ্ছেদ ৩০১, সিঁড়ির ওপরে ৩০২

একটা চিঠি

বলাকা, তোমার শুভ্র চোখেতে পায়নি ঘুম?
জানো নাকি এটা কুয়াশায় ঢাকা
রাত নিঝুম!
স্বপ্ন দেখো না? এখনো কি তার
সময় নয়?
বলাকা, তুমি কি পেয়েছ ভয়?
জানো নাকি আমি পথে ঘুরে ঘুরে, দিশে হারা।—
আকাশের মায়া গান গেয়ে করে
গৃহ ছাড়া।
তোমার বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছি আমি
সেই ধ্বনি—
বলাকা এই কি জাগরণী?
মরু পর্বতে ঘূর্ণি ঝড় যে হল শুরু।
আকাশের বুকে মেঘ শিশুদের
গুরু গুরু।
হিংস্র নখর এখনো লুকোয় বাঁকে বাঁকে
সরল কুমারী বোবা চোখে শুধু
চেয়ে থাকে।
সমুদ্র-ঝড় আসেনি এখনও
মনে মনে?
বলাকা-হৃদয় এখনো কি শুধু দিন গোনে?
মন উত্তাল পাখি শুধু ডাকে বোবা যুগে,
ফেরারি বাহিনী বছর কাটায়
উদ্যোগে।
মনের সূর্য তবুও ভাঙবে
অন্ধ ঘোর
বলাকা, তুমি কি দেখোনি ভোর?
হৃদয় জাগানো পরশমণির সন্ধানেই
তাইতো অলস দুপুর যাপনে
শঙ্কা নেই।
স্বপ্ন-সাগরে দিয়েছি নিজেকে
বিসর্জন
বলাকা, তোমার গ্রন্থি হবে না উন্মোচন?

ঈগল পাখি ঝড়েতে উৎসুক।
আসুক ঝড় তবুও আমি ঋজু ॥

অন্ধকারে নগ্ন করো তনু
সমুদ্রের মুকুরে দেখো মুখ
হঠাৎ যদি মত্ত তোলপাড়ে
অজানা কোনো কাঁপনে কাঁপে বুক
আমাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ।
যদিও ঝড়ে ঈগল উৎসুক
আসুক ঝড় তবুও আমি ঋজু
সমুদ্রের মুকুরে দেখো মুখ!

তিন

রাত্রি, বৃষ্টির মত্ত বৈশাখে চন্দ্রাতপ
স্বপ্ন মনে হয়— স্বপ্ন মনে হয় অরণ্য
নিবিড় বাসনার রূপান্তর বুঝি কলাপিনী।
নিবিড় কুন্তল ছড়ানো, মুখখানি বিস্মৃত—
মাটিতে চোখ ঢেকে ক্লান্ত দিবসের বিরহিণী
করুণ কান্নায় অমন করে কেন বুক ভাঙো!

আকাশে লাখো হাত তুলেছে বৈশাখে অরণ্য
স্বপ্ন মনে হয়, স্বপ্ন মনে হয় অরণ্য।
তোমাকে বিরহিণী একদা মনে হত অরণ্য।

চার

তোমার মহিমা জীবনের মতো মনোলোভা
অয়ি মায়াবিনী ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা
আমার বিশাল জীবন সাজাও প্রতীক্ষায়
অয়ি বিরহিণী ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা।

রবীন্দ্রনাথের তেইশ বছরের শোক

স্পষ্ট দেখা যায় সেই দীর্ঘকায় উজ্জ্বল যুবাকে
ঝকঝকে চোখের রঙ— যাকে দেখে দেবমূর্তি মনে হয়েছিল
নবীন সেনের। পশ্চিমের বারান্দায় স্পষ্ট দেখা যায়
স্তব্ধ তেইশ বছরের সুকুমার ভঙ্গিটির ছবি।
সদর, প্রাঙ্গণ কিংবা সামনের পথের দৃশ্য, মানুষ—
জীবন স্মৃতির কটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে, হে পাঠক, কল্পনার সঙ্গে জুড়ে নিন।

—আমার চোখের জল শিউলি ফুলের মতো ঝরে গেছে আজ ভোরবেলা
কৈশোরে একটি মালা তুমি দিয়েছিলে, তার ফুলগুলি আজ
তোমাকে দিলাম, শুভ্র, চোখের জলের মতো পবিত্র, অম্লান।
কাল সারারাত ভরে রাশি রাশি জোনাকির উৎসব দেখেছি
পথভ্রষ্ট এক বনে,— মনে হল যেন আমি নীল অন্ধকারে
একটি নীলরঙা পাখি খুঁজতে বেরিয়েছি, যে আমার নাম ধরে
একদিন ঘুম ভাঙবার আগে ডেকে উঠেছিল। হে সখি, বিচ্ছেদ,
বলে দাও কার নাম ভালবাসা, মনে পড়ে একটি পতঙ্গের
ডানা ছিঁড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে ছিলাম, একদিন নিতান্ত শৈশবে,
বহুদিন পর এক সন্ধেবেলা সেই কথা মনে ভেবে সহসা দুঃখের
প্লাবনে ডুবেছি আমি। কে সেই দুঃখের দূতী। তুমি নও, তুমি, ভালবাসা?
পদ্মায় অনেক ছবি দেখেছি, প্রবাসে নীলিমায়
সুন্দরের স্তব্ধ গান, একদিন কোন মন্ত্রবলে
বৃক্ষের ভাষায় আমি বৃক্ষদের সাথে কথা বলতে শিখলাম।
কে শেখাল, ভালবাসা, তুমি ভালবাসা?
আমার চেয়েও তুমি মৃত্যুকে অধিক ভালবেসে কূল ছেড়ে
দেশান্তরে, কালান্তরে চলে গেলে, অথবা নতুন খেলা ভেবে
নিজের হৃদয় জ্বেলে, চন্দন কাষ্ঠের মতো শরীর পুড়িয়ে
মায়াবি দুঃখের সাজে আমাকে সাজালে, সর্ব অঙ্গে, চোখে, মুখে
হাতের নখের কোণে, ভুরুতে, কপালে ঠিক জোনাকির মতো
শীতল আগুন এঁকে দিলে।
এখন আমাকে ঘিরে কে রয়েছে, তুমি নও, মনে হয় অন্য একজন
আমি তার স্পর্শ পাই, আমি তার স্বরূপ জানি না।

—আমি শোক, চিনতে পারোনি, আমি যৌবনের প্রথম প্রহরী,
তোমার হৃদয় আমি মুচড়ে ভেঙে টেনে আনব নির্বাসিত দ্বিতীয় যুবাকে

তোমার অযুত মূর্তি চতুর্দিকে, চেয়ে দেখ, উদ্ভাসিত চোখে
মহর্ষি আকাশ তাঁর দক্ষিণ হস্তের বরাভয়
তোমার সম্মুখ দিকে রেখেছেন; দেখ এই বাতাসের স্রোত
কত প্রিয় শব্দ কত প্রিয় গন্ধ নিয়ে যায়, কুহকী সময়
কালো ওড়না ঢাকা দেয় চকিতে প্রেমের শুভ্র মুখে।
আমি শোক, ব্যাধের শবের মতো শোক—
আত্মশুদ্ধ, মহৎ দস্যুর মতো তোমাকেও পোড়াব তীব্র দাহে,
যেন সেই যন্ত্রণার স্রোত, একদিন নানা বর্ণে উৎসারিত হয়, যেন
প্রতিদিন ভালবাসা এবং আমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে
তুমি সব ভুলে থাক, সুখ, শান্তি, সচ্ছলতা তৃপ্তির আসব।

সমর সেন

তখন লক্ষ লক্ষ তলোয়ারের মতো রোদ
ঝলসাত কলকাতার আকাশে। যে সমস্ত সৈনিক
পুরুষেরা পানিপথ, হলদিঘাট, ফতেপুর সিক্রির ধুলোয়
স্বেদ আর শোণিত ঝরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাদের
হাতিয়ারের ধারে জ্বলত কলকাতার রোদ উনিশশো
চল্লিশে। পার্কের ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকত সমর সেন।
স্পষ্ট দেখা যায় সেই কিশোর-প্রতিম যুবাকে।
হরিদ্রা-বর্ণের চামড়ার নীচে হাজার বছরের পুরোনো মদের
মতো তীব্র ঝাঁঝালো রক্তস্রোত, হঠাৎ মনে হত একখণ্ড
বাঁকা রোদ হয়তো শুয়ে আছে, স্পষ্ট
দেখা যায় সেই কিশোর-প্রতিম যুবাকে।

কৃপণের মতো সংশয়ী বিশ্বাসে জীবন খুঁটে খুঁটে আনতে পথ চলতি
হাজার মানুষের মধ্য থেকে। তারা কেউ
মানুষ নয়, এক একটি শব্দ, দৃশ্য, এক
একটি কবিতার লাইন যারা আগে কখনও আসেনি
এই রাস্তায়, হাঁটেনি আমাদের অনুভূতির জগতে। ছন্দ
ছুড়ে দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের দিকে। তখন ভাবিনি

তুমি নিজেই কোনওদিন
সত্যেন দত্তের মতো নির্ভেজাল মাত্রাবৃত্ত কিংবা ত্রিপদী হয়ে যাবে!

হাতের বাঁকা অক্ষরগুলো সোজা হবার আগেই তুমি
মাতামহের উদাত্ত নিশ্চিন্ততায় প্রত্যহ
আড়াই বোতল আসক্তি পান করে আঙুলের
ডগাগুলো পর্যন্ত ভোঁতা করে ফেললে।
এখন জানুয়ারির শীতে রাশিয়ায় তুষার-ভল্লুকীর পেটের
কাছের উষ্ণতার জন্য ঘুরছ লোভী শৃগালের মতো।
চক্‌চক্ করছে মাথার চুল আর পায়ের জুতোর পালিশ—
ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রপ্ত হয়েছে সেই পর-ভাষা, সুতরাং
সান্ধ্য নিমন্ত্রণে রমণীদের অন্তঃস্থলে ভোঁতা আঙুল বসাবার
আপ্রাণ চেষ্টাই বা মন্দ কী।

এদিকে কলকাতার শো-কেসে তোমার মরা মুখ দেখে প্রত্যহ
আড়চোখে তোমার সহযাত্রীরা। আর কুকুরের লেজের মতো
কুণ্ডলী পাকিয়ে য়ুনিভারসিটির লনে বালক-বালিকারা
কখনও কখনও উচ্ছিষ্ট স্তোক স্তুতি উচ্চারণ করে।

কিছুক্ষণ

যেমন স্বপ্নের মধ্যে তীব্র নীলাকাশ
সময়ের মধ্যে এক সময়হীনতা
যেমন দৃষ্টির মধ্যে দৃশ্য, কিংবা দৃশ্যেরও জন্মের
অন্তরালে চিরন্তন যেমন অমোঘ রহস্যের স্থির রস
মুখোমুখি সৃষ্টি ও পাতাল পরস্পর মুখ দেখে যেমন কৌতুকে
যেমন নিজেরই রক্ত থ্যাঁতলানো মশার পেটে দেখে ঘৃণা হয়
আমি ঠিক সেই রকম এক অনিবার্যতায় পঁচিশ বছরে
ভিজে ঘাসে মুখ ঢেকে শুয়ে আছি পঁচিশ বছরে
কিছু চুরি-করা রত্ন নিপুণ গোপন করে পঁচিশ বছরে
স্বপ্নে লোভে বিপরীত তৃপ্তিতে ঘৃণায় শুয়ে আছি
সময়ের মধ্যে এক সময়হীনতা হাতে নিয়ে।

স্মৃতির অঙ্গার মেখে কে যায় ও গহন সন্ন্যাসী?
মেঘদল ক্ষণে ক্ষণে মত্ত হয় নীলিমা আহারে;
এ-বৎসর কোনো ঋতুভেদ নেই, আজ মনে হয়
বাতাস এ-বৎসর দিক বদলাবে না
শতাব্দীর গ্রীবা মুচড়ে ধরেছে কে নির্লিপ্ত-নিষ্ঠুর?
এ-বৎসর মৌমাছিরা পান করবে শিশিরের জল।

ঘাসের ছায়ায় একটি পিঁপড়ে শুয়ে আছে
দলছাড়া, গতিহীন, এমন নির্জন পিঁপড়ে এর আগে কখনও দেখিনি
রোদ্দুরে অপরিচ্ছন্ন চোখেমুখে বিপুলা পৃথিবী ঘুরে আসি বহুবার
সব দিকে অস্পষ্টতা, আলজিরিয়া, লেবানন, ভারতের কনিষ্ঠ প্রদেশে
সব দিকে অস্পষ্টতা, লুকানো ছুরির ফলা, অস্থির বিশ্বাস, আমি
ঘুরে ঘুরে দেখি,
ঘাসের ডগার নীচে যে বিশুদ্ধ ছায়া
সেখানে শয়ান এই নির্জন পিঁপড়ের মতো আর দৃশ্য নেই।
অনেক বসন্ত ঋতু সমুদ্রের গর্ভের ভিতর
মৃত প্রবালের স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে
আমিও রক্তের মধ্যে অনেক তরঙ্গ, প্রেম, সমুদ্র বিস্তার
গেঁথেছি, তবুও আজ কোনো মায়াদ্বীপ—আমার সম্মুখে নেই...
মায়াদ্বীপ নেই, বিধৃত যৌবনে কোনো মায়াদ্বীপ নেই,
এই কথা ভেবে আমি পৃথিবীর জ্যেষ্ঠতম ভয়ে
চাপা, আর্ত শব্দ করে বহুবার ছুটে গেছি কোনো এক পাখির কাছে
জানুতে লুকিয়ে মুখ, ওষ্ঠ চেপে অরুণ যোনিতে
দুরন্ত পশুর মতো অজ্ঞাত বোধের স্পর্শে কেঁপে
আত্মার আগম পথে অস্ফুটে বলেছি
চলো মায়াদ্বীপে যাই, একবার মায়দ্বীপে, চলো
এখনি দু'জনে যাই, স্বপ্নের কৃতার্থে যাই, মায়াদ্বীপে, মায়া...

—জানি, একে পলায়নবাদ বলে, যুবাদের বড় প্রিয় পেশা,
এই কথা বলে সেই রমণীটি আমাকে সম্মুখে তুলে ধরে
তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষে হলুদ রুমাল বেঁধে দেয়
আমি তার রূপ দেখি, বিদ্যুল্লেখার মতো রূপ—
আকাশ অদ্ভুত বর্ণ, একটি হলুদ চিল ঘুরে ঘুরে ডাকে।
ভিজে ঘাসে মুখ ঢেকে আজ আমি শুয়ে আছি পঁচিশ বছরে,
পঁচিশ বছর তার অন্তঃস্থিত সময়হীনতা

নিরন্ত স্রোতের নীচে চিরকাল শান্ত নীল জলের মতন
অকস্মাৎ মেলে ধরে; সব কিছু স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে জেনে আমি
স্বপ্নে, লোভে, বিপরীত তৃপ্তিতে ঘৃণায় শুয়ে আছি,
মুষ্ঠিতে লুকিয়ে রেখে দুর্লভ শিল্পের পরমায়ু।

আমি কি শিল্পের জন্যে প্রাণ দেব? তবে তো শিল্পের বরতনু
কত পূর্ব-শহিদের রক্ত মেখে বীভৎস, নিষ্ঠুর!
বাণীর মন্দিরে পূজা দিতে এসে যূপকাষ্ঠ কে চায় সাজাতে
কোন মূর্খ অভিমানে, পিপাসায় ধর্না দিয়ে আছে?
কিটসের অমর মৃত্যু লেগে আছে সন্ধ্যার আকাশে।

সহসা বাতাস এসে দেবদারু বৃক্ষটির প্রত্যেকটি পাতায়
কিছু শিহরন রেখে গেল।
একটি আঁধার জাল এখনি আকাশ থেকে রাতচরা পাখিগুলি
সব নিয়ে যাবে।
আকাশ স্বপ্নের মতো তীব্র নীল এ-প্রদোষকালে।

এবার আমিও যাব, দেখা হবে সাতটা পঁচিশে
গাড়ি বারান্দার নীচে, প্রতীক্ষায় আছে সেই নিরবধি নারী
সুপ্ত পূর্বস্মৃতি খুলে শরীরে উত্তাপ এনে নেব
দেশ-কাল-শিল্পবোধ আমাদের কিছুদূর পৌঁছে দিয়ে যাবে
ঈশ্বর নৌকোর হাল হাতে নেবে নরকের খেয়াপার ঘাটে।

—তোমার কপালে কিছু ধুলো লেগে আছে, বলে মেয়েটি একবার
আঁচলের প্রান্ত দিয়ে আমার ললাট মুছে দেবে।

আবর্তন

শোনো, শোনো, বলি, ম্লান সন্ধ্যায় এ কোন মায়ায় তুমি
দিনের তুচ্ছ হাওয়ায় মাতালে নীলাস্ত বনভূমি
অথচ তুমিই অনিবার, তুমি তীব্র কৌতূহলে
আকাশ ব্যাপ্ত নীল অরণ্য জ্বালিয়েছ দাবানলে।

দিন ভরা শুধু ছায়ার কাকলি, গত রাত্রির ঘুমে
তোমাকে করেছি নিঃশেষ আমি ভীরু শীত মরশুমে।
তোমার হৃদয়ে কান পেতে শুনি অন্ধকারের স্বর
তোমার আগুনে আমার শরীর মাধুর্যে ভাস্বর।

এ কোন উজ্জীবনের মন্ত্রে আবার আজকে তুমি
আপন রূপের বিভাসে মাতালে বিষণ্ণ বনভূমি।
কী দেবে আমাকে এবার আবার, সৌরভ সত্তার?
মুঠো খুলে শুধু উপহার দিলে একটু অন্ধকার।

অন্য দেশ

হিরণ্ময়, আমরা কাল অন্য এক দেশে চলে যাব
বিবর্ণ ধূসর চোখে তুমি শুধু থাকবে হিরণ্ময়
কয়েকটি যুবক-দস্যু আমরা কাল লাল রক্তে আকাশ ভেজাব
জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পোড়াব দিগন্ত আর রাত্রির আশ্রয়!

এক জীবন নিতান্তই ওষ্ঠ উল্টে যাব পার হয়ে
ধুলো উড়বে অশ্বক্ষুরে, ধুলো, ধুলো—পৌরাণিক বিহঙ্গের মতো
ডানায় সূর্যকে ঢাকবে,—সন্ধ্যা এক বারাঙ্গনা কেঁপে উঠবে ভয়ে
অলঙ্কার ছুড়ে ফেলবে মন্দির-চূড়োয় কিংবা জলে ইতস্তত।

তুমিও আমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে এস, হিরণ্ময়,
কী হবে এখানে এই বিবর্ণ, বিস্বাদ, দীর্ঘ দিনে
স্বেদ থেকে সোনা করছ, চোখের জ্যোতিতে তবু কীসের সংশয়
নগরীতে কত লোক আজও কত ক্রীতদাস
নিয়ে যায় নানা দামে কিনে।

তুমি যার কৃপা চাও সে তোমার পৌরুষ-প্রত্যাশী
উঠে এস, হিরণ্ময়, অভিমান-অন্ধ-কূপমণ্ডূকতা থেকে
আমরা সবাই জেনো, মূঢ়তার ছদ্মবেশী-মূর্তি ভালবাসি

সবাই অচেনা থাকি, চিরকাল, তাই ভ্রান্ত নিজ মুখ দেখে।
কাল আমরা চলে যাব আদিম দস্যুর সাজে অন্য এক দেশে
কোন দেশে? যারা জানত তাদের রক্তের স্রোত দেখ ওই
গোধূলিতে মেশে।

স্বপ্নে দেখা জীবন

রূপসী রতির ওষ্ঠে, চক্ষে, ভ্রূ-বিলাসে
পদতলে
কতদিন, কতকাল আমি শুয়ে আছি;
কপিশ রাত্রির চোখ রক্তাক্ত দেহের স্বাদ বড় ভালবাসে
রক্ত জ্বলে
সিংহের মতন ঘোরে অন্ধকার হিংস্র কৌতূহলে।

বিপুল শ্রোণীর ভারে, স্তনের উদ্যত গর্বে, মুক্ত মেখলায়
ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকে দুর্লভ দণ্ডায়মান এই মূর্তিখানি
চিরকাল
আমাকে পায়ের নীচে রেখে হাসে, কুন্তল দোলায়;
খড়্গের মতন জঙ্ঘা, চন্দ্রের মতন ওই নাভি, আমি জানি
নিমেষেই ছিঁড়ে ফেলবে রহস্যের সব অন্তরাল,
মুছে দেবে অন্য সব দৃশ্য, শোভা, আকাশের শান্ত নীল বাণী।

সব গ্রন্থ শেষ হলে, পুরানো গ্রন্থেরই মতো নিসর্গের স্বাদ
যুবক-জিহ্বায় লাগে বড় নষ্ট, বড়ই ধূসর;
মানুষের দিকে ফিরলে চোখে পড়ে মানুষেরই ধ্রুব-পরমাদ!
আত্মার কান্নার মতো দণ্ড-পল-মুহূর্তের শর
চকিত-বিদ্যুৎ সম বুকে বেঁধে, আমি ঘুরে ঢলে পড়ি
সেই পদতলে
সিংহের মতন এসে অন্ধকার শুঁকে যায় হিংস্র কৌতূহলে।

পৃথিবীর শেষতম নির্জনতা মনে হয় রমণী শরীরে

আমি তার স্তন্য, স্বেদ, অশ্রু পান করি,
চক্ষু ঘিরে
লক্ষ লক্ষ ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায়, স্বপ্নে দেখা সমুদ্রের তীরে।

তোমার ঘুমের পাশে

তোমার ঘুমের পাশে আমার বিমূর্ত জাগরণ বসে থাকে
তোমার উড়ন্ত চুলে মিশে যায় আমার নিশ্বাস—
হাওয়া নেই, তবু কেন শব্দ আসে, চরাচর নিমেষে কাঁপিয়ে
বিমানের গুরু ধাবমান
শব্দ অকস্মাৎ এসে আমাকে শরীর দেয়—
তোমার ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরা বদলে দেয় রূপের আকার
সব কিছু বড় বেশি মোহময় মনে হয়
তোমার নিদ্রার সঙ্গে আমার বিমূর্ত জাগরণ খেলা করে।

ঝুপসি বটের মাথা ছাড়িয়ে, প্রান্তরময় গ্রাম বাংলায় সুপ্ত
নিশীথিনী অন্তরীক্ষ জুড়ে
বিমানের ধাতু-শব্দ, ঝিল্লি ঐকতায় আর নদীর তরঙ্গে
তার ছায়া
পূর্ব গোলার্ধের যাত্রী সঙ্গিনীর কাঁধে রাখে ঘুমমাখা হাত
স্তনের বোঁটায় ঠিক তিনটি বা চারটে ফোঁটা ঘাম
ক্রয় ক্ষমতার মতো সময়ের তাপ কমে আসে—
আবহাওয়া মুরগি যেন দিকবদলের জন্য ছটফটায়
গির্জার চূড়োয়
তোমার শরীরখানি আর একবার পাশ ফেরে, কপালের চূর্ণ চুলে
আমার নিশ্বাস
স্বপ্নে কাঁপে ঠোঁট—

আমি জানি
তোমার স্বপ্নের সেই বিমানের আরোহিনী,
গ্রাম বাংলার বুক ছেড়ে উড়ে যায়
আমি জানি, তোমার ঘুমের পাশে আমার বিমূর্ত জাগরণ
স্বপ্নকেও দেখতে পায়।

বৃক্ষ-বন্দনা

যে বৃক্ষের সব পুষ্প স্বচ্ছ, চিরলোহিত, উজ্জ্বল,
যে বৃক্ষের পত্ররাজি ঈশ্বরের ইশারায় কাঁপে,
আমার সমস্ত ধ্যান জুড়ে আছে সেই বৃক্ষতল
আমার আত্মার রক্ত ঝরে পড়ে সুস্বাস্থ্য উত্তাপে

সহজ, সহসা-দৃষ্ট সেই মায়াতরুর শিকড়ে;
উত্তর আকাশ থেকে মধ্যযামে তীব্র এক দ্যুতি
কত মুখচ্ছবি, প্রেম, নির্জনতা উদ্ভাসিত করে;—
একদা রূপের তৃষ্ণা, বাসনার করেছি যে স্তুতি

পাপের উল্লাস, দৃপ্ত, কলঙ্কিত জীবনের লোভ
সব কিছু শেষাবধি স্বপ্নের গৌরব সাক্ষ্য রাখে,
আমার মৃত্যুর পর আমার এ বুকের বিক্ষোভ
যেন এই কল্পবৃক্ষে চিরকাল বিদ্যমান থাকে।

লোভ এবং নির্জনতা

অন্ধকারে ঝলসে ওঠে হিরের ছুরির মতো লোভ
রূপসী স্মৃতির মূর্তি অদৃশ্যে ডেকেছে স্নিগ্ধ স্বরে
হে অভিজ্ঞ দুঃখ, এসো, শান্ত করো বুকের বিক্ষোভ
মুগ্ধা ডাকিনীর গান ভেসে আসে সমুদ্রের থেকে
এই ভাঙা ছোট ঘরে

হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ, তবু লোভ,—তবু লোভ দুঃসাহসী
ইঁদুরের মতো
ঠুকরে খায় দুই চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, রক্তে লাগে লবণ বাতাস
পৃথিবীর সব যুবকের স্বপ্ন মনে হয়, নিশ্চিত বুকের অন্তর্গত-
অন্ধকারে ফুটে ওঠা হলুদ রঙের দীর্ঘশ্বাস।

সারা রাত খণ্ড, লঘু বাতাসেরা খেলা করে আমার শিয়রে
বিস্মৃতি চাই না আমি ঘৃণা করি সময়ের সামরিক সাজ
যদিও অনেক দিন নির্বাসিত আছি আমি অন্তর গহ্বরে
জানি, যাকে আয়ু বলি, তার অন্য এক রূপ বিপক্ষের
দক্ষ তীরন্দাজ।

রমণীরা গূঢ় হাসে, কৃত্রিম ঝরনার শব্দে তাদের মত্ততা
পাখির নখের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তারা সব সুখ বিঁধে রাখে
আমি লোভে ছিন্ন ভিন্ন—তবু যেন দৃষ্টির অতীত নির্জনতা
নিশি বিহঙ্গের মতো দূর থেকে ডাক দেয় আমার আত্মাকে।

জেগে আছ?

হাওয়া এসে ডেকে বলে, নিশীথ কুসুম, জেগে আছ?
ঘুঁটে কুড়ুনির আত্মা নিবন্ত চুল্লির কাছে প্রশ্ন করে, জেগে আছ?
নদীর এপারে গাছ ওপারের শকুনিকে বলে, জেগে আছ?
তরাই জঙ্গল থেকে কেরালায় ধ্বনি যায়, জেগে আছ?
ত্রিস্তান, ত্রিস্তান, আমি সোনালি ইসল্ট, তুমি জেগে আছ?
ব্যাকুল কৈশোর থেকে মধ্যজীবনের দিকে হাহাকার ভেসে আসে,
জেগে আছ?
জানলার ঝিল্লিতে স্বপ্ন থমকে থেকে ডাকে, জেগে আছ?
ঘুমন্ত স্তনের পাশে ভেজা ঠোঁট ফিসফিসোয়, জেগে আছ?
ভূমধ্যসাগর থেকে তারবার্তা ছুটে যায়, জেগে আছ?
প্রতিটি ব্যর্থতা তার নিজস্ব প্রস্থান-পথে বলে যায়, জেগে আছ?

রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা

ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ চেয়ে দেখি প্রজাপুঞ্জ সহ এই সম্রাট আকাশ
অলীক মূর্তির মতো কয়েকটি মনুষ্য বিন্দু ঘুরছে ফিরছে প্লাটফর্মে, লাইনের উপরে
আমার বন্ধুটি পাশে সিগারেট ঠোঁটে চেপে ছুটি-শেষ-করা এক ঘন দীর্ঘশ্বাস
ধোঁয়ায় মিশিয়ে ছুড়ল আমার চোখের দিকে, রামগড়ে, বাতাসের প্রতি স্তরে স্তরে।

কলকাতায় ফিরে যাবে সহস্র সুতোয় বাঁধা কীর্তিমান সুদর্শন ছিম-ছাম যুবক
ট্যাক্সিতে সময় মাপবে, অনেক সন্ধ্যাকে খুন করবে নানা রেস্তোরাঁয়, এরোড্রামে,
ভিড়ে
শনিবার তাস খেলবে, ঘরভরা অট্টহাসে টেনে নেবে বন্ধুদের চোখের চুম্বক
সুখের নানান সুর এঁকে রাখবে ওষ্ঠে, চোখে, দ্যুতিমগ্ন যৌবনের বুক চিরে চিরে।

এখন সে অকস্মাৎ চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-প্রতিম এই সায়াহ্নের দিকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ আমাকে বলল কেঁপে উঠে যেন এক অন্য কণ্ঠস্বরে
'আশ্চর্য, আশ্চর্য, দেখ!' সবলে আমার হাত ধরে রেখে চেয়ে রইল, তীব্র নির্নিমিখে
অশ্রুর বিন্দুর মতো শীতের করুণ রৌদ্র তখন বিরলে ঝরছে পর্বত শিখরে।

গ্রিসীয় মূর্তির মতো রূপবান, বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-অগ্রাহ্য-করা আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, পটভূমিকার পাশে মূঢ়, অসহায়
সংগীতে দেখেছি আমি।—'সুনন্দ, ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?' তৎক্ষণাৎ আমি তার
বুকে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু হেসে, চৈতন্য এনেছি সেই মায়াবি সন্ধ্যায়।

মৃত্যু

কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি, কখনো মানুষ নই, তবুও সন্ধ্যায়
ব্রিজের অনেক নীচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ...
ব্রিজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা, পরস্পর মুখ;
মানুষ দেখেছে জল বহুদিন, মানুষ দেখেছে অশ্রুজল

মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা ব্রিজের অনেক নীচে হিম কালো জলে
কালো জল বহু ঊর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো
আসমুদ্র দয়াপ্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন-মানবীয়।

জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলঙ্ঘ শরীর
মাতৃগর্ভবাস যেন অগোপন, অথবা না হোক একা, বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে, একটিবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর ঊরুর জোড়, খোলা স্তন কী রকম আশ্চর্য সরল...
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো, সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যেরকম মানুষের হাত
জলের ভিতর গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়, জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন, বাতাসের মতো জল পরাগ ছড়ায়।

কখনও মানুষ সেজে বিয়ার-বাস্কেট নিয়ে বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়...
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফসফরাস, দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসো
এমন উজ্জ্বল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ!

মানুষের ছদ্মবেশে আছি তাই চোখে আসে অশ্রু,
মুখ ঢাকি!

উৎপাত উপলক্ষে গদ্য রচনা

ভেবেছিলাম কোনোদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব না
মরে যাব এই ভেবে নয়
মানুষকে মারতে হবে এই ভেবে—
একটা পিঁপড়েকে মারার পাপস্খালন একজীবনে হয় না।
আমার দিকে কেন বন্দুক তুলেছিল বেল্লিক?

কতদিন পর এই হিমালয়ের স্তব্ধতাকে হত্যা?
তীব্র ভালোবাসা বড় তীব্রতম ঘৃণা হতে পারে।
আমি ভালোবাসায় দীর্ঘ হতে চেয়েছিলাম
আমি ভালোবাসা চেয়েছিলাম স্ত্রীলোকের, বালকের,
জননীর, অচেনা মানুষের;
চেয়েছিলাম ন্যাশপাতির, জ্যোৎস্নার, নিস্তব্ধতার—
জানি না মানুষ মেরে কার জন্য কিসে সাম্যবাদ।

জীবনে প্রথমবার প্লেনে চেপে সীমান্তের দিকে চলে যাবো
এ শীতে দাঁতের বাজনা থেমে যাবে কামানে রাইফেলে
লোভী, পীত সিঁধেলের মাথায় চালাব রাগী বুলেট
রক্ত, ঘিলু, থ্যাঁতা মাংস ছিটকে পড়বে পাহাড়ের ওপারে
উল্লাসে হো-হো করে বাড়ি ফিরে বলব:
জয়ী আমি আজ।
আমার বুক থেকে ভালোবাসা মুছে এমন ভয়ংকর ক্রোধ
জাগিয়ে তোলার জন্য, অতীতের কবিতা ছবির দেশ চিন,
তোমাকে আবার কবে ক্ষমা করতে পারব জানি না।

চরিত্রের অভিধান

ভূতগ্রস্ত

ডাক্তার জ্যোতিষ মতে অশ্লেষা মঘায় চাপে গাড়ি
বসন্তের টিকা নেয় বশংবদ শীতলা পূজারী
আদার ব্যবসা ফেঁদে কলিমুদ্দি শেখ বানিয়েছে
জাহাজ মার্কা এক বাড়ি
অন্ধকারে চোখ ঢেকে শেষে আমরাও
দিনের বেলার ভূত হয়ে যেতে পারি।

কুমারী

চুম্বনের বাসনা নিয়ে প্রতিক্ষণ ঘোরে
সকলে ওরা স্বপ্নে বেঁচে আছে,
এমন লঘু দু' পায়ে ওরা কোথায় যায়
কোন স্রোতের তোড়ে
কোন পাহাড়ে, কোন মেঘের কাছে!
প্রতি মুখের উজ্জ্বলতায়, অভিমানিনী স্তনে
স্পর্শ পাবার তীব্র দুঃখ, গোপন লজ্জা,
স্বপ্নে ভরে নেবে
প্রতিটি নিশ্বাস, কান্না, সুখের স্বাদ;
স্বচ্ছ চোখে, মনে
সময় ওদের চিরস্থায়ী চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দেবে।

প্রেমিক

চোখে চোখ রাখো, বাহুতে শয়ান বাহু
ধমনী শোনায় দুই হৃৎস্পন্দন
মুখচন্দ্রিমা গ্রাসে ওষ্ঠের রাহু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়;
স্মৃতি যেন পায় রক্তবীজের আয়ু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়।

প্রতিপক্ষ

রোদ্দুরে বৃষ্টির স্বাদ ওই লোকটা বেশি পেয়েছিল,
ওই লোকটা বুক ভরে আজীবন নিশ্বাস নিয়েছে
পবিত্র ঘুমের স্বাদ, সমস্ত স্বপ্নের স্বর্গ, স্বচ্ছ জীবনের
সব উপভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে
একলা ওই লোকটা গেল বেঁচে।

বারাঙ্গনা

ঘুমোবার আগে রোজ হৃৎপিণ্ড ধুয়ে মুছে
যত্নে তুলে রেখো
গোপন সিন্দুকে
এবং চাবির গোছা ছুড়ে দিও স্বর্গের দরজায়।

লেখক

অত্যন্ত কুটিল চোখ, বক্র নখে চিরে দেয় জীবনের পবিত্র স্বরূপ
যুগপৎ সাধু ও ঠক, অহংকারী, ঋদ্ধিমান, কভু কাপুরুষ
অবিরাম স্মৃতিক্ষয়ে ক্ষীণজীবী, দুর্গন্ধ দূষিত জলাশয়ে
দপ করে জ্বলে ওঠা আলেয়ার মতো ঠিক ওদের হৃদয়।

কোটিতে কয়েকটি মাত্র এই আত্মা, এক দেশে এক শতাব্দীতে।
বাকি সব ভাণমূর্তি, জনপ্রিয়, দুর্মূল্য কাগজে ঢালে কালি
অথবা খানিকটা দূর পৌঁছে গিয়ে দুরারোগ্য বেরিবেরি রোগে
পা দুখানা ভারী করে স্থির হয়, নতুবা নিজেরই গলা কাটে
ওদের লেখার মধ্যে সপ্-সপ্ ঝোল-টানার শব্দ শোনা যায়।

বন্ধু

দু'জনেই একমত হলে—রক্তে তীক্ষ্ণ হুল ফোটে
যেন কোনো ভয়ংকর খাদের কিনারে এসে
প্রতিযোগিতায় হাঁটা হয়;
কেউ কারো বিপদে, শোকে, অনটনে হৃদয় পোড়াবে
এর নামও সৌহার্দ্য বা সখ্য ঠিক নয়,
মানুষের জন্য এ তো মানুষের সামান্য পদবি!
অস্তিত্বে উত্তাপ দিও, কিন্তু কারও আত্মা ছুঁয়ে
উচ্ছিষ্ট করো না।

আত্মঘাতী

সমস্ত দরজা খোলা, এ পৃথিবী মুক্ত অবারিত
বার বার ঝাপটা মারে নীল শূন্য, স্বপ্নের দেবতা
স্থানু বৃক্ষদল যেন আশীর্বাদ-ভঙ্গিতে ধ্বনিত
রাত্রি আনে গাঢ় শস্য, শুদ্ধ নীরবতা।
এ পৃথিবী যেন বড় বেশি আছে, অপর্যাপ্ত,
বড় ক্লান্তিকর—
এই কথা ভেবে কেউ, আত্মাকে মুষ্টিতে ধরে
হতে চায় নিজের ঈশ্বর।

রাজনৈতিক

ওদের সবার জন্য একটি পৃথক ভূমি খুঁজে দিতে হবে
বাচাল বুড়োর দল ছেলেখেলা নিয়ে মত্ত
থাকবে সেইখানে।
সব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আণবিক, অতি দানবিক
ক্রেমলিন-লন্ডন-রোম-পিকিং-প্যারিস-সাদাবাড়ি
ওই যে অদ্ভুত মুখ, উত্তেজিত ক্ষীণমুষ্টি চোখ সারি সারি
ওরা নিজেদের জন্য তিন হাত মাটি খুঁড়ে নিক।

হীনম্মন্য

বুকের পাঁজর খুলে দয়িতাকে দিলে
এ পৃথিবী বলবে, লোকটা কী নির্বোধ দেখ—
মানুষের হাড় পাঁজরা ভেদ করে হানো দীপ্ত ছুরি
এ পৃথিবী বলবে, লোকটা কী নির্বোধ দেখ!

রূপসী

কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায় বা চক্ষের মণিতে
অথবা স্তন-কোরকে, উন্মুক্ত জঙ্ঘায়, ঠিক জানি না।

কে আছে হেন পুরুষ, এক শরীরের রূপ দেখে নিতে পারে
নিতান্ত এক-জীবনে, মর-চক্ষে?
কেউ পারে না জানি।

অসতী দর্পিতা হলে রূপ আসে, স্ফুরিত অধরে
ঝলসায় মিথ্যে প্রেম, মোহিনী ভ্রূভঙ্গে
লোভ রতি প্রবঞ্চনা নরকের আহ্বান ফোটালে
রমণীরা কিছুক্ষণ আকর্ষণযোগ্য হতে পারে।

পাপী

বাতাসে বিষণ্ণ চোখ, মুখ ভাসে হিম নীলিমায়
কেন প্রাকৃতিক দুঃখে মূঢ় আর্তনাদ?
মন্দিরে ঘণ্টা বাজাও। অস্থিতে মজ্জায়
কেন এত আবর্জনা? পূর্ণিমার চাঁদ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসে চামচিকে, তোমারও বিষাদ
যেন প্রতিমার মতো লাবণ্যের গোপন সজ্জায়
সাজায় বিশুদ্ধ শোক, এ জীবন ধারণের গূঢ় অপরাধ,
রক্তে অন্তর্গত পাপ, যেন প্রতি মুহূর্তকে স্বাগত জানায়।

সম্পাদক

ধীমান ও পরিশ্রমী, চোখে হয়তো গোল চশমা আঁটা
মুখে মাকড়সার জাল, ক্ষীণদেহ, অভিব্যক্তিহীন ওষ্ঠে বড় সদালাপী
সকলেরই প্রীতি কিংবা স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধার আস্পদ।

কেউ ঘন ঘন এসে বন্ধুত্ব ও প্রণয় জানাবে
কেউ নববর্ষে কিংবা বিজয়ায় পদধূলি শিরে নিয়ে যাবে
অথবা, 'আমার বিয়ে', 'ছেলেটার মুখে ভাত', 'জন্মদিনে', 'সাহিত্যসভায়'
'আপনি না হাজির থাকলে কিছুতেই সম্পন্ন হবে না।'

ঈষৎ প্রবীণ দল বলবেন, শোনো হে অমুক,
এ রচনা লেখামাত্র তোমাকেই পড়াতে এলাম
তুমি ছাড়া কে বা বুঝবে সাহিত্যের গূঢ় সমাচার,
একমাত্র, লেখার পর, তোমাকেই পড়িয়ে তৃপ্তি পাই।

মৃত্যুর দ্বিতীয় মাসে অনেকেই কিন্তু তার নাম ভুলে যাবে।

কলকাতা ১৯৬৬

বসিরহাট থেকে এসেছে ভানু মণ্ডল মানিকতলায়
সঙ্গে দুটি পুঁটুলি আর বেঁটে বউটি
বাচ্চা দুটো কোলে কাঁখালে, বউটি ঘোমটা খুলে তাকালে
দুপুরবেলার মানিকতলা হা হা শব্দে জ্বলে উঠল!

আমতা থেকে ছোট লাইনে পথ এল বাঁয়ে ডাইনে
দুই মেয়ে তার দুটোই সর্বনাশী
ভাতার পুত খেয়েও তাদের আশ মেটেনি পোড়ারমুখি
এখনও খিদে, পেটের মধ্যে চোখের মধ্যে অমন খিদে
খা না, আমার মাথা খা না! পদ্মর মুখ হাঁড়িপানা
কপালে দুই শিরা ফুলল, নাকের সিঁধে
হাওড়া ইস্টিশানে এসে থামল ট্রেনের হাজার চাকা
অমনি টিকিটবাবু এসে বলল, টাকা?
না পারিস তো নেহাৎ একটা আধুলি দে!

দমদম এয়ারপোর্টে নামলেন মি. কানিংহাম আর সুজি
ঝোপ কামিজ আর প্রজাপতি শার্ট, সুজির বুকে একটা নয়
তিনটে ক্যামেরা
ট্যাক্সি! হপ ইন! হিয়ার উই গো
আঃ, চমৎকার, তাই না? পাতার রং লাল নয় কিন্তু
শরতের আকাশ কি নীল?
দিস ইজ দা মোস্ট সিনফুল সিটি ইন দি ইস্ট অব আডেন
তা হোক, আকাশের কোনো পাপ নেই

আমরা আকাশ দিয়ে উড়ে এসেছি!
কোথাও বিপদ নেই, তবুও সাইরেন তার নিজস্ব চিন্তার মতো বেজে ওঠে
শনিবার ঘুম ভেঙে সংবাদপত্রের থেকে চোখ তুলে
সাইরেনের শব্দ শুনি
ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম নেই
শব্দ থেমে গেলে তবু শব্দ আছে
আমি ঠান্ডা চায়ে ফের ঠোঁট রেখে
চোখ রাখি পৃথিবীর সুখে ও অসুখে
মুখে কোনো রেখা নেই, কেননা মুখের কাছে অপর মুখের
কোনো ভাষা নেই...

বাধা

কথা বলতে এসো না, আমি থুতুর গন্ধ সইতে পারি না
কালো জিভ দিয়ে লাল নাকগুলো চেটে নাও
ভুরু বেঁকালেই মনে হয় পা ছড়িয়ে বসে আছ
আমি তোমাদের সমস্ত দরজা দেখতে পাই।
আমি একা বসেছিলাম তোমরা এলে তিনজন শাড়ি ও একটি স্কুল ফ্রক
ঠান্ডা গলায় মাত্র জিজ্ঞেস করলুম ভালো আছ? তোমরা
বললে পৃথিবীতে কেউ ভালো নেই আজ আর, কেন
যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা আর তোমরা—একথা আমি
বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু মনে পড়ল মনে পড়ল মনে পড়ল
মনে, আমি আমি আমি
গভীর অরণ্যের মধ্যে তোমাদের হাতের গুচ্ছ ধরে স্বর্গে
নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, আমি তোমাদের চোখের
জলে অনেক সকালবেলা মুখ প্রক্ষালন করেছি আমি
তোমাদের, তোমাদের, তোমাদের, তোমাদের, আমি
ঠান্ডা মাটির মধ্যে ছ'মাস ঘুমিয়ে ছিলাম
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্তব্ধতা চুপ করে ছিল
আমার ছায়া বহুমূল্যে বিক্রী হয়ে গেল, আমি অসংখ্য
উত্তর পেলাম। আমি আর
তোমাদের বাদ দিয়েও একা নই।

নির্বাসন

বারবার ভেঙে যায় নীল শঙ্খ, সমস্ত দৃশ্যের মূল বিভা
অন্তহীন ধ্বনি ওঠে তীব্র কণ্ঠে না না না না না না
না ক্ষোভ, না স্মৃতি, তৃপ্তি, না প্রেমের অমর প্রতিভা
বারবার মুছে যায় রক্তের ধারক এই শরীরের কৃতার্থ সীমানা।

কী বিদ্রোহে মত্ত আছি মন্ত্রজিহ্বসম নির্বিকার সিদ্ধ সাজে
আলো কিংবা অন্ধকার সমার্থক এক বর্ণে কেঁপে কেঁপে ওঠে
একটি সূর্যমুখী ফুল ঝরে গেলে লক্ষ বৎসরের দুঃখ বাজে
স্বয়ং সূর্যেরও ঘুম কখনও বা মুছে যায় অভিমান, মেঘের সংকটে।

আমার দুঃখেরা আজ দেবতার আসনে বসেছে, অমলিন
রৌদ্রের পার্থিব চিহ্ন কে তাদের মসৃণ ললাটে, ভ্রূ সন্ধিতে
এঁকে দিয়ে গেছে, আমি, শৃঙ্খল আবদ্ধ নতজানু, কীর্তিহীন
দণ্ডিতের মতো বসে আছি, কোনও অনির্দিষ্ট দূর রাজ্যে নির্বাসন দিতে

এসেছে প্রহরীবৃন্দ, কোথাও বাজে না ক্ষীণ প্রতিবাদধ্বনি
যেদিকে তাকাই শুধু ভ্রান্তি, প্রৌঢ়, হিম, ক্লান্তি, অমোঘ শূন্যতা
ধূলায় লুণ্ঠিত নেই আকুল মূর্ধ্বজা কোনও রোদসী রমণী
সন্ধ্যার করুণ রশ্মি নেমে আসে, যেন কাঁপে লক্ষ দ্রাক্ষালতা!

অবিশ্বাস, অতৃপ্তির, অপ্রেমের শুদ্ধ অন্ধকারে ডুবে থেকে
আমার বিদ্রোহী আত্মা জেগে উঠবে শিল্পের উজ্জ্বল অভিষেকে।

অতীত কিশোরী

কোথায় লুকাবে মুখ কোন নিঃস্ব হৃদয় গভীরে
কোথায় মেলাবে তুমি দৃষ্টিভ্রান্ত বিক্ষত হৃদয়
যতবার তুমি চাও মেঘ ভাঙা রৌদ্রের বিভাস
সন্ধ্যার সন্ধানী হাত খুঁজে আনে রাত্রির সংশয়

কত মৃদু মুহূর্তের প্রতীক্ষায় শান্ত সিন্ধু তীরে
ক্লান্তিহীন ঢেউ গোনা, তারপর ঘুমের বিষাদ
ছুঁয়ে গেছে তোমারই তো পদ্মচোখে শতদল সাধ
বাতাসে আভাস নেই, সময়ের বিষণ্ণ বাগান।

পৃথিবীর মুগ্ধ বাহু তুচ্ছ করে কঠিন স্পর্ধায়
আপন স্বরূপ তুমি চিনে নাও রূপসী পার্থিবা
সন্ধ্যার সন্ধানী হাত খুঁজে আনে রাত্রির সংশয়
অন্ধকার মুছে দিয়ে মুক্ত করো আলোর প্রতিভা
অথচ জানো না তুমি শরীরের মধুর দ্বিধায়
কী এক আশ্চর্য গানে অজানিতে হৃদয় মুখর
ছদ্মবেশে তবু ছিলে প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে নির্ভয়
জানো না কখন এসে ছুঁয়ে গেছে কঠিন সময় ॥

প্রতীক্ষার পর

প্রতীক্ষায় আয়ু বাড়ে, পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায়
জন্ম নিল বাংলাদেশ
তুমি চিরজীবী হও!
অশ্রু ও রক্তের কথা আমি জানি
প্রান্তরে নদীর ধারে পড়ে আছে সংখ্যাহীন
মানুষের হাড়
ভস্মীভূত গৃহ সারি, তাল গাছে সাক্ষী আছে
বুলেটের দাগ
পাখিরাও উদ্বাস্তু হয়েছে।
অশ্রুজলে ভেজা মাটি এখন উর্বর
রক্তপাতে লেখা হয়ে গেল
অমর দলিল
এই দেশ চিরজীবী হোক,
প্রতীক্ষায় আয়ু বাড়ে, পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায়
দেখেছি বাংলার মুখ—

এই ছবি কখনও মুছবে না
সর্ষে ও শুঁটির ক্ষেতে প্রাণবন্ত কোলাহল
নদীর ওপারে কেউ ডেকে ওঠে
প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে যায়
আমার জন্যও একটি ডাক আছে
হাত তুলে বলে উঠি, এই যে, এখানে—
তুমি যতদিন আছা, আমিও এদিকে আছি
তোমার ও রূপের পূজারী।

চলো যাই

সারাদিন রেডিয়োতে কান
মন প্রাণ জুড়ে আছে গোটা বাংলাদেশ
ইচ্ছে হয় আমিও যাই
পুরনো বন্ধুবান্ধবদের পাশে দাঁড়াই
সেই সব চেনা নদী-বিলের
আনাচে কানাচে
শত্রুকে যুযুৎসু মেরে
নিশ্বাস নিই স্বাধীন বাতাসে
যেখানে জন্মেছিলাম, এখন সেখানে
প্রাণ দিতেও পারি
চলো যাই...

সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে

সময় একবারই আসে
এবার সে ফিরে যাবে না
মানুষ মরছে, কোটি কোটি মানুষ
জেগে উঠছে বাংলাদেশে

ভিতু, জ্বরো রুগির মতন
শত্রুর মুখে এখন চিৎকার, প্রলাপ
কামান বন্দুককে উপহাস করে
এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তিসেনানী
মূর্খ জল্লাদ, এবার ভাগো!
জেগে উঠেছে বাংলাদেশ
সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে
আমরাও আছি
আমরাও ওদের পাশে দাঁড়াব
কিছুদিনের জন্য কলম ফেলে রেখে
তুলে নেব তলোয়ার—

বাদলা পোকা

মেয়েটি শয্যায় শুয়ে, পুরুষটি দরজায় দাঁড়ানো।

জানলায় নীল পর্দা, নীল আলো এক চক্ষু জ্বলে
একটি বাদলা পোকা আলোর চৌদিকে ঘোরে বিকারের ঘোরে
মেয়েটি শয্যায় শুয়ে, পুরুষটি দরজায় দাঁড়ানো।

আলোকে রমণী বলে, পোকাটাকে প্রেম নামে ডেকে
কবির পরম শান্তি, আকাশে বিশাল
যৌবনের দুর্নিবার স্পর্ধার নিশান আর ছন্দে মিলে বাঁধা
কাব্যের পরমা—ক্লান্তি, স্মৃতির শয্যায়।

মেয়েটি শয্যায় শুয়ে পুরুষটি দরজায় দাঁড়ানো।

যে আধারে সন্তানের দুধ জমা হবে
মেয়েটির সেই দুই সোনার কলসে ডাকে সমুদ্র-বাতাস
এক বাহু উপাধান, আর এক হাতে যোনি ঢেকে
রূপসী আচ্ছন্ন হাসি স্তরে স্তরে ছড়াল সে ঘরে

সমস্ত শরীর ভরে রেখার নিপুণ কারুকাজ
আর তার দৃঢ় শুভ্র উরুযুগে দুটি চক্ষু আঁকা...

বাদলা পোকার মৃত্যু হাহাকারে ভরে দেয় মন
আলোকে হৃদয় বলে; পোকাটাকে লোভ নামে ডেকে
কবির পরম শান্তি;
কী লাভ অনর্থক বাদলা পোকায়?
নীল আলো নিভে গেল উরু থেকে দুই চক্ষু মুছে।

সুন্দরবন ভ্রমণ

সুন্দরবন থেকে ফিরলে, বাঘ দেখেছ?
দেখিনি
বাঘ আমাদের দেখেছে!
নদীতে কী কী মাছ পেলে?
সব মাছ সেদিন ছুটি নিয়েছিল
জঙ্গলে ছিল গাছেদের নিজস্ব পিকনিক।
ঝড় বৃষ্টি হয়নি?
বাতাসের তো সেদিন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা
আকাশ ঢাকা ছিল হলুদ পর্দায়—
তা হলে কী দেখলে শেষ পর্যন্ত?
সোনাবিবি আর রূপোবিবির হাসি-কান্না
তার মানে?
যেমন সব তরঙ্গেরই মানে আছে
যেমন সব বাঁশের সাঁকোর দুলুনিরই মানে আছে
যেমন নৌকোর দুটো চোখ...

তবুও আনন্দে আছি

তবুও আনন্দে আছি, সকালের চায়ের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ খেয়ে বেশ
মজে আছি
মাসমাইনের কথা মনে পড়লে চুম্বনের স্বাদ পাই,
ফুল ফোটার দৃশ্য দেখে মনে হয় মেয়েরা ফুলের মতো,
কাগজ ফরফর শব্দে উড়ে যায়...

নিউজ প্রিন্টের গন্ধ
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা ষাট পয়েন্ট ডি সি
ভিয়েৎনাম বোল্ড বক্স
মহাপুরুষের কোলাহল, বিশ্ব সুন্দরীরা চারকলম
খাদ্যাভাব জ্বলন্ত লিডার
সামিল কবিতায়, লেখা আজকের বাজারদর
সার কারখানার কথা সার বুঝে নিয়েছে জাপান
মহাশূন্য ও আসামের বন্যার
খবর, এস সি লাডলো
ডট, স্টার, স্পেস
স্পেস—
বর্জাইস দুঃখ
মানুষ চিরকাল অনৈতিহাসিক, মানুষ নীরব
আমি শুনতে পাই বাইরে কলকাতার কলরব।

লক্ষ্মীকান্তপুরের লক্ষ্মী খিদিরপুরে ঘোরে একলা
ছাপরা জেলার রামভরোসা ছবঙ্কু শিংকে খুঁজে পেয়েছে
ডালহৌসিতে
গয়াজিলার আদমি এল ভবানীপুরের গয়া জেলায়
কটক থেকে তিনটি কটক সটকে এল কাঁটাপুকুরে
গুজরাতের ছিপিওয়ালা পেয়ে গিয়েছে সোডা-বটল ধর্মতলায়
জবরদস্ত রাজস্থানি কলুটোলায় ঘোরায় ঘানি
সর্দারজি বাঁয়ে ঘুমকে হঠাৎ এসে দেখে থমকে
দাড়ি কামানো আরেকজনের খবরদারি
বাড়ি কোথায়? ফরিদপুর? চলেন তবে যাদবপুর!

সামান্য

আমি তার মুখ চেয়ে সময়ের শূন্যতাকে খুঁজি
যে হেতু আমিও নিঃস্ব, প্রাচুর্যের ভিড়ে
প্রত্যহের দীনতায় ক্ষয়ে যায় সামান্য যা পুঁজি
অন্ধকার খনি গর্ভে শুধু জ্বলে প্রার্থনার হিরে।

স্রোতের ফুলের মতো আকাঙ্ক্ষার ক্ষুর
সারাদিন শত কাজে বারে বারে ছুঁয়ে যায় প্রাণ
যদিও স্মরণে তার মূল নেই, একান্ত সুদূর
যে ফুল শুকিয়ে গেছে, যেন তার ভুলে যাওয়া ঘ্রাণ।

আমি তার মুখ চেয়ে সময়ের শূন্যতাকে খুঁজি
আমি তার দুই চোখে দূরান্তের দৃষ্টি হতে চাই
শেষ করে দিয়ে যাব কৃপণের সামান্য যা পুঁজি
যখন পরম প্রাপ্তি, তখনই তো নিজেকে হারাই!

দেখা

সবুজ শাড়ির সঙ্গে দেখা হল বাদামি শার্টের
গড়িয়াহাটায়
কেউ কারুর মুখ দেখতে পেল না
কেননা ধূসর আলো ছিঁড়ে পড়ল হঠাৎ বৃষ্টিতে
ঢেউয়ের মতন বৃষ্টি উড়ে এল গাড়িবারান্দার নীচে
খুব মনখারাপ সেই সন্ধেবেলা
কেউ কারুর মুখ দেখতে পেল না!

বুকের ভিতর ঘড়ি

বুকের ভিতরে ঘড়ি, বেজে উঠল প্রথম সংকেত
রাত্রি, তুমি সব বন্দনার চেয়ে দামি
রাত্রি, তুমি ঘুম কেড়ে আজীবন কৃতজ্ঞ করেছ
কৃতজ্ঞ পথের ধুলো পায় পায় উঠে যায় নগ্ন দেবালয়ে
ধুলোর পুরুষ মূর্তি, রাত্রির কৃতজ্ঞপথ নগ্ন দেবালয়ে
কী যেন আহ্বান করে, চোখ মেরে হাসে;
চোখ যে সুখের গুরু, সুখ তার প্রথম উষ্ণতা
রানিকে জানাতে চেয়েছিল,
রানি ও নারীর কাছে শিখে আসে
অপরূপ উরু ব্যবহার!

ক্রমশ পৃথিবী

জল থেকে পদ্ম তুলে মূর্তির পায়ের কাছে রাখি
কী এমন ক্ষতি ছিল সমূর্তি এ নিখিলও
যদি জলে ডুবাতাম, ভেসে যেত অশ্রুর চালাকি।
দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্ব, ঈশ্বরের চেয়ে নিঃস্ব
দৃশ্যগুলি
ভিখারির মতো পায়ে পায়ে ঘোরে; আমার অঙ্গুলি
চেয়েছিল সুদর্শন, তার বদলে ঠুলি পরা মানুষের
ঘিলুহীন খুলি

হৃদয় ও উদরের নিয়ত ঘর্ষণ
করে সুখী আছি; আজ কোনও বন্দনার দাম নেই
দুঃখিত মুখের কাছে পৃথিবীর কোনও শব্দ নেই,
আমি অপরাধী!

পতন

মানবসভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে
ভারত সরকার এখনও তা টের পাননি
স্বাধীনতা কোনো সীমান্তের তোয়াক্কা করে না
ভালোবাসা আর স্বাধীনতা এক নয়, কারণ
ভালোবাসায় সীমান্ত প্রহরী লাগে না
পার্ক স্ট্রিটের এক ফ্ল্যাটে পরশুদিন
ঈশ্বর আত্মহত্যা করেছেন
পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে
শরীর, তুমি চোখে চোখ রেখো না,
পুলিশ!
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে,
কোনো মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা হয় না
আমিষাশী হিন্দুরা গরু খেতে শুরু করুক!

এ শহরে আজ

হায়, এ শহরে আজ গান বন্ধ!

কোথায় গেল সেই বনবালার দল, অপ্সরী-কিন্নরীরা! রঞ্জিত ওষ্ঠা, মানিনী, পৃথুল-মধ্যমা সুন্দরীরা! করতল তাল বলয়াবলী বাজিয়ে ললিত কলস্বনে গান গেয়ে উঠছে না এ শহরে! কলকাতার আজ কী ম্লান দশা। ম্লান, ছলোচ্ছল চোখ, দুঃখিনী বালিকার জন্য ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে না রাজকুমার, একা পাঁচজন গুণ্ডার সঙ্গে লড়াই করছে না কেউ, পিড়িং পিড়িং শব্দে শুকনো গাছে ফুটে উঠছে না ফুল, পাথরের মূর্তি কথা বলছে না, বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির রাত্রে আঁচল উড়িয়ে অভিসারে যাচ্ছে না প্রোষিতভর্তৃকা। এক সপ্তাহ হিন্দি সিনেমা বন্ধ।

ঘুম

কতদিন এমন সৌরভ তুলে হৃদয়ে ঘুমোবে?
এবার বেরিয়ে এসো, মুখোমুখি মুখ দেখি চৌরাস্তার
পাগল আলোতে
নরম পোকার মতো ঘাসফুলে ভরা এই শহরের পথে
প্রথম যৌবনময় হাত ধরে ক্ষীণ সন্ধেবেলা হেঁটে যাই।

আর তো সময় নেই, জুলপিতে ছোপ লেগেছে সাদা
আমের নতুন মুকুলের গন্ধ ভুলে গেছি, স্মৃতির ভিতরে এত ধাঁধা
ছিল?
রাত্রির বিশাল মাঠে জ্যোৎস্না দেখে ভয় পাই আমি
ঘুম আসে না ঘুমের প্রহরে
হোটেলের কোন ঘরে বিশল্যকরণী বুকে ধরে
কতদিন অন্য রমণীর ঘুম চুরি করে হারিয়ে ফেলেছি তার চাবি...
আজ চোখে পাক দেয় দুঃখ, অপর মুখের কাছে আর
কোনও দাবি নেই!

ফুটেছে অমূল শস্য, হঠাৎ বাতাস বলে, 'কেমন আছিস?'
আর তো সময় নেই, আর তো সময় নেই, কেঁপে ওঠে বুক
নবীন যুবার মতো হাতে নিয়ে বিষ
এখন তোমার কাছে প্রাণপণ, এবার বেরিয়ে এসো, মুখোমুখি
মুখ দেখি চৌরাস্তার পাগল আলোতে
নরম পোকার মতো ঘাসফুলে ভরা এই শহরের পথে
প্রথম যৌবনময় হাত ধরে ক্ষীণ সন্ধেবেলা হেঁটে যাই।

এমন মানুষ রোজই দেখি

এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা আমায় আগে চিনতেন, ডেকে বলতেন
এই যে সুনীল, কেমন আছ, এসো চা খাও

এখন তাঁরা মুখ ফিরিয়ে শুকনো হাস্য, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন
কালো গহ্বর
ঘরে ঢুকলে অনেকে আজ জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হুকুম করেন...

বৃষ্টি হয়নি বিকেলবেলা, বিষম গরম, সে অপরাধে আমি হয়েছি মূল আসামি
মধ্যরাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন, আমার ঘুম হল না
পাগলা হাওয়ায় উড়িয়ে নিল হলুদ রুমাল, একটি তারা খসে পড়ল
পুড়তে পুড়তে খসে পড়ল বনের মাথায়
এসব যেন আমারই দোষ, একটি মেয়ে সেই থেকে আর কথা বলে না
মুখের দিকে তাকাই, আমার বুকের ভিতর কাতর ক্ষমা প্রার্থনা
কথা বলিনি, মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকেছি...

বয়েস হল তিরিশ পার, বাঁ জুলপিতে একটি সাদা শিকড়
আর কয়েকটা বছর মাত্র বেঁচে আছি
সবার মুখের দিকে তাকাই, বুকের ভিতর কাতর ক্ষমা প্রার্থনা
কথা বলি না, নির্নিমেষ চেয়ে থাকি
দু'চার মাস কবিতা লেখা না হলে আমার মুখের কথাও
ভালো শোনায় না
যে সব পাপ করিনি, আমি তারও অগ্রিম ক্ষমা
চেয়েছি নিঃশব্দে।
এই পৃথিবী আমায় একটা বিশাল গর্ত খুঁড়তে বলেছিল,
এবার শেষ হল
আর পাঁচটা বছর বাঁচব, এখন আমি পোশাক বদলে
তৈরি হয়ে নিচ্ছি
গোপালপুরে সন্ধেবেলা শুয়েছিলাম সমুদ্রের পাড়ে
একলা চিত হয়ে
জলের শব্দ, নীল রঙের মধ্যে আমার দু'হাত ছড়ানো
সেদিনই খুব মরে যেতে ইচ্ছে হল,
এমনভাবে আগে কখনও ইচ্ছে হয়নি!

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছ?

তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি মীরা,
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

বিচ্ছেদ

দেখা হয়, কথা হয়, তবু বিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে
খুঁড়ে তোলা মাটি থেকে জমে ওঠে নিকৃষ্ট পাহাড়
চোখের সম্মুখে তুমি দাঁড়ালেও স্বচ্ছ বাতাসের ব্যবধান
আমার এমনই রাগ, আমি সেই স্বচ্ছতাকে শত্রু বলে ভাবি!

ভালোবাসা শব্দটিতে ইদানীং প্রচুর মিশেছে জল
বস্তুত বন্যার স্রোতে ভেসে যায় ভালোবাসা
ঐ দ্যাখো, সকলেই দেখে
এ রকম সার্বজনীনতা আমি পছন্দ করি না!

বিচ্ছেদ শব্দটি যেন নিজের শরীরে সাদা পুঁজ-ফোঁড়া
অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে আরাম লাগে বেশ
এ যেন নির্মাণ-সুখ, অথচ দুঃখের চাপা ব্যথা!
নীরা, এই কথাগুলো রোজ বলি বলি করে
ফিরে যাই,
মধ্যরাত্রে জানে শুধু পথের কুকুর!
একাকিত্ব গাঢ় হলে আমি অন্ধকার দিয়ে
গড়ে নিই
তোমার আদল
সে আদল বুকে নেওয়া কত সোজা,
কত তীব্র আলিঙ্গন

সজিভ চুম্বনে সেই কবেকার নদীতীরে প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা
কৈশোরের স্বাদ
সেই ছবি, নীরা, তুমি স্নানঘরে দর্পণে দেখো না?

সিঁড়ির ওপরে

কোনো ঘরে জায়গা নেই, তুমি আমাকে
বসতে বললে সিঁড়িতে

আঁচল দিয়ে ধুলো মুছতে যাচ্ছিলে, আমি বললাম, থাক!
আমার মুখের ঘাম মোছার ইচ্ছে ছিল ওই আঁচলে
কিন্তু সেটা ছড়িয়ে রইলো মাঝখানে
প্রবাদের খড়্গের মতন
তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়
স্পর্শকাতর বাতাস।
সিঁড়ির নিস্তব্ধতা ভেঙে যখন-তখন জেগে ওঠে পদশব্দ
আমি সঙ্কুচিত হয়ে বসি, ইচ্ছাশক্তিতে কেন মানুষ
অদৃশ্য হতে পারে না!
অচেনা দৃষ্টিগুলি আমার শরীরে বেঁধে, নীরা তুমি হেসে ওঠো

তোমার বিমূর্ত হাসিতে সিঁড়ি হয়ে যায় জলপ্রপাতের কিনারা
সেখানে ঝুঁকে আছে স্নেহময় বৃক্ষ,
জলে খেলা করে পাতার ছায়া
নব ভ্রূপল্লব, নব বেদনাময় আহ্বান!
তোমার নরম স্থিতি থেকে আমার বাসনা অনেক দূরে
তবু সিঁড়ির ওপরে বহুদিনের বিচ্ছেদ বেদনা ধুলো হয়ে গেল।

সংযোজন: অনুবাদ কবিতা

সূচিপত্র

যুদ্ধ ৩০৭, ক্লান্ত সৈনিক পেছনে তাকিয়ে ৩০৭, সীমান্ত ঘাঁটিতে ৩০৮, দম্পতি ৩০৯, ঠান্ডা কবরে ৩১০

যুদ্ধ

সাও সুং

একদা যা ছিল আমাদের পাহাড়, আমাদের নদী
আমাদের উর্বর ভূমি
আজ তা শুধু সৈনিকের মানচিত্রে কয়েকটি বিন্দু ও রেখা।

যুদ্ধ আমাদের সবাইকে বিমর্ষ করে দিয়েছে
কেউ আর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবে না।

সামরিক বিভাগে ধাপে ধাপে
পদোন্নতির প্রশ্নও এখন
অর্থহীন;
কেন না আমি জেনে গেছি,
সেনাপতির খ্যাতি নির্ভর করে থাকে একরাশ শুকনো
হাড়ের ওপর—
যারা একদিন মানুষ ছিল!

ক্লান্ত সৈনিক পেছনে তাকিয়ে

ৎসেমা চা

বাড়ির পাশে ছিল জমি, ফেরার পথ নেই—
কে তার চাষ করে! এখানে একা শুয়ে
সীমান্তের এ শহরে, স্বপ্ন দেখি
নতুন পাকা ধান, আঃ কি সুঘ্রাণ!
স্বপ্ন ভেঙে যায়, এখন যুদ্ধ
এখানে কুৎসিত রক্ত-গন্ধ।

হানের সম্রাট তবুও প্রাসাদের গহনে শুয়ে থেকে

রাজ্য বাড়াবার স্বপ্ন দেখছেন!
অর্ধ দেশ জুড়ে জ্বলছে আগুন—
প্রতিটি গৃহ থেকে
সুস্থ লোকদের যুদ্ধে ডাক পড়ে।

একথা কে না জানে, সীমান্তের জমি বন্ধ্যা-অফলা
তবুও বিস্ময়, সেই পোড়ো জমির লোভে
কেন এ মারামারি!
দক্ষ চাষিদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া নিছক অর্থহীন
পাহাড়ি মানুষের তলোয়ারের ঘায়ে মরছে তারা!

সীমান্ত ঘাঁটিতে

সু হান

সাং কান-এর উত্তরাঞ্চলে সারারাত ধরে যুদ্ধ চলল
এমন ঘোর যুদ্ধ যে আমাদের অর্ধেক সৈন্যবাহিনী
আর ফিরে এল না।

সকালবেলার ডাকে বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে
লিখেছে
শিগগিরই শীতের পোশাক পাঠানো হচ্ছে ওদের জন্য।

দম্পতি

কার্ল স্যান্ডবার্গ

পুরুষটি ছিল শিনশিনাটিতে, মেয়েটি বার্লিংটনে
পুরুষটি টেলিগ্রাফের তার বসানোর দলের একজন কর্মী
মেয়েটি এক বোর্ডিং হাউসে থালাবাসন ধোয়।
'কান্না বড় নিঃসঙ্গ', মেয়েটি লিখে জানায়,
'এখানেও তাই', পুরুষটির উত্তর।
শীত এসে পেরিয়ে গেল, পুরুষটি ফিরে এল, ওরা দু'জনে বিয়ে করল
আবার কোথায় ঝড়-বৃষ্টিতে উপড়ে পড়েছে টেলিগ্রাফের দণ্ড, তারগুলো ঝুলে
পড়েছে
বরফের শক্ত ধারায়, পুরুষটি আবার চলে গেল

মেয়েটি আবার চিঠি লেখে, 'কান্না বড় নিঃসঙ্গ'
'এখানেও তাই', ফের পুরুষটির উত্তর।
ওদের পাঁচটি সন্তান এখন পড়ছে উত্তম ইস্কুলে
পুরুষটি ভোট দেয় রিপাবলিকান দলের প্রার্থীকে, নিয়মিত কর দেয়
ওদের চেনা পরিমণ্ডলে সবাই ওদের চেনে
সৎ আমেরিকান নাগরিক হিসেবে, সৎ জীবনযাপন করছে।
অনেক জিনিস যা অন্যদের উত্যক্ত করে, ওরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না
ওদের পাঁচটি সন্তান এবং ওরা একটি দম্পতি,
যেন একজোড়া পাখি, ডাকে পরস্পরের দিকে চেয়ে, এবং তাতেই পরিতৃপ্ত।
যখনই পুরুষটি দূরে কোথাও যায়, নারী নিশ্চিত লিখে জানায়, 'কান্না বড় নিঃসঙ্গ'
এবং পুরুষ সেই একই পুরনো উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাঠায়, 'এখানেও তাই।'
শিনশিনাটিতে টেলিগ্রাফের তার বসাবার কাজ করত যখন, তারপর বহুদিন কেটে
গেছে
বার্লিংটনে থালাবাসন ধোওয়ার কাজ থেকেও সে এখন বহুদূরে
এখনও ওরা পরস্পরের প্রতি ক্লান্ত নয়, ওরা একটি দম্পতি।

ঠান্ডা কবরে

কার্ল স্যান্ডবার্গ

আব্রাহাম লিংকনকে যখন কবরে নামিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হল, তিনি
তখন ভুলে গিয়েছিলেন দক্ষিণ সমর্থক অবিশ্বাসীদের, হত্যাকারীকে...
...মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে।

এবং ইউলিসিস গ্রান্ট আর মনে রাখেননি তার বিশ্বাসী সহচরদের
কথা, ওয়াল স্ট্রিট; টাকা আর হুন্ডি, কোম্পানির কাগজ পুড়ে ছাই...
...মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে।

রানি পোকাহোনটাস-এর শরীর, পপলারের মতন মনোহারিণী, নভেম্বরের
রক্তকরবী অথবা মে মাসের কামরাঙার মতন মিষ্টি... তিনি কি অবাক
হয়েছিলেন? কিছু মনে পড়েছে তাঁর?... মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো এক ঝাঁক মানুষকে তুলে নাও, পোশাক আর
তৈজসপত্র কিনছে, উল্লাস জানাচ্ছে তাদের মনোমতন বীরপুরুষকে, রঙিন
কাগজের ফুল ওড়াচ্ছে হাওয়ায়, বাজাচ্ছে টিনের ভেঁপু... আমায়
বলো প্রেমিকরাই বঞ্চিত কিনা... আমায় বলো প্রেমিকদের
চেয়েও কেউ বেশি পায় কিনা... মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে।

সংযোজন: ছড়া

সূচিপত্র

বাংলার ছড়া ৩১৩, আমার বাংলা ৩১৩, বর্ষা ৩১৪, মা বললে ৩১৫, পারিজাতের মালা ৩১৫, গভীর রাতের ম্যাজিক ৩১৬, খাওয়ার পরে ঘুম ৩১৭, সাইকেল ও সাঁতার ৩১৮, ফুলডাঙার পুকুর ৩১৯, সুকুমার রায় নেই ৩২০, শান্তিলতা ৩২১, রিংরাং টোটো ৩২১, এলাটিং বেলাটিং ৩২২, শীত-গরমের ছড়া ৩২৩, দূরে কেন, পাশাপাশি ৩২৩, মিনির গল্প ৩২৪, কালো ও সাদা ৩২৫, কোনটা আসলে সত্যি ৩২৬, শীত ৩২৭, বিদ্যাসাগর ৩২৮, বৃষ্টির রূপকথা ৩২৯, প্রতিদান ৩২৯, খোকার ভাবনা ৩৩০

বাংলার ছড়া

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর
তার উপরে বসে আছে সিপাহি বিস্তর।
এক সিপাহি ফড়িংগুঁপো এক সিপাহি আধলা চাঁদ
আয়রে আমার সোনামণি, আয় দেখবি বালির বাঁধ।
বালির বাঁধে ডুমুরের ফুল, বালির বাঁধে ঘোড়ার ডিম
মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি নিম গাছেতে হচ্ছে সিম।
মাসির বাড়ি নারায়ণগঞ্জ, ফুফার বাড়ি আমেদপুর
এ পারেতে দুধ উথলোয়, ও পারেতে খেজুর গুড়।
পায়ে ফুটল খেজুর কাঁটা, মাথায় তাগা বাঁধবে কে
রোদের মধ্যে বৃষ্টি নামল, শ্যাল কুকুরের হচ্ছে বে!
এ পারেতে বৃষ্টি পড়ে ফুটো ঘরের চালা
ও পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা!
মানিক গেছে কুষ্টিয়ায় রাক্ষসেরা পান খায়
পান সাজতে হল বেলা খান সাহেবরা বাড়ি পালা
ঝড়ে ডুবল গয়নার নাও, তাঁবু ঠেকল গাছে
তাই দেখে টাকডুমাডুম বিলিতি ভোঁদড় নাচে!
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, তুর্কি নাচন দেখে যা!

ও পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!
ফুসমন্তর ফুসমন্তর দেখো তুমি কার?
চোখ খুললে যায় না দেখা, মুদলে পরিষ্কার!

আমার বাংলা

শোনো বলি এক আজব দেশের কথা
সে আজব দেশ আমার বাংলা দেশ
বৈশাখে তার নিদারুণ কঠিনতা
আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি-বাউল বেশ।

সোনার শরতে শুভ্র মেঘের মতো
অপরূপ সাজে সেজে থাকে সারা দিন
নানা উৎসব আনন্দ আছে যতো
সব নিয়ে আসে—সে সুখ তুলনাহীন।

অঘ্রাণে তার মায়ের মতন স্নেহ
সোনার ধান্যে করে সে আশীর্বাদ
ধান্যের ঘ্রাণে পবিত্র হয় দেহ
ফাল্গুনে পাই নব জীবনের স্বাদ।

কত আর লিখি, লেখার তো নেই শেষ
স্বপ্নেতে গড়া আমার এ বাংলাদেশ ॥

বর্ষা

সারাটা গ্রীষ্মে পুড়েছে পৃথিবী দুঃখে
পুড়েছে আকাশ ফেটেছে মাটির বুক
এতদিনে তার অশ্রু গড়াল চক্ষে
এই বর্ষায় আসবে মনের সুখ

গাছের পাতায় ছিল না হাওয়ার খেলা
মানুষের মুখে ছিল শুধু আঁকা ক্লান্তি
দিনরাত্তির ভরা শুধু অবহেলা
এতদিনে শেষে আসবে বুঝিবা শান্তি

এতদিনে বুঝি ভরবে নদীর বুক
সোনার ফসলে হাসবে বাংলাদেশ
মুছে যাবে সব বিষাদ ক্লিষ্ট মুখ
এই বর্ষায় দুঃখের হবে শেষ ॥

মা বললে

মা বললে, ঘরের বাছা আয়রে ফিরে ঘরে
মুখের কথা উড়িয়ে নিলে বৈশাখের ঝড়ে
ঘর ভাঙল চাল উড়ল জল উঠল ফুলে
ময়ূর খোঁজে কেউটে সাপ নদীর কূলে কূলে
উড়াল দিয়ে নামল নীচে শিকরে বাজপাখি
পায়রা ভাবে বুকের ওম কোথায় তুলে রাখি!
কলার ভেলা সাজিয়ে নিয়ে ভাসাই দরিয়ায়
মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের মুখে কত না দিন যায়!
অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ে ক্লান্ত ঝরঝর
উজান গাং পেরিয়ে এসে সামনে হালির চর।
আবার শেষে দুঃখে সুখে নতুন ঘর বাঁধি
কিন্তু কোথায় মা হারাল? সেই কথাতে কাঁদি!

পারিজাতের মালা

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা, এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
ঘুম ঘুম ঘুম, শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফোঁটা, কপালে দেয় চুমো!
শির শির শির, বাতাস হাসে, চোখ ভরতি জলে
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিসফিসিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন, তেমন মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাড়ে...
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কাপড় কাচা নীলের মতো আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা, এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা

নদীর জল খুশির তোড়ে বাজায় রিনিঝিনি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোঁটা, বললে, যেন চিনি।
একটি সাদা কাশের গোছা, বললে পেন্নাম
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম!

গভীর রাতের ম্যাজিক

মাঝরাত্তির হলে সবাই ঘুমোলে,
আকাশের তারাগুলো হা-ডু-ডু-ডু খেলে।
হা-ডু-ডু-ডু হা-ডু-ডু-ডু চু-কিত-কিত।
গরম না শীত ভাই, গরম না শীত?
এক তারা খসে পড়ে, এক তারা হাসে,
চাঁদের দু' পাশে আরও দুটো চাঁদ ভাসে।
তিন চাঁদে গলাগলি, যেন তিন নারী,
এই হেসে গড়াগড়ি, এই হল আড়ি!

এক চাঁদ নেমে আসে পুকুরের জলে,
আর একটি দোল খায় বনে জঙ্গলে।
বাকি চাঁদ সেই চাঁদ, সকলের চেনা,
সে যে ঘুমে ঢলে পড়ে, কেউ তা জানে না।
ঘুম চাঁদ, চাঁদ ঘুম, মেঘ দিয়ে ঢাকা,
তখনো আকাশে চাঁদ খড়ি দিয়ে আঁকা!
জঙ্গুলে চাঁদটার ঘুম নেই চোখে,
জোনাকিরা ছিনিমিনি খেলে নিয়ে ওকে।
একজোড়া প্যাঁচা এসে বলে, 'ওরে চাঁদি,
আয় ভাই গলা ছেড়ে এক সুরে কাঁদি!'
ভয় পেয়ে কাঁদে চাঁদ খানিক খানিক,
মাঝে-মাঝে হেসে ফেলে ফিক ফিক ফিক!
পুকুরের চাঁদখানা ডোবে আর ভাসে,
মৃদু সুরে গান গায় মিহিন বাতাসে।

ছোট ছোট মাছগুলো বলে, আয় খেলি,
হাততালি দিয়ে ওঠে চাঁপা, জুঁই, বেলি!

শেষ রাতে সব কিছু বিষম আলাদা,
আকাশে কত না রং, অন্ধকার সাদা!
সুনীল দেখেছে এই দারুণ ম্যাজিক
তোমরা দেখোনি কেউ! ধিক ধিক ধিক!

খাওয়ার পরে ঘুম

হাওয়া বয় শনশন, বৃষ্টিরা ঝমঝম,
নুন খেয়ে গুণ গাও, ঝাল খাও কম কম।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু, পাখি ডাকে টিট্টি,
আমলকী মুখে দাও, জল খুব মিষ্টি।
মৌমাছি গুন গুন, মাছি ওড়ে ভন ভন,
বেশি আম খাও যদি, ফোঁড়া হবে টন টন।
সেতারের টুংটাং, তবলায় ধপাধপ,
তেতো খাও এক ফোঁটা, সন্দেশ গপাগপ।
কাচ ভাঙে ঝনঝন, ঝড় আসে হুড়মুড়,
পাউরুটি লাগে খাসা, যদি থাকে ঝোলাগুড়।
নদী বয় কলকল, গাছে গাছে ঝিলমিল,
পান খাও এক খিলি, হাসি পাবে খিলখিল।
কথা হয় ফিসফিস, জল পড়ে টুপটাপ,
আর কত খাবে বলো, চারদিক চুপচাপ।
কাগজের খসখস, নূপুরের রুমঝুম,
খাওয়াদাওয়া হল বেশ, এই বারে টানা ঘুম।
বাজি ফাটে দুমদাম, কাঠফাটা রোদ্দুর,
ঘুম এলে উড়ে যাও, যেতে চাও যদ্দুর!

সাইকেল ও সাঁতার

ওপাড়ার নটবর খুব নাকি গুণধর
সাইকেল চালিয়েই চলে গেল দেওঘর।
এপাড়ার সুবিনয় হাবাগোবা অতিশয়
সাইকেল দেখলেই, তার পেটে ব্যথা হয়!

নটবর থিয়েটারে রাম সাজতেও পারে
সুবিনয় চুপিচুপি আশেপাশে উঁকি মারে
একদিন দয়া করে তাকে ধরে আনা হল
এপাড়ায় কত ছেলে, সে-ই শুধু পার্ট পেল
চোখে মুখে রং মেখে হনুমান সাজল সে
রামরূপী নটবর ঘোরে ফেরে রাজবেশে
হনুমান ছোট পার্ট, তাতেই সে কুপোকাত
রামরূপী নটবর আগাগোড়া বাজিমাত
নটবর খালি-খালি পেল কত হাততালি
সুবিনয় ভুলো-মন, পেল শুধু গালাগালি!

তবে খুব মজা হল এবারের বর্ষায়
মাঠঘাট ডুবে গেল যতদূর দেখা যায়
জল থইথই, আরও মেঘ গুড় গুড় করে
বন্যার জল বুঝি বাড়িতেও ঢুকে পড়ে।
কত লোক চলে এল রাস্তায় গাড়ি ফেলে
এ সময় নটবর ফিরছিল সাইকেলে
কী সাহস বলিহারি একা-একা দেয় পাড়ি
ঝুপ করে পড়ে গেল, পথ হয়ে গেছে খাঁড়ি
হায় হায় এ কী হল, নটবর যায় ভেসে
এত গুণধর তবু সাঁতারটা শেখেনি সে!
কলকল করে জল নটবর খাবি খায়
সাইকেল আগে গেল, সেও শেষে ডুবে যায়
আর ঠিক তক্ষুনি সুবিনয় সাঁতরিয়ে
চুল ভরা মাথা এক পেয়ে গেল হাতড়িয়ে!
ছাদে ছাদে কত লোক দেখল সে দৃশ্যটা
হাততালি শোনা গেল অন্তত পাঁচশোটা।

রাম ভয়ে নীল, তার বুক করে ধুকধুক
হনুমান লজ্জায় মুখ লাল টুকটুক!

ফুলডাঙার পুকুর

পুকুরধারে কদমগাছ
তার দু'পাশে কলা এবং লিচু
জলে ভাসছে তিনটে হাঁস
ফুরুসগাছে ফুল ফুটেছে কিছু।
কদমগাছে কোকিল আসে
ডাকতে শুনি, যায় তাকে দেখা
এক পা তুলে বকবাবাজি
ধ্যান করে যায় সকাল-দুপুর একা।

তিনটি তালগাছই বড়
ছাড়িয়ে গেছে আর সবার মাথা
অন্য একটা ঝাঁকড়া গাছ
কেউ চেনে না। আসলে তেজপাতা।

টপটপিয়ে বৃষ্টি এসে
কতরকম ছবি আঁকছে জলে
শোল মাছের বাচ্চা হল
পোনার ঝাঁক ঝিকমিকিয়ে চলে।
বিকেলবেলা আকাশ খুশি
সোনার আলো ছড়ায় মেঘ ভাঙা
বাতাস এসে হল্লা করে
ঝুপুস করে পড়ল মাছরাঙা।

তিনটে হাঁস শেষ গা-ধুয়ে
গলা মিলিয়ে ডাকল তিনবার
সূর্যদেব অস্তে গেলেন
অন্ধকার ঢাকল চারিধার।
তালপাতায় শরশরানি

ঝিরঝিরানি ইউক্যালিপটাসে
টুপটুপিয়ে ঝরে শিউলি
কতরকম সুবাস ভেসে আসে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকি
যতই দেখি, তবু মেটে না সাধ,
এখন সব কালোয় ঢাকা
মাঝপুকুরে দোল খাচ্ছে চাঁদ।

সুকুমার রায় নেই

বাবুরাম সাপুড়ের দুঃখটা জানো কেউ?
কেন সে যে একা বসে কাঁদে শুধু ভেউ ভেউ?
সুকুমার রায় নেই, আর কে বা দুনিয়ায়
তার বাকি কথাটুকু লিখবে যে হায় হায়!
বিষ ছাড়া সাপ আছে ঝুড়িটার মধ্যে
কেউ আর সেই কথা লেখে নাকো পদ্যে।

হুঁকোমুখো হ্যাংলার আরো বেশি মুখভার
তার কত কেরামতি, দেখল না সুকুমার!
মাছা তাড়া করা কাজ আর নয় শক্ত
মাছি-মারা কেরানিরা সব তার ভক্ত!

হাঁসজারু ভাবে বসে ব্যাকরণে সবই সয়
ট্যাঁশগরু অফিসের বড়বাবু মহাশয়
প্যাঁচা আর প্যাঁচানির চেঁচানির শেষ নেই
যার গোঁফ চুরি গেল, আজ তার কেশ নেই।

সুকুমার রায় নেই, তাঁর লেখা কোথা পাই
'আবোল তাবোল' পড়ো, আর পড়ো 'খাই খাই'!

শান্তিলতা

একটা ছোট্ট দোকানে এক পুঁচকে মেয়ে বসে
খদ্দের না থাকলেই সে স্লেটে অঙ্ক কষে
কোঁকড়া চুল, দু কানে দুল, বয়েস মোটে বারো
কক্ষনো সে কাঁদে না, তারা চক্ষু দু'টি গাঢ়।
একখানা নয়, দুখানা নয়, এগারোখানা স্লেটে
এ পিঠ ও পিঠ ভরালে তার অঙ্ক-ক্ষুধা মেটে।
একটা বাল্‌ব কিনতে গেছি, বললে সেই মেয়ে
তালমিছরি নিন না, এখন শস্তা সবচেয়ে
ফাগুন মাসে বেগুন কিনলে হবে দারুণ ক্ষতি
তিন লক্ষ কিলোমিটার বলুন তো কার গতি?
উত্তর না পেলেই তার হাসি খেলবে ঠোঁটে
দোকানখানা দিব্যি চলে, খদ্দের নেই মোটে।

এত কী সব লিখিস রে তুই, একটু দেখতে পারি?
একের পিঠে শূন্য শূন্য রয়েছে সারি সারি
ওরেব্ বাবা, এ যে দেখছি মেয়ে আইনস্টাইন
নাম কী তোর? বলল হেসে, শান্তিলতা পাইন!

রিংরাং টোটো

বলো দেখি কোন দেশ রিংরাং টোটো
যে দেশের মানুষেরা সব থেকে ছোট
সে দেশের পাহাড়েরা যেন উইঢিবি
সে দেশের সব মেয়ে হরতন-বিবি!

রিংরাং টোটো দেশে গান গায় যারা
গুড় দিয়ে মুড়ি মেখে শুধু খায় তারা
রাজা নেই, মন্ত্রীর ছেলে খায় গজা
ইশ্‌কুলে মাস্টার নেই, খুব মজা!

রিংরাং টোটো দেশে একটাই পথ
গাড়ি নেই, ট্রাম নেই, চলে শুধু রথ।
কপকপ ঘোড়া ছোটে, থপথপ হাতি
সেনাপতি ঘুমোলেই জাগে তার নাতি।

রিংরাং টোটো দেশে সব রিংরাং
রিং ছেলে রাং মেয়ে নাচে ডিংডাং
পিংপং খেলা নিয়ে দিন রাত কাটে
কিংকং বাঁধা থাকে এ-দেশের মাঠে!

এলাটিং বেলাটিং

এলাটিং বেলাটিং টইলো
কী খবর আইলো?
বৃষ্টি বৃষ্টি আবার বৃষ্টি
খিচুড়ির থালায় টক-ঝাল-মিষ্টি
চাঁদের গায়ে হিরামন ছাপ!

এলাটিং বেলাটিং টইলো
কী খবর আইলো?
রোদ্দুর রোদ্দুর দারুণ খরা
সুন্দরবনে নদীতে চড়া
গল্পের গরু তাল গাছে ওঠে
কবিতার কালো মেয়ে কেঁদে মাথা কোটে ॥

শীত-গরমের ছড়া

দুধের মধ্যে নতুন গুড়, মুড়ি এবং কলা
খেয়েং মজা, খুলেং গেল গান গাইবার গলা।

এবার শীতে জ্যোৎস্না রাতে ইচ্ছে হল নাচি
ডিডিং ড্যাডাং, টম টমাটম, তিনটে মোটে হাঁচি!

নাচলে শরীর গরম থাকে, চাই না গরম জামা
ঘরেং নাচো, ছাদেং নাচো, মেঝেতে দাও হামা!

নাচের সঙ্গে গান চাই যে, নইলে কী ভাই জমে?
সারেং গামা, আহাং উহাং, গাইবে পুরো দমে।

এই রে আবার খিদে পেল যে, ধরে যাচ্ছে গলা
দুধং নতুন গুড়ং আনো, মুড়িং এবং কলা।

এমন ছড়া গরম কালেং কেমন লেখাং হবে?
নতুন গুড়টা বাদ পড়বে, মনেং রাখতে হবে।

দূরে কেন, পাশাপাশি

তলোয়ার নেই, শুধু ঢাল নিয়ে
হয় নাকি যুদ্ধ?
পুব নেই এদেশের, পশ্চিম
লেখাটা কি শুদ্ধ?

দোয়াতটা রয়ে গেছে, কালি নেই
কী করে যে লিখিরে

জল দাও, পানি দাও, ঢেউ দাও
সাঁতারটা শিখিরে!

সাহেবরা চলে গেছে, থুতু নিয়ে
কারা যেন চাটছে
পায়ে ঘড়ি, হাতে দড়ি, মরি মরি
ওই কারা হাঁটছে!

ভাই ভাই এক ঠাঁই, দূরে কেন
পাশাপাশি আয় না!
মুখ খানা চেনা নয়? ভালো করে
দ্যাখ না রে আয়না!

মিনির গল্প

ছোট্ট মিনি ভূতের গল্পে মাথা দুলিয়ে
হাসতে থাকে খুব
একটুও ভয় পায় না
মায়ের কাছে যায় না
কাতুকুতু দিলেই নাকি ভূতেরা সব
জলের মধ্যে ডুব!

রাজপুত্রের গল্প শুরু হতে না হতেই
মিনি বলবে, না, না!
পক্ষীরাজ চায় না
বাঘ-সিংহ-হায়না
সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, দৈত্য দানো
এসব কিছুই মানা।

কী মুশকিল, মিনির জন্য চক্ষু বুজে
কীসের গল্প খুঁজি?

রূপকথা শুনবে না
যুদ্ধও চলবে না
বলবে ওসব গল্প তুমি বানিয়ে বলছ,
আমি বুঝি না বুঝি?

কখনো মিনি নিজেই একটা গল্প বলা
হঠাৎ শুরু করে
এক যে ছিল ময়না
ডানায় হিরের গয়না
খিদে পেলেই বাংলা বলে, অন্য সময়
ইংরিজি ঝরঝরে!

কালো ও সাদা

একটা কুকুর কালো ভেলভেট
একটা কুকুর ফরসা
দু'জনে যেদিন জন্ম নিল
সেদিনটা খুব বরষা।

একই মায়ের এ দুটো বাচ্চা
দুধ নিয়ে ঢুঁসোঢুঁসি
আবার দু'জনে খেলায় মাতলে
মা-কুকুর খুব খুশি।

খেলায় খেলায় বেড়ে ওঠে তারা
কালো ও ফরসা দু'ভাই
কেউ চলে যায় কামস্কাটকায়
কেউ-বা হয়তো দুবাই!

বহুদিন পরে যদি দেখা হয়

দু'জনে গন্ধ শোঁকে
আদরে, আমোদে গড়াগড়ি খায়
দেখে কাছাকাছি লোকে।

॥ ২ ॥

কালো ও ফরসা মানুষেরা থাকে
নানা দেশে দুনিয়ায়
এ ওকে চেনে না, ভাইও বলে না
মুখটা ফিরিয়ে যায়।

কালোরা অনেকে ভালো গান গায়
খেলার জগতে সেরা
ফরসারা জানে জ্ঞান-বিজ্ঞান
সাগর-পাহাড়ে ফেরা।

দুই ভাই মিলে রাস্তা খোঁজে না
শুধু কোঁচকায় ভুরু
কখনো অস্ত্র ঝনঝন করে
বিচ্ছেদ হয় শুরু।

হোক না কালো বা ফরসা আমরা
কী করে যে ভুলে যাই
আমাদেরও মা তো একই! সবাই
পৃথিবীতে জন্মাই!

কোনটা আসলে সত্যি?

চশমা খুলেই উঠেছি, নদী তো ছিল না এখানে
আগে তো দেখেছি ধু ধু মাঠ আর তিনটে মোষের বাচ্চা
চোখের নিমেষে এত বড় নদী, কোথা থেকে এল কে জানে
নদীটা মিথ্যে? খালি চোখে দেখা মিথ্যেটাই কি সাচ্চা?

খোকা-খুকি মোষ কোথায় উধাও হয়ে গেল এই মাত্র?
নদীর দু'ধারে বড়-বড় ঢেউ, তবু নেই কোনো শব্দ
আকাশ মেঘলা, তবু রোদ্দুরে ঝলসে যাচ্ছে গাত্র
যা দেখছি তার কিছুই মেলে না, হচ্ছি তো খুব জব্দ!

চক্ষু বুজলে সঙ্গে-সঙ্গে এ কী অপূর্ব দৃশ্য
ধু ধু মাঠ নেই, নদীটাও নেই, আলো ঝলমল পাহাড়ে
ছবি হয়ে যেন দোদুল দুলছে অন্য একটা বিশ্ব
গাছগুলো গান গায় আর কত ফুল ফুটে আছে বাহারে।

তা হলে এবার বুঝে নিতে হবে কোনটা আসলে সত্যি
পাহাড়ের আলো, মোষের বাচ্চা, নদীটিও মোটে ভুল না
তিনটেই আমি দেখেছি যে তাতে মিছে নেই এক রত্তি
তবু চোখ বুজে যা দেখেছি তার নেই বুঝি কোনো তুলনা!

শীত

দেবদারু কেন সাজল এমন সাজে
বাতাস মাতল পাতা ঝরানোর কাজে
বনে বনে শুনি কত কান্নার স্বর
মনের ভুল কি, হয়তো বা মর্মর!
এসো বসন্ত, তোমায় যে আমি ডাকি!
'শীত এসে গেছে', বলল একটি পাখি।

কী ভয়ে সূর্য ডুবে যায় এত আগে
মেঘ নেই শুধু একলা আকাশ জাগে।
রজনীর ঘন অন্ধকারের সাথে
মিশে যেতে হয়, জেগে উঠি ফের প্রাতে।
এসো বসন্ত, তোমায় যে আমি ডাকি
'এখন যে শীত', বলল একটি পাখি।

কবে যে আবার ফুটবে নানান ফুল
কানন পরবে রাঙা ঝুমকোর দুল
কবে দেবদারু সাজবে সবুজ সাজে
কোকিল ডাকবে কাজ ভোলানোর কাজে।
বসন্ত আয়, কখনও আসবে নাকি!
'শীত চলে যাবে'—বলল একটি পাখি!

বিদ্যাসাগর

'আমরা বাঙালি'—এই যে গর্ব
তুমি আছ এর মূলে
তোমার কীর্তি এ বাংলা দেশ
যাবে না কখনো ভুলে।
জননীর প্রতি তোমার ভক্তি
তোমার জ্ঞানের তৃষা
তোমার সাহস, সত্যনিষ্ঠা
ঘুচাল অন্ধ নিশা।
যেমন তোমার বিদ্যা অসীম
তেমনি তোমার দান
তোমার অশেষ কীর্তির কোনো
হয় নাকো পরিমাণ!
তোমার জীবন আজিকে বাঙালি
আদর্শ রাখে মনে
তোমাকে স্মরণ করি গো তোমার
পুণ্য জন্মক্ষণে।
'বীরসিংহের' হে বীর মানব
ধন্য তোমার নাম
তোমার চরণে নীরবে আমরা
জানাই আজি প্রণাম।

বৃষ্টির রূপকথা

মেঘের মুলুকে আজ কী যে কোলাহল
কে যেন ঝরায় তার দু' চোখের জল
বাড়ির কর্তা কাকে রেগে গরজায়
ভীষণ চাবুক দেখে চোখ ঝলসায়।
ফাজিল ভাইপো তার উত্তুরে হাওয়া
হি-হি হু-হু হেসে শুধু
করে আসা যাওয়া।
আকাশের বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার
সেই ভাঙা জমে হল বিরাট পাহাড়
টিমটিম জ্বলছিল চাঁদ-লণ্ঠন
হঠাৎ ঢাকল তাকে মেঘ-পল্টন
আঁধারেতে ঢেকে গেল সব কোলাহল
শুধু শুনি ঝরে কার দু' চোখের জল।

প্রতিদান

আকাশ আমাকে এত আলো দেয়
আমি দেব তাকে অর্ঘ্য
আমার মনের স্নেহ সুধা প্রেম
স্বপ্নেতে গড়া স্বর্গ।

বর্ষার নদী, ঘন নীল বন
দু' চোখেতে দেয় শান্তি
আমিও তাদের গানে ভরে দেবো
ঘোচাব প্রাণের ক্লান্তি।

আমার পৃথিবী এত সুমধুর
তার দানে নেই অন্ত

কত না দুঃখ, জ্বালা সয়ে তবু
দিন হয় মিলনান্ত।

পৃথিবীকে আমি কিবা দিতে পারি
সে দেয় আমাকে মুক্তি
তাকে দেব আমি নীরব প্রণাম,—
ব্যথায় জমানো শুক্তি।

খোকার ভাবনা

নদী যদি হতে চায় দূরের আকাশ
তবে কি বৃষ্টি হবে গোটা বারো মাস?
খোকা বলে, বলো না মা, একি হয় না কি?
মা বলেন, থাম বাপ, ঢের কাজ বাকি।
যা এখন খেলা কর, আঁচলটা ছাড়
রোদ্দুরে দিতে হবে আমের আচার।

খোকা ভেবে ভেবে মরে পায় না তো মানে
কত যে অভাব আছে কেউ তাকি জানে?
মাথার পেছনে যদি হয় দুটো চোখ
চাপা পড়ে মরতো কি রোজ এত লোক?
মনে মনে খেলে যদি যেত পেট ভরে
তা হলে কি অনাহারে এত লোক মরে?

এ রকম আরও কত আছে যে অভাব
কখনও কি মিটবে তা কে দেবে জবাব?
ভগবানই জানে না তো তুমি আমি ছার
তার চেয়ে খাওয়া যাক আমের আচার।

গ্রন্থপরিচয়

সেই মুহূর্তে নীরা
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৯৭। পৃ. ৮০। মূল্য ৩০.০০।
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী।
উৎসর্গ: মল্লিকা সেনগুপ্ত/ও/সুবোধ সরকার-কে।

ভোরবেলার উপহার
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯। পৃ. ৬৪। মূল্য ৩৫.০০।
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন।
উৎসর্গ: মুনমুন ও সৌমিত্র মিত্র-কে।

অন্যদেশের কবিতা
প্রথম আনন্দ সংস্করণ বৈশাখ ১৪০০, তৃতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১০।
পৃ. ১৩২। মূল্য ৫০.০০।
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রচ্ছদ: সুনীল শীল।
উৎসর্গ: সাগরময় ঘোষ/শ্রদ্ধাস্পদেষু।
প্রথম সংস্করণ: মাঘ ১৩৭৩।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অত্যন্ত কুটিল চোখ, বক্রনখে...	লেখক	সংযোজন	২৮৫
অতঃপর জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে...	জয়দ্রথ ও দ্রৌপদী	ভোরবেলার উপহার	৮৪
অনেক বসন্ত খেলা হল তবু...	অনেক বসন্ত খেলা	সেই মুহূর্তে নীরা	১৩
অন্ধকারে ঝলসে ওঠে হিরের...	লোভ এবং নির্জনতা	সংযোজন	২৭৯
অন্ধকারে নদী পেরুব, ভেঙে...	ভেঙে পড়েছে সাঁকো	ভোরবেলার উপহার	৭৩
আ-আজ সব চলেছে শেষের...	ভগ্নহৃদয়	অন্য দেশের কবিতা	১৪৫
আকাশ আমাকে এত আলো...	প্রতিদান	সংযোজন/ ছড়া	৩৩০
আগুন দেশলাই কাঠিকে শরীর...	দেশলাই	অন্য দেশের কবিতা	১৫৮
আগের জন্মে ছিলাম আমি...	চূর্ণ কবিতা (৩)	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৬
আজ আর ঘুম এল না, জেগে...	দু'-একবারই মাত্র	ভোরবেলার উপহার	৭৮
আজ বহুদূর এসে কংক্রিট...	দিগন্ত কি কিছু কাছে	সেই মুহূর্তে নীরা	৬৩
আজ রাতে আমি লিখে যেতে...	এখন আমি লিখতে...	অন্য দেশের কবিতা	২৩৬
আজকে চাঁদের নীলাভ বর্ণ,...	চাঁদ	সেই মুহূর্তে নীরা	২৭
আনাড়ি পরীরা তোমাদেরই...	আনাড়ি পরীরা	অন্য দেশের কবিতা	১৪৮
আব্রাহাম লিংকনকে যখন...	ঠান্ডা কবরে	সংযোজন/অনুবাদ	৩১০
'আমরা বাঙালি'— এই যে গর্ব	বিদ্যাসাগর	সংযোজন/ছড়া	৩২৮
আমাদের এ জীবনে যেহেতু...	আমাদের এ জীবনে...	অন্য দেশের কবিতা	১৭০
আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে...	আমার জামায় ছুঁয়ে...	সেই মুহূর্তে নীরা	৫১
আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক...	ওজন-পাল্লা	ভোরবেলার উপহার	১১০
আমার সঙ্গে আছেন ঈশ্বর-কুকুর,...	একটি কবিতা	অন্য দেশের কবিতা	১৩৪
আমার মায়ের দাসীরা, দীর্ঘ,...	প্রশস্তি-২	"	১৪০
...আমি উত্তরাঞ্চলে আছি,...	মায়ের কাছে চিঠি	"	১৮৭
আমি, একজন কবি, ঘোষণা...	শুভেচ্ছা	"	২৪৪
আমি একমাত্র, পিছনের...	আমিই একমাত্র...	"	২২৮
আমি এখন মধ্যরাত্রির নির্জন...	সীমান্ত ভাঙা	সেই মুহূর্তে নীরা	৬০
আমি জানি শব্দের ক্ষমতা,...	অসমাপ্ত (৫)	অন্য দেশের কবিতা	২৫৬
আমি তার মুখ চেয়ে সময়ের...	সামান্য	সংযোজন	২৯৬
আমি তো চাইনি তোমার...	দুটি গান (১)	অন্য দেশের কবিতা	২০৩
আমি তোমাকে দেখি, তোমার...	কথা	সেই মুহূর্তে নীরা	৪২

আমি বের্টল্ট ব্রেহখ্‌ট, এসেছি...	বেচারি বি. বি.	অন্য দেশের কবিতা	২০৯
আমি ভিজে মাটির উপর শুয়ে...	একটি কবিতা	”	২৬০
আমি সবুজ মাঠের মধ্যে তরুণ...	সবুজ সুর	”	২১৫
আর, কালকেই এসে কেউ...	আমি নই গভীর...	”	২২৫
আর কিছু নয়, একটা মুহূর্তের	ঘূর্ণি	সেই মুহূর্তে নীরা	৬২
আরামকেদারায় দু'হাত	এক সন্ধ্যায় দুই কবি	”	৫৬
আলোর গর্ব সে সব কিছুই	আলো-অন্ধকার...	”	২৬
আহা সে পায়নি কিছু, না...	অন্য কবি	ভোরবেলার উপহার	৮৫
উত্তুরে আলো আড়াল করে...	শিল্প	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৩
এ গ্রামটায় আগে আমি কখনো...	জাদু বাস্তবতা	ভোরবেলার উপহার	৭৮
এই অন্ধকার পথ চলে গেছে...	তবু এই গৃহহারা	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৬
এই গৃহগুলির	একটি গ্রামের ভগ্নস্তূপ	অন্য দেশের কবিতা	১৮২
এই সেই জায়গা, আমি চেষ্টা...	অভ্যন্তর	”	১৭০
এই যে একটা নড়বড়ে সাঁকো...	এই যে একটা...	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৯
এক ফোঁটাও জল নেই, তবু...	বন্ধুস্মৃতি	ভোরবেলার উপহার	১১৬
এক যে ছিল বাউল, হায়, সে...	কোকিল	সেই মুহূর্তে নীরা	২৫
একজন মানুষকে খুব চেনা...	অপরাধ	”	৪৯
একটা কুকুর কালো ভেলভেট	কালো ও সাদা	সংযোজন/ছড়া	৩২৫
একটা গোলাপ বাগানে চাঁদের...	উপকথার জন্ম	সেই মুহূর্তে নীরা	২৩
একটা ছোট্ট দোকানে.এক...	শান্তিলতা	সংযোজন/ছড়া	৩২১
একটা সীমানাহীন ধূ ধূ গেরুয়া	ব্যর্থতার তীব্র টান	সেই মুহূর্তে নীরা	৫৯
একটি কবিতা কবুতর হয়ে...	কবিতা গদ্য	”	২৫
একটি বসন্তের ভোর আমায়...	একটি বসন্তের ভোর...	অন্য দেশের কবিতা	২২২
একটি ব্লুজ পাঠিয়ে দিল ছন্দময়...	নিগ্রো	”	২৩৯
একটি মেয়ে, আর কিছু না...	কাব্যে উপেক্ষিত	সেই মুহূর্তে নীরা	২৭
একদা কি ছিলে তুমি বিশ্রুত...	নীলীরাগ	সংযোজন	২৬৯
একদা যা ছিল আমাদের পাহাড়...	যুদ্ধ	সংযোজন/অনুবাদ	৩০৭
একদিন কেউ কাছে এসে...	মাটি	ভোরবেলার উপহার	১০৩
এখন রাত একটা	অসমাপ্ত (২)	অন্য দেশের কবিতা	২৫৬
এখান থেকে কেউ যেতে...	ভেলাথ কোয়েথ...	”	২২৬
এপার পদ্মা ওপার পদ্মা...	বাংলার ছড়া	সংযোজন/ছড়া	৩১৩
এবং আবার আমি ফিরে এলাম...	মিশ্রণ	অন্য দেশের কবিতা	১৩৮
এবার বসন্তে কিছু ফুল ছেঁড়া হল	এবার বসন্তে	ভোরবেলার উপহার	৮২
এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা...	এমন মানুষ রোজই...	সংযোজন	২৯৯
এমন সুন্দর গন্ধ কোন রমণীর...	মালাখানি ভেসে যায়	সেই মুহূর্তে নীরা	১৯

এলাটিং বেলাটিং টইলো	এলাটিং বেলাটিং	সংযোজন/ছড়া	৩২২
এসো, আমরা এখন সেই...	এসো আমরা	ভোরবেলার উপহার	১০৭
— ওখানে কেউ না। জল।...	কেউ না	অন্য দেশের কবিতা	২২৩
ওগো নারীবাদী তীব্র লেখনী	ওগো নারীবাদী তীব্র...	ভোরবেলার উপহার	৯৮
ওদের সবার জন্য একটি...	রাজনৈতিক	সংযোজন	২৮৬
ওপাড়ার নটবর খুব নাকি...	সাইকেল ও সাঁতার	সংযোজন/ছড়া	৩১৮
ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার...	ওরিওল পাখি	অন্য দেশের কবিতা	১৬২
কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি...	মৃত্যু	সংযোজন	২৮১
কড়ির মতন টেপা টেপা...	রূপ	সেই মুহূর্তে নীরা	৬৪
কবিকে দেখলে মনে হয়	কবি	ভোরবেলার উপহার	১০৫
কবিতার কালো খাতাটির...	কোলাজ	সেই মুহূর্তে নীরা	৪৬
কবির মনে আছে ঈশ্বরের...	সারমর্ম	অন্য দেশের কবিতা	১৩৮
কতদিন এমন সৌরভ তুলে...	ঘুম	সংযোজন	২৯৯
কথা বলতে এসো না, আমি...	বাধা	”	২৮৯
কাল রাতে ঘুমের ভিতরে	কাল রাতে...	অন্য দেশের কবিতা	২২১
‘কাল রাতের বেলা গান...	কাল রাতের বেলায়	ভোরবেলার উপহার	৯৬
কী গোপনতার হৃদয়ে পোড়ায়...	নিদ্রিতা	অন্য দেশের কবিতা	১৩৬
কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার	সংখ্যার দেবদূত	”	২৩৩
কুসুমের মাস রূপান্তরের মাস	লিলি ও গোলাপ	”	১৫৩
কে যে কার সঙ্গে যাবে,...	পিকনিকের আগে	ভোরবেলার উপহার	৮৩
কোথা থেকে কখন কোথায়...	সময় মিলিয়ে গেল	”	৯৫
কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায়...	রূপসী	সংযোজন	২৮৬
কোথায় লুকাবে মুখ কোন...	অতীত কিশোরী	”	২৯০
কোনো ঘরে জায়গা নেই, তুমি...	সিঁড়ির ওপরে	”	৩৩২
ক্যাসিনো থেকে সেই...	আপেন্নিন	অন্য দেশের কবিতা	১৮৮
ক্রিসমাস-জোয়ার উজ্জ্বল...	‘নায়কহীন একটি...	”	২৫১
খিদের সময় কচমচ করে আস্ত...	বই	ভোরবেলার উপহার	১০৬
গভীর দু’চোখ নিয়ে শিশু বড় হয়	বহির্জীবনের ব্যালাড	অন্য দেশের কবিতা	১৯৮
গলাকাটা বটগাছের তলায়...	তিনটি অশ্ব	সেই মুহূর্তে নীরা	৩১
গাঙে ভেসে যায় সোনার...	গাঙে ভেসে যায়...	ভোরবেলার উপহার	৭৩
গান্ধীজি বললেন, পানি পিলা...	সেই দিনটি	”	৮১
গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের	প্রতীক্ষায়	সেই মুহূর্তে নীরা	৫৮
গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন লেবু গাছগুলি	দুপুর	অন্য দেশের কবিতা	২১২

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ, কে শুনছে...	ঘরভর্তি রঙিন মানুষ	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৪
ঘুমে ডুব দেব, ওপরে কচুরিপানা	অণু-জীবনী	”	১৮
ঘুমোবার আগে রোজ হৃৎপিণ্ড...	বারাঙ্গনা	সংযোজন	২৮৫
ঘোরো, ঘোরো, দ্বিমুণ্ড ভাগ্য	আগামীকাল এখনও...	অন্য দেশের কবিতা	১৫৬
চলো দীপক, আর একবার...	বন্ধুবান্ধব	ভোরবেলার উপহার	১১১
চলো যাই	স্বর	সংযোজন	২৬৮
‘চলো যাই, ধরো হাত, আরও...	মিল-অমিল	সেই মুহূর্তে নীরা	৫২
চশমা খুলেই উঠেছি, নদী...	কোনটা আসলে সত্যি	সংযোজন/ছড়া	৩২৬
চারদিকে এত মেঘ গর্জন-ছাপানো	নদীর কিনারে...	সেই মুহূর্তে নীরা	৪৮
চুম্বনের বাসনা নিয়ে প্রতিক্ষণ	কুমারী	সংযোজন	২৮৪
চোখে চোখ রাখো, বাহুতে	প্রেমিক	”	২৮৪
চোখের জলে তৈরি করা রজ্জু	বন্ধন	অন্য দেশের কবিতা	১৩২
ছাদ থেকে ছাদ বটের চারায়	ক্লাস সেভেনের...	সেই মুহূর্তে নীরা	১৬
ছেলেবেলা ইস্কুল-মোড়ে...	নাম নেই	”	২১
ছোটখাটো ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে	এত সহজেই	”	৪৯
ছোট্ট মিনি ভূতের গল্পে মাথা	মিনির গল্প	সংযোজন/ছাড়া	৩২৪
জল থেকে পদ্ম তুলে মূর্তির	ক্রমশ পৃথিবী	সংযোজন	২৯৭
জলে ডুবে গেল, ভেসে গেল...	নিমজ্জিতা মেয়েটি	অন্য দেশের কবিতা	২১১
জয় একদিন কথায় কথায়...	জয় একদিন...	সেই মুহূর্তে নীরা	২৯
জুতো খুলব কি খুলব না,...	জন্মস্থান	ভোরবেলার উপহার	৯২
ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ...	রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা	সংযোজন	২৮১
ঠাকুর্দা আমাকে বসুমতী...	উত্তরকালের জন্য	ভোরবেলার উপহার	৯৩
ডাক্তার জ্যোতিষ মতে...	ভূতগ্রস্ত	সংযোজন	২৮৩
ডিম আগে না মুরগি আগে?	কে আগে	সেই মুহূর্তে নীরা	২৬
তখন তাকে নিয়ে এলাম...	অবিশ্বাসিনী পত্নী	অন্য দেশের কবিতা	২৩০
তখন লক্ষ লক্ষ তলোয়ারের...	সমর সেন	সংযোজন	২৭২
তবুও আনন্দে আছি, সকালের...	তবুও আনন্দে আছি	”	২৯৫
তলোয়ার নেই, শুধু ঢাল নিয়ে	দূরে কেন, পাশাপাশি	সংযোজন/ছড়া	৩২৩
তারপর সে বলল, চলো এবার...	স্নানের পরে	ভোরবেলার উপহার	৯৪
তারা লোকটিকে কিছু চিনেছিল,	মৃতদেহ প্রক্ষালন	অন্য দেশের কবিতা	২০১

তিনটে দেবদারু গাছ আকাশের...	নিউটন ও ভ্যান গঘ	ভোরবেলার উপহার	১০২
তুমি আলোর শিখার মতো...	তুমি আলোর শিখার..	অন্য দেশের কবিতা	১৯৫
তুমি এনে দিলে সমুদ্র থেকে...	জেনোয়ার নারী	অন্য দেশের কবিতা	১৭৭
তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই...	তুমি ছেড়ে গিয়ে...	”	১৬৩
তুষার গোধূলিতে একটি কালো...	নামহীন একটি কবিতা	”	২৪৮
তোমার ঘুমের পাশে আমার...	তোমার ঘুমের পাশে	সংযোজন	২৭৮
তোমার পাশ দিয়ে গিয়েছে,...	ক্যাসটিলিয়ার এক...	অন্য দেশের কবিতা	২১৯
তোমার শূকরদের মান্য করো,...	বিরুদ্ধতা	”	১৬২
তোমার সঙ্গে দেখা হলে...	তোমার সঙ্গে দেখা...	ভোরবেলার উপহার	৮০
দরজাটা বন্ধ হল, তবু যেন...	দরজাটা বন্ধ হল	”	৭৬
দাওয়ার খুঁটিতে এলিয়ে শরীর...	চূর্ণ-কবিতা	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৫
দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়	দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি	সংযোজন	৩০১
দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলে...	খেলা	সেই মুহূর্তে নীরা	৪৪
দু'জনেই একমত হলে— ...	বন্ধু	সংযোজন	২৮৫
দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে...	পারিজাতের মালা	সংযোজন/ছড়া	৩১৫
দুধের মধ্যে নতুন গুড়,...	শীত-গরমের ছড়া	”	৩২৩
দুপুর কাটানো ম্লান মগ্নতা	দুপুর কাটানো	অন্য দেশের কবিতা	১৮৩
দুপুর বেলা খিদের চাবুক।...	কেউ আমায় চিনতে...	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৯
দুর্গ, একদা যা ছিলে তুমি,...	সত্য নাম	অন্য দেশের কবিতা	১৬৭
দুলে দুলে দুলে দুলে মাটি...	মায়া-সংসার	সেই মুহূর্তে নীরা	১৪
দেখা হবে কি হবে না ভেবে...	দেখা না দেখা	”	৬৩
দেখা হয়, কথা হয়, তবু...	বিচ্ছেদ	সংযোজন	৩০১
দেবদারু কেন সাজল এমন...	শীত	সংযোজন/ছড়া	৩২৭
দ্বীপটি জঙ্গলে ভরা...	দ্বীপ	ভোরবেলার উপহার	১০৯
ধীমান ও পরিশ্রমী, চোখে...	সম্পাদক	সংযোজন	২৮৭
নদী যদি হতে চায় দূরের...	খোকার ভাবনা	সংযোজন/ছড়া	৩৩১
নদীর ধারে বসে রয়েছে...	স্বপ্নে দেখা ছবির...	ভোরবেলার উপহার	১০১
নষ্ট অহমিকা, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার	নষ্ট অহমিকা	অন্য দেশের কবিতা	২০৫
নাচি আমরা ট্যাঙ্গো নাচি জাহাজে	জ্যোৎস্না	”	১৪৩
নাথুলা পাস পার হবার সময়	দুটি নাম	ভোরবেলার উপহার	১১৫
নাবিক, এখন দারু দেবদূত,	দুপুর	অন্য দেশের কবিতা	১৪৮
নাঃ শুধু বন্ধুত্বও ফাঁপা আর...	ফিরিয়ে নাও	সেই মুহূর্তে নীরা	৫১
নিমেষে নিমেষে মাটির হৃদয়	মাটির হৃদয়	সংযোজন	২৬৮
নিরুদ্দিষ্টের বিজ্ঞাপনের প্রতিটি...	কেউ নাম ধরে ডাকবে	সেই মুহূর্তে নীরা	৫৪

নীরার হাত-চিঠি এল পড়ন্ত...	বার বার প্রথম দেখা	ভোরবেলার উপহার	১১০
পশুদের বনবাস এই...	অকৃতজ্ঞ	সেই মুহূর্তে নীরা	৪১
পঁচিশ বছর! বুড়ো হয়ে গেছি...	সংলাপ	অন্য দেশের কবিতা	১৭৫
পা মাড়িয়ে কেউ চলে গেল...	পরমার্থের ছবি	ভোরবেলার উপহার	১০৮
পাখির বাজারে গিয়েছি আমি	তোমার জন্য হে...	অন্য দেশের কবিতা	১৬০
পাথরের সেতুর উপরে ওই যে...	পাথরের সেতু	”	২০০
পুকুরে জোরালো ডুব দিচ্ছে...	পানকৌড়ি ও...	ভোরবেলার উপহার	১০৪
পুকুরে তেজি শরীর নিয়ে...	শিল্পের নিয়মে	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৬
পুকুরধারে কদমগাছ	ফুলডাঙার পুকুর	সংযোজন/ছড়া	৩১৯
পুরনো তোরঙ্গ থেকে উঠে...	কোন অসমাপ্ত...	সেই মুহূর্তে নীরা	২৪
পুরুষটি ছিল শিনশিনাটিতে,...	দম্পতি	সংযোজন/অনুবাদ	৩০৯
পৃথিবীতে অলৌকিক কি আর...	কে লিখবে	ভোরবেলার উপহার	৮৬
পৃথিবীতে অলৌকিক বা দুর্বোধ্য...	দুর্বোধ্য	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৩
পৃথিবীর সব সীমান্ত আমায়	সীমান্তের বিরুদ্ধে	অন্য দেশের কবিতা	২৬০
প্যাঁচা হেসে বলে, ওরে ও...	প্যাঁচা ও জোনাকি	সেই মুহূর্তে নীরা	২৬
প্রতীক্ষায় আয়ু বাড়ে, পঁচিশ...	প্রতীক্ষার পর	সংযোজন	২৯১
প্রথম স্বপ্নের মধ্যে বিস্ফোরণ...	এক একটা স্বপ্ন	সেই মুহূর্তে নীরা	৪৭
প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে...	একটি সাদা পাথরের...	অন্য দেশের কবিতা	২২৮
প্রিয় ভ্রাতা এবং বন্ধুর প্রতি...	এমে সেজারকে চিঠি...	”	১৭২
ফিসফাস মিলিয়ে গেছে। আমি...	হ্যামলেট	”	২৫২
বইগুলো ভয় দেখাচ্ছে লেখা,...	লেখা	ভোরবেলার উপহার	১১৩
বড় রাস্তার কাছে, যেখানে....	তিনটি দোকান	অন্য দেশের কবিতা	১৫৭
...বর্ষণের বটবৃক্ষ নগরে ছড়ায়...	বৃষ্টি-৮	”	১৪১
বলাকা, তোমার শুভ্র চোখেতে...	একটা চিঠি	সংযোজন	২৬৭
বলো দেখি কোন দেশ ...	রিংরাং টোটো	সংযোজন/ছড়া	৩২১
বসিরহাট থেকে এসেছে ভানু...	কলকাতা ১৯৬৬	সংযোজন	২৮৮
বহুবার নভেম্বর ফিরে ফিরে...	অংশ কবিতা	অন্য দেশের কবিতা	১৯১
বাঁচার জন্যে বাঁচতে হবে, এমন...	সহজ কথার গান	ভোরবেলার উপহার	১০৭
বাগান থেকে সুরের ধারা...	সায়াহ্নে	অন্য দেশের কবিতা	২৫০
বাঘ ও পিঁপড়ে দুই বন্ধুতে...	বাঘ ও পিঁপড়ে	সেই মুহূর্তে নীরা	২৫
বাড়ির পাশে ছিল জমি,...	ক্লান্ত সৈনিক...	সংযোজন/অনুবাদ	৩০৭
বাতাসে দোল ওঠে।...	কে দেয় পরমায়ু...	ভোরবেলার উপহার	১১৪
বাতাসে বিষণ্ণ চোখ, মুখ...	পাপী	সংযোজন	২৮৭
বান মাছ. লাস্যময়ী	বান মাছ	অন্য দেশের কবিতা	১৮৪

বাবা বললেন,...	বাবা	ভোরবেলার উপহার	৮৯
বাবুরাম সাপুড়ের দুঃখটা জানো...	সুকুমার রায় নেই	সংযোজন/ছড়া	৩২০
বারবার ভেঙে যায় নীল...	নির্বাসন	সংযোজন	২৯০
বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে...	একজন শান্ত মানুষ	অন্য দেশের কবিতা	১৫৫
বিদায় বিষাদ	ঈষৎ বিকৃত	”	১৫১
বিদ্যাসাগর প্রেম করেননি,...	বিদ্যাসাগর	সেই মুহূর্তে নীরা	২৭
বিপ্লবের দামামা বেজে উঠুক...	আমাদের যাত্রা	অন্য দেশের কবিতা	২৫৫
বুকের পাঁজর খুলে...	হীনম্মন্য	সংযোজন	২৮৬
বুকের ভিতরে ঘড়ি, বেজে	বুকের ভিতর ঘড়ি	”	২৯৭
বুকের রক্ত দিয়ে কবিতা...	রক্ত	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৮
বুড়ি, তুমি কি এখনো বেঁচে...	আমার মাকে লেখা...	অন্য দেশের কবিতা	২৫৬
বৃষ্টি কি কখনও কারুর কাছে...	বৃষ্টির রাতে	সেই মুহূর্তে নীরা	৫৫
ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া,...	ভাঙতে ভাঙতে...	ভোরবেলার উপহার	১১৪
ভালোবাসার ভিখিরিগুলো...	ভালোবাসার...	”	৮৯
ভেবেছিলাম কোনোদিন...	উৎপাত উপলক্ষে...	সংযোজন	২৮২
ভোরবেলার জানলা আমার...	ভোরবেলার উপহার	ভোরবেলার উপহার	৮৭
ভোরের বাতাস কিছু চায়	এত ঋণ, এত ঋণ	”	৮৮
মঞ্চে গলা কাঁপিয়ে...	পাগলাটে গলার স্বর	সেই মুহূর্তে নীরা	৩৭
মৎস্যজীবীদের গল্পে শোনা...	দ্বীপের প্রভু	অন্য দেশের কবিতা	১৯৬
মা, তুমি কেমন আছ?	না-পাঠানো চিঠি	সেই মুহূর্তে নীরা	৬৫
মা বললে, ঘরের বাছা...	মা বললে	সংযোজন/ছড়া	৩১৫
মা-বাপ বাঙালি, এই দেশে...	বিদেশ স্বর্গ	সেই মুহূর্তে নীরা	২৮
মাঝরাত্তির হলে সবাই...	গভীর রাতের ম্যাজিক	সংযোজন/ছড়া	৩১৬
মাটির দাওয়ায় খুদে মাস্টার...	একটি গ্রাম্য দৃশ্য	ভোরবেলার উপহার	১১৭
মাত্র একটাই কলম পকেটমার...	কলম	সেই মুহূর্তে নীরা	৬৪
মানবসভ্যতার পতন শুরু...	পতন	সংযোজন	২৯৮
মেঘ ডাকছে গুরু গুরু,...	যুগলবন্দি	সেই মুহূর্তে নীরা	২৮
মেঘের মুলুকে আজ কী যে...	বৃষ্টির রূপকথা	সংযোজন/ছড়া	৩২৯
মেয়েটি এক হাতে নিয়েছে...	দু'জন	অন্য দেশের কবিতা	১৯৭
মেয়েটি শয্যায় শুয়ে,...	বাদলা পোকা	সংযোজন	২৯৩
মৌমাছিটা শুকনো ফুলকে...	বৃত্তের মাঝখানে	ভোরবেলার উপহার	৯৯
যখন আমি মাতৃগর্ভে একটা...	প্রথম প্রশ্ন	সেই মুহূর্তে নীরা	৩১
যখন ছিলে ছোট্ট খুকুমণি	নারী	অন্য দেশের কবিতা	১৭৯
যখন জেগে উঠলাম, ঘামে...	নীল উপহার	”	২৪১

যদি আমায় প্রশ্ন করো,...	সোনাটা	”	২৩৫
যদি মরে যাই	বিদায়	”	২৩০
যদিও তোমার রয়েছে...	দুটি গান (২)	”	২০৪
যাও কুসুম-গভীরে, যাও...	ছুঁয়ে দেখা হবে	সেই মুহূর্তে নীরা	৬১
যাকে আমি চেয়েছিলাম, সে...	দেবদূতের প্রত্যাগমন	অন্য দেশের কবিতা	২৩৪
যে কোনও পড়োবাড়ি দেখলেই...	ডানা মেলা গল্প	সেই মুহূর্তে নীরা	৪৮
যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির...	কবির ঘর	অন্য দেশের কবিতা	১৬৪
যে বুলেট আমাকে হত্যা...	বুলেট	”	২৪৫
যে বৃক্ষের সব পুষ্প স্বচ্ছ,...	বৃক্ষবন্দনা	সংযোজন	২৭৯
যে যেমন সুখ পায় পাক...	যে যেমন সুখ	সেই মুহূর্তে নীরা	৪১
যেন কচ্ছপ আর খরগোশের...	অন্য গল্প	”	৫৮
যেমন নদীর শুরু হয়	হেলেনের প্রতি...	অন্য দেশের কবিতা	১৬৫
যেমন স্বপ্নের মধ্যে তীব্র...	কিছুক্ষণ	সংযোজন	২৭৩
রাত বারোটা কি দেড়টায়...	শক্তি	ভোরবেলার উপহার	৭৬
রাত্রি থেকে বাইরে আসে...	কবিতার শিল্প	অন্য দেশের কবিতা	১৬৮
রাত্রি, রাজপথ, আলো,...	সুরদেবীর উদ্দেশ্যে	”	২৪৯
রূপসী রতির ওষ্ঠে, চক্ষে,...	স্বপ্নে দেখা জীবন	সংযোজন	২৭৭
‘রূপসী’ শব্দটির যদি ছাপার...	শব্দ-ছবি	সেই মুহূর্তে নীরা	৩২
রোদ্দুরে বৃষ্টির স্বাদ ওই...	প্রতিপক্ষ	সংযোজন	২৮৪
রোমিও এবং জুলিয়েট আর...	শাশ্বত	সেই মুহূর্তে নীরা	২৮
লাল রাস্তায় খড় বোঝাই...	লাল রাস্তায়...	”	২২
লাস্ট ট্রেন সওয়া বারোটায়,...	যে যার অন্য বাড়ি	সেই মুহূর্তে নীরা	৪৩
লিখে যেতে হবে এই কথাগুলি...	লিখে যেতে হবে	ভোরবেলার উপহার	৯৬
শ্মশানে একটাও চিতা জ্বলছে না	সবই আছে	”	৯১
শার্সির গায়ে ঝুরু ঝুরু ঝরে...	একটি শীতের সন্ধ্যা	অন্য দেশের কবিতা	২০৮
শিশির-ভেজা ঘাসে তোমার...	সেই মুহূর্তে নীরা	সেই মুহূর্তে নীরা	২৩
শীতকালের বিকেল, কিছুই...	সংগীত ভ্রমণ	ভোরবেলার উপহার	৭৪
শোনো বলি এক আজব...	আমার বাংলা	সংযোজন/ছড়া	৩১৩
শোনো, শোনো, বলি,	আবর্তন	সংযোজন	২৭৫
সকলেরই মুখে সূর্যাস্তের...	সূর্যাস্ত	অন্য দেশের কবিতা	১৪৩
সকালবেলার দিকবধূটির...	সরস্বতীর বীণা...	ভোরবেলার উপহার	৮০
সত্যি করে বলো তো দেখি,...	পুরুষতন্ত্র	সেই মুহূর্তে নীরা	২৭
সত্যিই তো একটা রাক্ষস...	কঙ্কালের কপালে...	”	৪৫

সপ্তম গর্ভের কন্যা, কেন...	সপ্তম গর্ভের কন্যা	”	৬১
সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ	সবচেয়ে সেই মধুর...	”	১৩
সবুজ ফসল, ফল, রূপসী...	‘সবুজ ফসল, ফল’	অন্য দেশের কবিতা	১৭৯
সবুজ শাড়ির সঙ্গে দেখা হল...	দেখা	সংযোজন	২৯৬
সময় একবারই আসে	সাড়ে সাতকোটি...	”	২৯২
সমস্ত দরজা খোলা,...	আত্মঘাতী	’	২৮৬
সরযূ নদীর তীরে গাঢ়	স্বপ্ন দর্শন	সেই মুহূর্তে নীরা	১৯
সাং কান-এর উত্তরাঞ্চলে...	সীমান্ত ঘাঁটিতে	সংযোজন/অনুবাদ	৩০৮
সাঁকো পেরুলেই ওপারে...	সাঁকোর মাঝখানে	ভোরবেলার উপহার	১০০
সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে	শীতের রাত্রি	অন্য দেশের কবিতা	২৫৩
সারাটা গ্রীষ্মে পুড়েছে...	বর্ষা	সংযোজন/ছড়া	৩১৪
সারাটা রাত ধরে পশুটা...	সারা রাত	অন্য দেশের কবিতা	১৬৮
সারাদিন রেডিয়োতে কান	চলো যাই	সংযোজন	২৯২
সিগারেট ছোঁননি শ্রীরামচন্দ্র...	নেশাখোরের...	সেই মুহূর্তে নীরা	২৮
সুন্দরবন থেকে ফিরলে, বাঘ...	সুন্দরবন ভ্রমণ	সংযোজন	২৯৪
সূর্যমুখী চলে পড়ে পশ্চিমে, দিন	প্রায় গ্রাম	অন্য দেশের কবিতা	১৮৬
সে আছে দাঁড়িয়ে আমার...	প্রেয়সী	”	১৫০
সোনায় মোড়া একটি বৃদ্ধের...	শোভাযাত্রা	”	১৬০
স্তব্ধতা যখন অভঙ্গ জাগে	রহস্য-বিরক্তি	”	১৮১
স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন...	স্থাপত্য বিদ্যালয়ে...	”	২৬১
স্পষ্ট দেখা যায় সেই...	রবীন্দ্রনাথের তেইশ...	সংযোজন	২৭১
স্বপ্নে নয়, বুকের মধ্যে একটা...	দুটি মাত্র অক্ষর	সেই মুহূর্তে নীরা	৪০
হঠাৎ একটা দিন হাঙ্গেরিয়ান...	বিকল্প খোঁজো,...	”	৪৫
হরিণ কি নিজে জানে,...	আমরা শুনতে পাই না	”	৫০
হলুদ পাখিটি নিমগাছে...	হলুদ পাখি	ভোরবেলার উপহার	১০০
হাওয়া এসে ডেকে বলে,...	জেগে আছ?	সংযোজন	২৮০
হাওয়া বয় শনশন, বৃষ্টিরা...	খাওয়ার পরে ঘুম	সংযোজন/ছড়া	৩১৭
হাত ভরা চাঁপা ফুল, কে এনেছে...	হাত ভরা চাঁপা ফুল	সেই মুহূর্তে নীরা	১৫
হায়, এ শহরে আজ গান বন্ধ!	এ শহরে আজ	সংযোজন	২৯৮
হায়রে আমার পরিত্যক্ত...	ভালোবাসায়...	অন্য দেশের কবিতা	১৩১
হিন্দু এবং মুসলমান	দেশ	সেই মুহূর্তে নীরা	২৬
হিমালয় পর্বতকে পিতামহের...	আমার সব আপনজন	”	১৭
হিরণ্ময়, আমরা কাল অন্য এক...	অন্য দেশ	সংযোজন	২৭৬
হে আত্মার নৈশ ডানার...	পাশ্চাত্য সংগীত	অন্য দেশের কবিতা	২০৮
হে বন্ধু, বিদায়	শেষ কবিতা	”	২৫৮